শাখা-প্রশাখা

প্রথম খণ্ড

শ্রীকানাইলাল ঘোষ

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৬

দাসগুপ্ত এণ্ড কোং
৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ

প্রথম খণ্ড

মূল্য—২॥০

প্রকাশ ক'রেছেন :
কানাই ঘোষ
১৩এ, ফোড়িয়া পুকুর ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৪

রূপ পরিকল্পনা ক'রেছেন :
গ্রন্থকার

মডেল এঁকেছেন :
জিতেন নাগ

প্রুফ্ দে'খেছেন :
শিশির পাল

ফটো :
নারাণ দাশ

ছেপেছেন—
শ্রীঅনাদিনাথ কুমার
উমাশঙ্কর প্রেস,
১২নং গৌরমোহন মুখার্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

দেখেও যারা দেখে না,
পেয়েও যারা পায় না—
তুলে দিলাম তাদেরই
হাতে।

ভূমিকা

চলার পথে যা দেখেছি, তাই এঁকে গেছি। ভুল ত্রুটি অনেক কিছুই হয়ত ধরা প'ড়্বে—পাঠক-পাঠিকার চোখে,—তবুও, যদি এতটুকু ভাল লাগে, মিলিয়ে দেখ্‌লে—জীবনের আশে-পাশে এদের খুঁজে পাওয়া যায় কোনখানে—সার্থকতা লাভ তবেই ক'র্‌বে আমার এ লেখনী! এর বেশী যা কিছু বলার, তা ব'ল্‌বো দ্বিতীয় খণ্ডে। ইতি—

খেপুত—পোঃ ও গ্রাম
মেদিনীপুর
'রথযাত্রা' আষাঢ় ১৩৬০

শ্রীকানাইলাল ঘোষ

শাখা-প্রশাখা

গঙ্গার পশ্চিম উপকূল...

খুব বেশীদিনের কথা নয়—বিশ বছর আগেও এ স্থানটা ছিল জরাজীর্ণ—পরিত্যক্ত, বিশাল মরা কয়েকটা গ্রাম। সেদিনের সেই বন-জঙ্গলপূর্ণ ভূপতিত বাস্তুভিটেগুলো তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে বেড়ালে, হয়ত কয়েকটা কঙ্কালসার মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যেত—কিন্তু তাদের ওই কঙ্কালসার চেহারার সম্মুখীন হওয়ার মত সৎসাহস একমাত্র দিনের আলো ছাড়া সম্ভব ছিল না কারও। এমন কি পাশের গাঁয়ের লোকও ভয়ে মাড়াতো না ও-গাঁয়ের পথ ও প্রান্তর। ব'লতো, ওগুলো ভুতুড়ে গাঁ। পা দিলেই মানুষ মরে। আর আজও যারা বেঁচে-বর্ত্তে আছে, তারা এক-একটি জীবন্ত প্রেতের প্রতিমূর্ত্তি ছাড়া অন্য কিছু নয়! কথাটা অবশ্য মিথ্যা ছিল না সেদিন। অথচ চিরদিন এরূপ তার ছিল না—একটা অতীত ইতিহাস বলেও বস্তু ছিল। সেখানে বাস ক'র্তো জমিদার, উচ্চ মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত, চাষী, মজুর, কামার, কুমোর, মুচি, ধোপা, তাঁতি ও জোলা। যাকে বলে স্বয়ং সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী বর্দ্ধিষ্ণু কয়েকটি গ্রাম।

লোকের ক্ষেত ছিল, খামার ছিল, সারা বছরের খাদ্যও থাক্‌তো সেখানে মজুত। তার উপর বড় বড় দীঘি, বড় বড় মাছ, গোয়াল-ভরা গরু আর হাঁড়া ভর্ত্তি ঘি, দুধ, দই, ক্ষীর—কোনটারই অভাব ছিল না সেদিন। শুধু কি তাই, তারা সবল ও সুস্থ জীবন যাপন ক'র্তো

পরস্পর প্রীতি ও মধুর একটা নীবিড় আত্মীয়তার স্নিগ্ধ আবেষ্টনীর মধ্যে। হয় কাকা, না হয় মামা, নিদেন হয় দাদা, না হয় খুড়ো—এই প্রীতির সম্পর্কটা ভুলিয়ে দিয়েছিল তাদের রক্তের ব্যবধান। হাসি-খুশি ও সুখ-দুঃখের সঙ্গে সমান তালে পাল্লা দিয়ে কাট্‌তো তাদের দিন! বাইরের লোক সহসা বুঝেই উঠ্‌তে পার্‌তো না, কে এদের আপন—কে এদের পর। ভাব্‌তো এদের সবাই বুঝি এক—সবাই ওরা আপন আপন জন।..

কথাটা শুন্‌লে হয়ত সহজে বিশ্বাস হবে না, কিন্তু এতটুকুও বাড়িয়ে ব'ল্‌ছি না আমি! সত্যই সেদিনের সে গ্রাম—বর্ত্তমান যুগের মত এক একটা খণ্ড গ্রাম ছিল না—ছিল সত্যকারের বৃহৎ একটা পরিবার।

তাদের কাজের পার্থক্য ছিল, কিন্তু মানুষের মধ্যে ছিল না এত বিভেদ—এত ব্যবধান। নিজ নিজ গণ্ডীর মধ্যে তারা হৃষ্টচিত্তেই বসবাস ক'র্‌তো দিনের পর দিন। তাদের সুখ ও শান্তিও ছিল নিবিড়তর। তাই একত্বের অনুভূতি দিয়ে তারা অনুভব ক'র্‌তো—সারা গ্রামের মান-সম্ভ্রম ও ইজ্জতের মর্য্যাদা। তার জন্য তারা প্রয়োজনের দিনে লাঠালাঠি ক'র্‌তো—প্রাণও দিত হাসিমুখে।

তাই সেদিনের সে যুগের বনগ্রাম, নিজস্ব প্রতিষ্ঠার পীঠভূমিতে অধিষ্ঠিত ছিল, আশপাশের আরও পাঁচটা গ্রামবাসীদের কাছে। কথায় কথায় তারা উপমা দিত—হ্যাঁ, গাঁয়ের মত গাঁ একটা বটে!

শুধু যে প্রশংসার বস্তু ছিল, তা নয়—আদর্শ হিসাবে অনুকরণীয়ও ছিল সকলের কাছে। তাই প্রতিবেশী গ্রামের লোকেরা যতখানি ভালবাস্‌তো এই গাঁটাকে, ঠিক ততখানি ঈর্ষাও ক'র্‌তো মনে-প্রাণে! ভাব্‌তো, পৃথিবীর যত সুখ ও শান্তি—বুঝি বাসা বেঁধেছে ওই গাঁয়ে!

সেই গ্রামেই একদিন সহসা দেখা দিল মহামারী। গ্রামের বদ্যিরা মান্‌লো হার। এমনি কি তাঁদের নিজস্ব গণ্ডীর মধ্যেও দিল শেষে

-ঠানা! যাদের শক্তি ও সামর্থ্য ছিল, তারা সকলেই পালালো একের পর এক। আর যারা শক্তিহীন, সামর্থ্যহীন, যারা দীন-দরিদ্র, যারা চাষি-মজুর, কামার-কুমোর, জোলা-তাঁতি, যারা নিম্ন মধ্যবিত্ত,—তারা সবাই একান্ত অসহায়ের মত চেয়ে চেয়ে দেখ্‌লো, মৃত্যুর সেই প্রলয় নৃত্য।··দেখলো, প্রকৃতির নীরব সেই শব-সাধনা। চোখের সাম্‌নে তাদের মর্‌লো ছেলে, মর্‌লো মেয়ে, মর্‌লো স্ত্রী, মর্‌লো পরিজনবর্গ, একের পর এক—দিনের পর দিন। অসহায় তারা। জুল্‌ জুল্‌ ক'রে শুধু চেয়ে চেয়ে দেখ্‌লো, আর ত্যাগ ক'র্‌লো জ্বালাময়ী কয়েকটা গভীর দীর্ঘশ্বাস। তবুও মাঝে মাঝে বুকের পুঞ্জিভূত বেদনাগুলো বহিঃবিশ্বে উচ্ছ্বাসিত হ'য়ে মাত্র দুটি কথায় আত্মপ্রকাশ ক'র্‌লো—হা ভগবান!···

শেষ পর্য্যন্ত সেই দুটি কথাও মৃত্যুর হিম-শীতল পরশে বরফের মত জমে শান্ত হ'য়ে প'ড়্‌লো। গ্রাম হ'ল জনশূন্য। দীর্ঘদিন সেখানে জ্বল্‌লো না সান্ধ্য বাতি, বাজ্‌লো না শাঁখ। কলহাস্যে মুখরিত সেই গ্রাম—পরিণত হ'ল মহাশ্মশানে!

পুঞ্জিভূত আশার স্মৃতিসৌধ—সেই পর্ণকুটীর, ভাঙ্‌লো একের পর এক। যেখানে মানুষ একদিন দেখেছিল সুখ ও শান্তির স্বপ্ন, গড়্‌তে চেয়েছিল জীবন-সাধনার দেউল, সেখানে জন্মালো আগাছা। আরও কয়েক বছরের ব্যবধানে গ্রামের শেষ চিহ্নটুকুও গেল মুছে—পরিণত হ'ল ঘন জঙ্গলে।

যারা প্রাণের ভয়ে পালিয়েছিল, শেষ সম্বলটুকু সঙ্গে নেওয়ার অবকাশ সেদিন যারা পায়নি—তারা ফিরে এলো বহুদিন পরে। কিন্তু জন-মানব-হীন সেই প্রেতপুরীর মধ্যে বসবাস ক'র্‌তে সাহসী হ'ল না। ফিরে গেল পাশের গ্রামে। সেখানেই গড়্‌লো ছোট একটু আস্তানা। আর যারা ছিল ধনী, যারা ছিল উচ্চ মধ্যবিত্ত—তারা সেই যে গ্রামের মায়া কাটালো আর তারা ফিরে এলো না কেউ কোনদিন।

কামার-কুমোরের মধ্যে যারা সে ঘূর্ণীর আবর্ত্তে মরেও একেবারে মর্‌লো না—তারাই ছাড়তে পার্‌লো না তাদের পূর্ব্বপুরুষের অর্জ্জিত সেই মাটির মায়া। তারাই প'ড়ে রইলো—সেই পরিত্যক্ত নির্জ্জন বনভূমিতে।...

* * * *

রণজিৎ হালদার ছিলেন বনগ্রামের নামজাদা জমিদার। আশ্‌পাশের আরও পাঁচটা গ্রাম ছিল তাঁর জমিদারীর অধীনে। আয় ছিল প্রচুর। কিন্তু পূর্ব্বপুরুষের সঞ্চিত সেই ধনরত্নের মোহ ত্যাগ ক'রে মহামারীর কবল থেকে আত্মরক্ষার আশায় সপরিবারে পালিয়ে এসে বাসা বাঁধ্‌লেন সহরের বুকে। তারপর সেই মহামারীর রুদ্র রূপ শান্ত হ'য়েছে, গ্রামের সেই শান্তির পরিবেশ ফিরে এসেছে পুনঃ, কিন্তু সেখানে ফিরে যেতে মন তাঁর রাজি হ'ল না। তাই ভাড়া বাড়ীর পরিবর্ত্তে গড়ে তুল্‌লেন প্রাসাদসম এক বিশাল অট্টালিকা। বস্‌লো নায়েব-গোমস্তার অফিস, দ্বারে দাঁড়ালো পাইক-বর্‌কন্দাজ।—পূর্ব্বের আভিজাত্য ফিরে এলো কয়েক মাসের ব্যবধানে।

পরিত্যক্ত, জনশূন্য বনগ্রাম; সত্যই পরিণত হ'ল একটা ভূতুড়ে গাঁয়ে। রণজিৎবাবুর জমিদারীর আয়ও ঠেক্‌লো প্রায় শূন্যের কোঠায়। কিন্তু সহজে হার মান্‌লেন না তিনি। পূর্ব্বপুরুষের অর্জ্জিত ও সঞ্চিত অর্থে, বাইরের ঠাট্‌টা রাখ্‌লেন বজায়। সমাজ ও সংসারে সেইটুকুই ত তাঁর আভিজাত্যের মাপকাঠি।

অবশ্য ভেবেছিলেন—বছর কয়েকের মধ্যেই পূর্ব্বের অবস্থা ফিরে পাবেন তিনি। কিন্তু বছরের পর বছর কেটে গেল, গ্রামে ফিরে এলো না কেউ।

হতাশায় ভাঙ্‌লো হৃদয়—ভাঙ্‌লো শরীর। মোহ-মুগ্ধ সহুরে মন, সহসা পূর্ব্বপুরুষের ভিটের প্রতি হ'ল আকৃষ্ট। চোখের পাতায় ভাস্‌লো অতীতের ঐতিহ্য। সেই পুরাণো অট্টালিকা, সেই বেড়, সেই বাগান, সেই দীঘি—না···না···না, আর ভাব্‌তে পারেন না তিনি। অন্তরটা চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। স্পষ্টই যেন দেখ্‌তে পান—তারা হাতছানি দিয়ে ডাক্‌ছে, আয়—ওরে ফিরে আয়, ফিরে আয় তোরা ঘরে···

কিন্তু তিনি আজ বার্দ্ধক্যের ভারে জরাজীর্ণ—একান্ত অসহায়। সেই নাম, সেই কর্ত্তৃত্বের মোহ, সেই আশা ও আকাঙ্ক্ষা আজও আছে সমানভাবে—কিন্তু নেই সেই বেগবতী ইচ্ছার প্রাবল্য! একদিন যার পরিতৃপ্তিই ছিল জীবনের একমাত্র কামনা—আজ তা' নির্ভরশীল। তাই সেই ইচ্ছা আজ সামর্থ্যের অধীন। তার রূপ দেওয়া আজ আর তত সহজসাধ্যও নয়! এটাই যে ক্ষয়িষ্ণু জীবনের শেষ পরিণতি!

আজও গাড়ী ছুটে। ঘোড়ার খুরের খট্‌ খট্‌ শব্দটা আকাশ বাতাস মথিত ক'রে সুস্পষ্টভাবে দিগন্তের বুকে আভিজাত্যের দম্ভ প্রকাশ করে। কিন্তু তাতে ত মনটা তাঁর তৃপ্তি খুঁজে পায় না! মনে হয়, সবই যেন ব্যর্থতার ব্যঙ্গ পরিহাস। আর এই যে ঘোড়ার-খুরে-ওড়া পীচের কালো ধূলো আর বালি—ওরাও যেন বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়—জীবনের আলো ক্ষীণতর হ'য়ে এলো—তৈরী হ'য়ে নাও পথিক, তৈরী হ'য়ে নাও—

অথচ, সেই পল্লীর বুকে ছুট্‌তো যখন ঘোড়া—চল্‌তো বেগে গাড়ী, উড়্‌তো ধূলো-বালি, আকাশ-বাতাস একাকার হ'য়ে যেতো। পিছনে পড়ে থাক্‌তো ধূসর ধোঁয়ার এক অপরূপ সমাবেশ! শুধু উড়ন্ত ধূলো—আর বালি! গর্ব্বে ফুলে উঠ্‌তো বুক। চোখের পাতায় ভাস্‌তো দীপ্ত জীবনের রোমাঞ্চিত শত মধুর সুখ-পরশ। অনাগত ভবিষ্যতের বলিষ্ঠ শত কামনা। প্রেরণা ও উন্মাদনায়—মন আর পথ, এক হ'য়ে

যেতো। জেগে থাক্‌তো শুধু এগিয়ে চলার বাসনা! আর পীচের এই কালো ধূলো, মৃত্যু-দূতের মত পথ রুখে দাঁড়িয়ে বার বার ইঙ্গিত করে—শেষ হ'য়ে এলো, শেষ হ'য়ে এলো—জীবনের মেয়াদ!·· ক্ষীণতর হ'লো আয়ু! হায়, বুক ভেদ ক'রে তাঁর নেমে এলো দীর্ঘশ্বাস! প্রাণটা কাঁদে রণজিৎবাবুর, কিন্তু অসহায়—একান্ত অসহায় সে আজ তিনি! বার্দ্ধক্যের জরাজীর্ণ আবেষ্টনীর মধ্যে বন্দী আজ মন ও প্রাণ! অতীতের শক্তি ও সামর্থ্যকে জবরদস্তভাবে হরণ ক'রে নিয়েছে জীবনের এই জীবন্ত অভিশাপ!

চিরহরিৎ পরিবেশে তাঁর জন্ম। সেই স্বাধীন গতি তাঁর আজ—পাষাণ প্রাচীরের সুদৃঢ় আবেষ্টনে পিষ্ট হয় প্রতিটি মুহূর্তে। গুমরে ওঠে মন। ক্ষীণতর হয় দেহ। অবশেষে সেই দিল তাঁকে মুক্তির সন্ধান। তিনি যাত্রা ক'র্‌লেন পরপারে।

ইহলোক ত্যাগ ক'র্‌লেন রণজিৎবাবু! তাঁর যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে জমিদারীর যাবতীয় কিছু, ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হ'য়ে প'ড়লো স্বার্থের সংঘাতে। শুধু বেঁচে রইলো জীর্ণ আভিজাত্যের মোহ।

সেই মোহ যেদিন টুটলো, দেখা গেল সহরের সমস্ত সম্পত্তি উঠেছে লাটে। বাকী শুধু র'য়ে গেছে বনগ্রাম।

সেটা ছিল একটা পড়ো ভুতুড়ে গাঁ। তার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'লেও সেদিন সে গাঁকে নীলামে ডেকে নেওয়ার মত লোকের সন্ধান পাওয়া গেল না। তাই রণজিৎবাবুর ছোট ছেলে কেদারনাথ, নিজের নামে ডেকে নিয়ে পিতৃপুরুষের স্মৃতি রক্ষা ক'র্‌লেন মাত্র!

* * * *

কেদারনাথ বড় ঘরের ছেলে। রক্তের সঙ্গে মিশে ছিল তাঁর পূর্ব্ব-পুরুষের সেই হারানো ঐতিহ্য। ইচ্ছা ছিল একদিন ঘরোয়া বিবাদে

যা ক্ষয় হ'য়ে গেছে, তা তিনি ফিরিয়ে নিয়ে আস্‌বেন নিজের বাহুবলে। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ। বংশের একমাত্র সুসন্তান সতীনাথ মারা গেল কয়দিনের জ্বরে। একেবারে মুষ্‌ড়ে পড়্‌লেন তিনি।

কন্যা মাধুরীর বয়স তখন দশ কিংবা এগারো। বংশের একমাত্র আশা ভরসা সে। কেদারনাথের প্রাণের আশা ও ভাষা ছিন্ন ভিন্ন হ'লেও একেবারে নিঃশেষ হ'য়ে গেল না। তিনি মনে মনে স্থির ক'রে নিলেন একটি ছাপোষা ভদ্রঘরের ছেলেকে, জামাতারূপে বরণ ক'রে তাঁর জীবনের আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেবেন মনের মত ক'রে।

সেই আশার সেতু রচনার বাসনায়, প্রতিবেশী ও বাল্যবন্ধু অঘোরনাথের দ্বিতীয় পুত্র বিনয় চৌধুরীকে নিজ ঘরে আশ্রয় দিলেন তিনি। ভবিষ্যতে যাতে সে একটি স্বনামধন্য মানুষে পরিণত হয় সে ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতিও দিলেন সেইসঙ্গে।

অঘোরনাথ দরিদ্র, মধ্যবিত্ত ঘরের মানুষ। ধীর, স্থির ও চরিত্রবান্‌। দুঃখের দিনে এমন নিঃস্বার্থ বন্ধুর সন্ধান পাওয়া যায় না সহসা। কিন্তু আত্মবিক্রয়ের পরিপন্থী ছিলেন না কোনদিন। দুঃখ ও কষ্ট তাঁর আজীবনের সহচর। তার সঙ্গে তিনি জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত লড়াই ক'রে এসেছেন, তবুও কারও কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেননি। অথচ স্বেচ্ছায় তিনি এ প্রস্তাবে রাজী হ'য়ে প'ড়্‌লেন শুধু শোকাতুর বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে। পাঁচ সন্তানের পিতা তিনি। তার একটাকে যদি কারও দুঃখ ও ব্যথা নিবারণের আশায় বিলিয়ে দিতে হয়, সে স্বার্থ ত্যাগের মত দৃঢ়তা তাঁর ছিল। তাই লোকে উপহাস ক'র্‌লেও কোন-দিকে ভ্রূক্ষেপ ক'র্‌লেন না তিনি।

অঘোরনাথের স্ত্রী মনোরমা, বরং একটু মৃদু আপত্তি তুল্‌লেন। ব'ল্‌লেন—সন্তান বিক্রয় আমি জীবন থাক্‌তে ক'র্‌তে দেবো না!

শান্ত ও ধীর কণ্ঠে বোঝাতে চেষ্টা ক'র্‌লেন অঘোরনাথ—বিক্রয় ত

ঠিক ক'র্ছো না। বরং ধরে নিতে পারো বিলিয়ে দিচ্ছো—নিঃস্বার্থভাবে। অবশ্য মানি সে তোমার ছেলে—তাকে ভালও তুমি বাসো অন্তর দিয়ে। কিন্তু সে মানুষ হোক, সুখী হোক—এ কামনাও ত করো মনে-প্রাণে! একটু থেমে ব'ল্লেন—আমি ত চিনি কেদারনাথকে! সে ধনী। সে জমিদার। সবই সত্য। কিন্তু তার অন্তর যে আছে একথা ত উপহাস্যে উড়িয়ে দিতে পারো না কোনদিন। তাই ব'ল্ছিলাম, এ প্রস্তাবে দ্বিধামত করা উচিত হবে না তোমার।

কয়েক মিনিট নীরবে থেকে মনোরমা ব'ল্লেন, সন্তানকে কি এত সহজে বিলিয়ে দেওয়া যায়? না—মা তা পারে কোনকালে?

উত্তর খুঁজে পান না অঘোরনাথ। তবুও বলেন—দেখো কাগজের দলিল একটা বাঁধনের গণ্ডী! তাকে যে কোন মুহূর্ত্তে ছিঁড়ে ফেলা যায়, তার সেই বাঁধনটাকে অস্বীকারও করা যায়, কিন্তু এই যে অন্তরের বাঁধন, এই যে স্নেহ, মায়া ও মমতার গণ্ডী—এ বস্তুটাকে কি কেউ কোনদিন সীমাবদ্ধ ক'র্তে পেরেছে, না—সম্ভব কোনযুগে?

মনোরমা একটু জোর দিয়েই উত্তর দিলেন—দৃষ্টান্তের অভাব কি আছে এ জগতে?

অভাব! একটু টেনে মৃদু হাস্লেন অঘোরনাথ। ব'ল্লেন—সেকথা সত্য! অভাব এ-জগতে কোন কিছুরই নেই। তবে কি জানো, অন্তরের সঙ্গে প্রতারণা চলে না কোনদিন। মানুষ, সে যতই শক্তিশালী হোক, যত বীর্য্যবানই হোক, সে গণ্ডীকে অতিক্রম ক'র্তে পারেনি কোন যুগে। বুঝ্লে মনোরমা, একটু থেমে পুনরায় হাস্লেন অঘোরনাথ। ব'ললেন, এ বস্তুটাই তার জীবনের চরম দুর্ব্বলতা—এর হাত থেকে মুক্তি তার নেই কোনকালে!

কয়েক সেকেণ্ড নীরব থেকে পুনরায় মুখর হ'য়ে উঠ্লেন—সেখানে নারী নেই, পুরুষ নেই—সব একাকার! মানুষ মরেছে—মর্বে—এটাও

যেমন চিরন্তনী—এ-বস্তুটিও ঠিক তেমনি বাস্তববাদী। তার রুচিভেদ নেই, প্রকারভেদও নেই—সে সত্য চিরকাল। তাই—মুখে অস্বীকার ক'রলেও অন্তরটা তার চিরদিন রিক্ত থেকে যায়। সে অভাব তার পূর্ণ হয় না কোনদিন !

যুক্তির কাছে হার মান্‌লেন মনোরমা, কিন্তু মাতৃ-হৃদয় তাঁর ব্যথা ও বেদনায় টন্‌টন্ ক'রতে লাগলো। তবুও স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রলেন না এইটুকু ভেবে—যদি ছেলেটা সত্যই মানুষ হয়, সুখী হ'তে পারে কোনদিন !

* * * * *

মনোরমা নীরব। কিন্তু অঘোরনাথ উপলব্ধি ক'রলেন তাঁর হৃদয়ের মর্ম্মবেদনা। ব'ল্‌লেন, অন্তরে মিথ্যা ক্ষোভ পুষে রেখো না মনোরমা ! তাতে জীবনটা বিষময় হ'য়ে ওঠে। নিজেই একটু বুঝ্‌তে চেষ্টা করো—ছেলে তোমার—সে চিরদিন তোমারই থাক্‌বে। শুধু লালন পালনের ভার দিলাম কেদারনাথের ওপরে।

মনোরমা বোঝেন, সন্তানকে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করার যে অন্তরবেদনা, সহজে কি তা দূর করা সম্ভবপর কোনদিন। তবুও নিজেকে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করেন। মনকে প্রবোধ দেন, ছেলে তাঁর বিদেশে গেছে, মানুষ হ'য়ে পুনরায় ফিরে আস্‌বে ঘরে। তেমনি মধুর স্বরে পুনরায় মা, মা…ব'লে ডাক্‌বে !…হ্যাঁ…ডাক্‌বে বইকি ! এত সহজে কি সে ভুলে যাবে তার জনম-দুঃখিনী মাকে ? ও কি সম্ভব ?…

অঘোরনাথ মিথ্যা স্তোকবাক্যে লোক ভোলানোর মত মানুষ ছিলেন না। তিনি পিতা, বোঝেন শোকাতুর পিতৃহৃদয়ের জ্বালা—সেই জ্বালা বিদূরণের আশায় বন্ধুর কাছে ছেলেকে সাময়িক গচ্ছিত

রেখেছিলেন মাত্র। তাই মাঝে মাঝে ঘরের ছেলেকে ঘরে ফিরিয়েও নিয়ে আসেন নিজের খুশীমত। অবশ্য সে কাজটা তিনি করেন অতি সঙ্গোপনে। ভয় তাঁর আছে, কেদারনাথ না অহেতুক ব্যথা পান অন্তরে। তার জন্যই ত খোঁজেন একটা উপলক্ষ্য। খুশী হ'ন মনোরমা। ভাবেন, সত্যই ছেলে তার পর হ'য়ে যায়নি, বরং একটু দূরে সরে আছে মাত্র !···

এমনি ক'রে কেটে গেল দীর্ঘ সাতটি বছর। ছেলে পর পর তিনটে পাশ ক'রে ল' কলেজে ভর্ত্তি হ'ল। অঘোরনাথ সহসা মৌনতা ভঙ্গ ক'রে মুখর হ'য়ে উঠ্‌লেন, কি গো—তোমায় কি সেদিন মিথ্যা স্তোক দিয়েছিলাম আমি ? বিনয় কি আজ আমার ছেলের মত একটা ছেলে হ'য়ে ওঠেনি ?

মনোরমা খুশী হ'য়েছেন সকলের চেয়ে বেশী। পাড়া-প্রতিবেশী সকলে যে ছেলের প্রসংশায় পঞ্চমুখ হয়, সে ছেলের মা হওয়া কি কম সৌভাগ্যের কথা ? হাসি-ভরা মুখে উত্তর দেন—তোমাকে কি অবিশ্বাস ক'রেছি কোনকালে ?

উত্তরে অঘোরনাথও একটু হাসেন। বলেন, তা' বটে !

মনোরমা বলেন—ছেলের আমার বয়সও ত হ'ল। দেখে শুনে ঘরে টুকটুকে একটি বৌ এনে দাও এবার।

কথাটা শুনেই গোপনে শঙ্কিত হ'য়ে ওঠেন অঘোরনাথ। তিনি ত জানেন কেদারনাথের অন্তর-বাসনা। অথচ মুখফুটে সেকথা প্রকাশ তিনি ক'রতে পারেননি কোনদিন। বলেন—ছেলের বিয়ে, দিলেই হ'ল ! তার জন্যে তাড়াহুড়োর—

কথার মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়েন মনোরমা, বলেন—বৌ না আন্‌লে ঘর কি আমার মানায় ?

কেন ? এক বৌ-এ বুঝি তোমার মনের সাধ মিট্‌লো না !

সহজে কি তা মেটে !

তা ভাল ! সংক্ষেপে উত্তর দিলেন অঘোরনাথ। ব'ল্‌লেন—শুধু পাশ ক'র্‌লেই ত হবে না ! নিজে সে আগে উপায় ক'র্‌তে শিখুক।

যে ছেলে আমার তিন তিনটে পাশ ক'রেছে, সে উপায়ও ক'র্‌বে গো একদিন। তার জন্যে আবার এত চিন্তা কিসের শুনি ?

চিন্তা ! মৃদু হাসেন অঘোরনাথ। বলেন—পুরুষের চিন্তার মর্ম্ম তোমরা বুঝ্‌বে না কোনদিন ! অবশ্য একটু টেনে ব'ল্‌লেন, দোষটা ঠিক তোমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া উচিত হবে না—দোষ স্বয়ং সৃষ্টি-কর্ত্তার। তিনি নিজেই সে শক্তি ও সামর্থ্য তোমাদের দেননি। তাই শুধু সংসার নিয়েই ডুবে থাকো—পুরুষের হৃদয়ের দিকে ফিরে তাকাবার অবকাশ পাওনা কোনদিন !

দোষটা কি শুধু একা মেয়েদের ! একটু ঝাঁঝালো স্বরে প্রতিবাদ ক'রে উঠ্‌লেন মনোরমা। ব'ল্‌লেন, তোমরাও কি নারী-জাতের হৃদয়ের দুঃখ ও বেদনার ইতিহাস তলিয়ে দেখার অবসর পেয়েছো কোনকালে ?

মৃদু হাস্‌লেন অঘোরনাথ। ব'ল্‌লেন—মিথ্যে উত্তেজিত হ'য়ো না মনোরমা ! যারা অবুঝ তাদের মুখে এ প্রশ্ন শোভা পায়—কিন্তু তুমি ত সে জাতের মেয়ে নও। স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট ক'রে বলতো—নিজের সুখ ও তৃপ্তির জন্যে পুরুষের জীবনের চাহিদা কতটুকু ? কতটুকুই বা সে নিজে ভোগ, উপভোগ করে তার জীবনে ?

মনোরমা নীরব।

অঘোরনাথ বলেন—দেখো, পুরুষের জীবন অফুরন্ত একটা আশার ভাণ্ড। শুধু সে চায় নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে। কিন্তু তাকে সীমাবদ্ধ ক'র্‌তে পারো তোমরা—একা সেই নারী। তাই তার জীবনের যত কিছু সম্পদ, যত কিছু সুখ ও শান্তি—তার কেন্দ্রবিন্দু হ'লে তোমরা—সেই নারীজাতি। তোমরা তাদের জীবনের স্বপ্নপুরীর রাজকন্যা।

তোমাদেরই সুখ ও শান্তির আশায় সে দিনের পর দিন করে জীবনপাত—প্রতিটি রক্তবিন্দু করে ক্ষয়। তবুও তোমাদের সন্দেহ ঘোচে না—কারণ তোমরা পেয়ে তৃপ্ত—আর তারা নিজেকে ক্ষয় ক'রে পায় আনন্দ। সেটাই তাদের নেশা।

মনোরমা কি যেন প্রতিবাদ ক'র্‌তে চান।

অঘোরনাথ বলেন, সেই নেশার পিছনে একটা কিছু ফিরে পাওয়ার বাসনা যে তাদের নেই—এত বড় মিথ্যা জোর দিয়ে বলার শক্তি আমার নেই, তবুও বলি জয় করে রিক্ত হওয়াই তার সাধনা। সেটুকুই তার তৃপ্তি! তাই ত বারবার তোমায় অনুরোধ করি তোমাদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার একটু করো! এ পৃথিবীর চারিধারে একটিবার ভাল করে তাকিয়ে দেখ, তবেই বুঝ্‌বে তারা শুধু কামনা ও বাসনার তন্ত্রধারক নয়—সত্যকার জীবন-সাধক! সেই সাধনাই তারা ক'রে চলে আজীবন।

বারে আমার সাধক! মৃদু হাস্যে ব্যঙ্গ ক'রে উঠ লেন মনোরমা।

ধীর কণ্ঠে জবাব দিলেন অঘোরনাথ—উপহাস করো না! একটু চিন্তা ক'র্‌লে নিজেই উপলব্ধি ক'র্‌তে সমর্থ হবে, পুরুষের জীবনের যতটুকু সঞ্চয়, সবটুকুই তার সাধনা। তাই যখন সে অর্থের কথা করে চিন্তা, তখন অর্থোপার্জ্জনই হয় তার জীবন-সাধনা। যখন সে শক্তি অর্জ্জনের চেষ্টা করে, তখন সেই শক্তি সাধনাই হয় তার জীবন-মরণ পণ—যখন সে হয় গৃহী, তখন গৃহই হয় তার দেউল। আবার যখন মনে জাগে তার সর্ব্বস্ব ত্যাগের বাসনা—তখন সে হয় বৈরাগী—সন্ন্যাসী—সর্ব্বহারা মানুষ।

মনোরমা গম্ভীর হ'য়ে উঠ্‌লেন। ব'ল্‌লেন—তাই ত তাদের সহসা বিশ্বাস করা যায় না!

অবিশ্বাস? তা বটে! মৃদু হাস্‌লেন অঘোরনাথ। ব'ল্‌লেন, তা আমি সর্ব্বান্তঃকরণেই সমর্থন করি। এত দীর্ঘদিন পাশাপাশি বসবাস ক'রেও আজও তুমি আমায় এতটুকুও চেনোনি, বিশ্বাসও করোনি।

তার মানে? মনোরমার কণ্ঠস্বর রীতিমত গম্ভীর হ'য়ে উঠ্‌লো। ব'ল্‌লেন—তুমি কি ব'ল্‌তে চাও—তোমায় আমি অবিশ্বাস করি?

এতক্ষণ হাস্যলাস্য ও তার লঘু পরিবেশের মধ্যে সময়টা সহজভাবেই অতিবাহিত হচ্ছিল, সহসা তার রূপ পরিবর্ত্তিত হওয়ায় অঘোরনাথ নিজেকে সংযত ক'রে নিলেন। মৃদু হাস্যে উত্তর দিলেন—তা কেন? আমি ত তোমায় সর্ব্বান্তঃকরণেই বিশ্বাস করি। কিন্তু তুমিই ত একটু আগে ব'ল্‌লে আমাদের বিশ্বাস ক'র্‌তে পারো না একটিও মুহূর্ত্ত।

মিথ্যা কথা! বরং বলো এতটুকুও বিশ্বাস করো না আমাকে। একটু জোর দিয়ে কথা কয়টি ব'লেই উঠে দাঁড়ালেন মনোরমা। কয়েক পা এগিয়ে পুনরায় পিছন ফিরে দাঁড়ালেন। একটু উত্তেজিত কণ্ঠে ব'ল্‌লেন, যদি সত্যই বিশ্বাস ক'র্‌তে পার্‌তে, তা হ'লে আমার অন্তরের কথাও হৃদয়ঙ্গম ক'র্‌তে পার্‌তে—মিথ্যে অজুহাতে নিজেদের স্তুতিগান গাইতে বস্‌তে না।

স্তুতিগান?

নিশ্চয়। পুরুষ জাতটা যে বড়—এ কথা সৃষ্টির প্রথম যুগ থেকে বার বার সদম্ভে তোমরা ঘোষণা ক'রে এসেছো এবং যতদিন এ প্রথা বজায় থাক্‌বে—ততদিন তারস্বরে তোমরা চীৎকারও ক'র্‌বে। অবশ্য একটু থেমে সংযত কণ্ঠে ব'ল্‌লেন, তারজন্য সকল সময়ে তোমাদেরও দায়ী করা চলে না—দায়ী আমরা নিজেরাও। কারণ, এতদিন নতি স্বীকার ক'রে এসেছি বলেই তো, তোমরা সেই সহজাত দুর্ব্বলতার আশ্রয় গ্রহণ করো।

মাঝপথে বাধা দিয়ে ব'লে উঠ্‌লেন অঘোরনাথ, একটু বেশী উত্তেজিত হ'য়েছো ব'লে মনে হ'চ্ছে মনোরমা!

মনোরমা তীব্র প্রতিবাদ ক'রে উঠ্‌লেন—না—না—না, এতটুকুও না। আমি মা, আমার একটা কথা বলার অধিকার কি আজও জন্মায়নি!

হেসে উঠ্‌লেন—অঘোরনাথ। ব'ল্‌লেন, কে ব'ল্‌লে তোমার অধিকার নেই? বরং দাবী তোমার সকলের চেয়ে বেশী। এমন কি আমার চেয়েও।

থাক্ থাক্ ঢের হ'য়েছে! বাধা দিয়ে উঠ্‌লেন মনোরমা। কথায় শুধু বড় ক'রে—কাজের সময়ে নিজের মত চালাতে আমরাও পারি। শুধু পারিনে এই যা দুঃখ!

দুঃখ নয় মনোরমা—বরং বলো, জয়ী তোমরা এখানেই! পুরুষ শক্তিশালী—কিন্তু সেই শক্তি ধারণ করার ক্ষমতা রাখো একা তোমরাই! তাই তোমাদের বাধা দিয়ে, তোমাদের ব্যক্তিগত মতামতকে উপেক্ষায় উড়িয়ে দিয়ে—কোন কাজ করার শক্তি সত্যই সাধারণ পুরুষজাতের নেই—হবেও না কোনকালে।

একটু থেমে ব'ল্‌লেন—তোমরা দুঃখ করো—তোমরা দুর্ব্বল। হয়ত এটা তোমাদের অসহিষ্ণু অন্তরের খেদ ও বাহ্যিক জগতের মৌলিক অভিমান! অথচ তোমরা নিজেরাও জানো, এ পৃথিবীতে তোমাদের মত শক্তি ধারণের ক্ষমতা—আর দ্বিতীয় বস্তুর আর নেই!—

হেসে ফেল্‌লেন মনোরমা। ব'ল্‌লেন, কিন্তু স্তুতিবাদের মাত্রাটা একটু ছাপিয়ে চলেছে যেন—

না এতটুকুও না—শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন অঘোরনাথ। ব'ল্‌লেন—বরং যা সত্য তারই বর্ণনা দিয়েছি মাত্র! একটু থেমে মনোরমার মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাস্‌লেন। ব'ল্‌লেন, দেখো প্রকৃতির গঠন-চাতুর্য্যে তোমাদের বহিঃবিশ্বে সত্যই রমণীয় ও কমনীয় বলে প্রতীয়মান হয়, কিন্তু বাস্তবপন্থী যারা—তারাই জানে, তোমাদের ওই অন্তর-জগতের জিদ ও চোখের জলের মত শক্তিশালী অস্ত্র এ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় আবিষ্কৃত হয়নি। বুঝ্‌লে, একটু টেনে ব'ল্‌লেন, ওর কাছে আমাদের এই পুরুষ-জাতটাকে হার মান্‌তেই হয় চিরকাল!

মনোরমা উত্তরে মৃদু হাস্‌লেন। ব'ল্‌লেন, তাই বুঝি সারাটা জীবন শুধু চোখের জল ফেলাও?

ধীর কণ্ঠে জবাব দিলেন অঘোরনাথ—অবিচার ক'রো না মনোরমা! চোখের জল তোমরা হামেসাই ফেলো—সেটা কিন্তু তোমাদের নিজেরই গরজে! ফলে,—তোমাদের ওই দু' মিনিটের উচ্ছ্বসিত অভিমান—আমাদের সারাটা দিনের কাজ পণ্ড ক'রে দেয়। অবশেষে নিজেদের পরাজয় নিজেরাই স্বীকার ক'রে নিতে বাধ্য হই—শুধু এতটুকু শান্তি লাভের আশায়! আর তখন বিজয় গর্ব্বে উচ্ছ্বসিত তোমাদের দেহ-মন, আনন্দের প্রাচুর্য্যের চকিতে উদ্বেলিত হ'য়ে ওঠে। তোমরা ভাবো—জয়: আমরা অনুভব করি তৃপ্তি! এরই খেলা সারা জীবনে চলে অনিবার। তবুও খেদের শেষ নেই—যেন অনাদি অনন্তের মতই সীমাহীন সে!—

মনোরমা উত্তরে তেমনি মৃদু হাস্‌লেন। গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন তুল্‌লেন—তারপর?

সাধারণতঃ যা হয় তাই হবে! জয় তোমারই হবে। নির্লিপ্ত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, অঘোরনাথ।

মানে—মনোরমার কণ্ঠস্বরে কুতূহল ঘনীভূত হ'য়ে ওঠে।

তেমনি গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন অঘোরনাথ—সংসারে মিথ্যা অশান্তি বাড়িয়ে ত লাভ নেই! ছুটি কেদারনাথের কাছে। ইচ্ছা যখন তোমার হ'য়েছে—তখন যা হোক্ ব্যবস্থা ত একটা ক'র্‌তেই হবে!

সত্যি? অবিশ্বাস্যের সুরে প্রশ্ন তোলেন মনোরমা।

হাস্‌লেন অঘোরনাথ। ব'ল্‌লেন—মিথ্যা আশ্বাস ত কোনদিন তোমায় দিইনি! একটু পূর্ব্বে অভিযোগ ক'রেছো—তোমাদের কথা আমরা শুনি না-ভেবেও দেখি না—কিন্তু দুঃখ র'য়ে গেল—যদি এতটুকু পড়্‌তে শুন্‌তে জান্‌তে, দেখিয়ে দিতাম, জগতের মণীষি ব্যক্তিরা তোমাদেরই দুঃখের ইতিহাস রচনা ক'রে গেছেন যুগের

পর যুগ। একটু থেমে বল্লেন, দেখো—তোমাদের জীবনের হাসি ও কান্নার চিত্রই এ পৃথিবীর জীবন্ত ইতিহাস। তাই তোমাদের তৃপ্তিই জগতের শান্তি! তার বেশী অনেক কিছুই হয়ত জীবন-প্রাঙ্গণের আশ্-পাশে ছড়িয়ে র'য়েছে সত্য, কিন্তু সেগুলো আবর্জ্জনা—তার মূল্য কেউ বুঝে না—দেয়ও না,—দেবেও না—কোনকালে!…

* * * * *

মাধুরী ষোড়শী। এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বিয়ের বয়স যে তার বহু পূর্ব্বেই সমাগত, একথা কেদারনাথ মনেপ্রাণেই বিশ্বাস করেন। কিন্তু সে বংশের একমাত্র সন্তান। নয়নের মণি, অন্ধের যষ্ঠি। তাকে কাছ ছাড়া করার চিন্তাটাও রীতিমত একটা বিভীষিকার সৃষ্টি ক'রে চলে। তাই আজ না হয় কাল, কাল না হয় পরশু, এমনি ক'রে দিনের পর দিন ও চিন্তাটাকে এড়িয়ে এসেছিলেন বছরের পর বছর। কিন্তু বিনয় যখন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটা ডিগ্রী সংগ্রহ ক'রে আন্‌লো—তখন তিনি আর স্থির থাকৃতে পার্‌লেন না। আত্মীয়-স্বজন হয়ত বিস্ময় বোধ ক'রবেন—কেদারনাথ অতীতের জমিদার বংশের আভিজাত্যকে খর্ব্ব ক'রে, এক দরিদ্র-মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়া স্থির ক'র্‌লো, কিসের প্রলোভনে? সে প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্যও তিনি প্রস্তুত হ'য়ে রইলেন। কারণ, তাঁর কাছে সকলের চেয়ে প্রলোভনের বস্তু ছিল, এই ছেলেটি। বিশেষ ক'রে সে যেরূপ শিক্ষিত, তেমনি নম্র, ধীর ও চরিত্রবান্। সাংসারিক জীবনে এ বস্তুটির প্রয়োজন সকলের চেয়ে বেশী।

মনের গহন কোণে যে বাসনা দানা বাঁধে অতি সহজে,—তার বাস্তব-রূপদানের সেই বলবতী ইচ্ছাটা কিন্তু বহির্জগতে তত সহজে আত্ম-

প্রকাশ ক'রতে পারে না। সে পথের প্রধান অন্তরায় হ'ল আজন্মের সংস্কার। রক্তের সঙ্গে মেশানো সেই আভিজাত্যের দম্ভ।

অঘোরনাথ প্রতিদিনই তাঁর বাড়ীতে আসেন। গল্প-গুজব করেন। যথারীতি চা ও জলপান শেষ ক'রে বাসায় ফিরে যান কিন্তু আত্মপ্রকাশ ক'রতে পারেন না কেদারনাথ। কখনও ভাবেন, তিনি মেয়ের বাপ, গরজ তাঁরই ত বেশী! কিন্তু সহসা মাথা নত ক'রতে তাঁর আত্মসম্মানে বাধে। তাই ধৈর্য্যসহকারে অপেক্ষা ক'রতে থাকেন, কবে অঘোরনাথ সেই কথাটা পাড়্‌বে! হ'লই বা ছেলে—তারও ত একটা বয়স আছে! বাপ হ'য়ে সেই অতীতটাকে ত উপেক্ষায় উড়িয়ে দিতে পার্‌বে না অঘোরনাথ!

এমনি অধীর অপেক্ষায় ছ'টি মাস অতিবাহিত হ'য়ে গেল। এ পাশে বিনয়ের এম. এ. ও ল'. পড়ার ব্যবস্থাও ক'রে দিলেন নিজেরই খুশীমত। কারণ, হাতে ছেলে এবং তার বাপকে রাখ্‌তেই হবে। নইলে, মেয়ের বাপের ত অভাব নেই এ সংসারে। কে কখন প্রলুব্ধ ক'র্‌বে—কে জানে? যদিও অঘোরনাথ সে প্রকৃতির মানুষ নন, তবুও দরিদ্র ত বটে! অর্থের প্রলোভনে যদি প্রলুব্ধ হন, তাঁকে দোষও ত দেওয়া চ'ল্‌বে না! ব'ল্‌তেই পারেন, আমি ত অপেক্ষা ক'রেই ছিলাম কিন্তু তোমার কাছ থেকে কোন ইঙ্গিত না পেয়েই অন্য ব্যবস্থা ক'রতে বাধ্য হ'য়েছি।···এখন সে পথটা হ'ল ত নিষ্কণ্টক! যে পথ তিনি অবলম্বন ক'র্‌লেন সে দিকে তাকিয়ে অন্ততঃ আরও দুটো বছর ত অপেক্ষা ক'র্‌তেই হবে তাঁকে!···

ইতিমধ্যে মনোরমার কাছে তাগিদ পেয়ে, অঘোরনাথ নিজেই সে রাতে কথাটা পেড়ে ব'স্‌লেন। ব'ল্‌লেন—আমার নিজের যে খুব একটা তাগিদ আছে তা ঠিক নয় কেদারনাথ, কিন্তু মার জীবনের সাধ ও আহ্লাদ ব'লে একটা বস্তু আছে! বিশ্বাস ক'র্‌বে কিনা ঠিক জানি না—

তবে একথাটা সত্য, জীবন আমায় প্রায় অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছেন এই কয়েকটা মাস। একই কথা—বার বার শুনি, ঘরে বৌ না নিয়ে এলে ঘর কি মানায় কোনদিন? একটু টেনে ব'ল্লেন, কথাটা হয়ত সত্যই উড়িয়ে দেওয়াও যায় না! কারণ, বয়স ব'লেও ত একটা বস্তু আছে। সে ছেলেই হোক্ আর মেয়েই হোক্। অবশ্য তোমার কাছে যখন ছেলেকে আমি সঁপে দিয়েছি, তখন আমার চেয়ে তোমার দায়িত্বই বেশী। যা ভাল বোঝো তাই ক'রো। আমি শুধু কথাটা শুনিয়ে রাখ্লাম মাত্র।...

কেদারনাথ এরই আশায় বসেছিলেন এতদিন। তিনিও খুশীমনে যোগ দিলেন সে আলোচনাতে। দিনও স্থির হ'য়ে গেল সেই আসরে।

* * * * *

বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে ঘটা ক'রে মাধুরীর সঙ্গে বিনয়ের বিয়ে হ'য়ে গেল। প্রতিবেশীরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ হ'লেন, কিন্তু প্রধান সমস্যা দেখা দিল—তারা স্থায়ী বাসা বাঁধ্বে কোন্খানে?

অঘোরনাথের ইচ্ছা, ছেলে-বৌ তাঁরই ঘরে অন্ততঃ বসবাস করুক কিছুদিন! এপাশে কেদারনাথও আবার মেয়েকে ছেড়ে একটি মুহূর্ত্তও স্থির থাক্তে পারেন না। তাই তিনি জিদ্ ধ'রে ব'স্লেন—মেয়ে-জামাই অন্ততঃ তিনি যতদিন জীবিত আছেন ততদিন বসবাস করুক তাঁরই আস্তানায়!

অঘোরনাথ পীড়াপীড়ি ক'রলেন না। কারণ তিনি ত চেনেন কেদারনাথকে! কিন্তু বিষম বিপদে পড়্লো বিনয়। এখন তার কি করা কর্ত্তব্য? এক পাশে পালিত পিতা ও শ্বশুর কেদারনাথ, অন্য পাশে জন্মদাতা পিতা অঘোরনাথ ও গর্ভধারিণী মা মনোরমা। দাবী উভয় পক্ষেরই সমান। অথচ কারও অনুরোধ উপেক্ষায় উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

মাধুরীর বয়স হ'য়েছে। সে সংসারে প্রবেশের পূর্ব্বেই সংসারের জটিল আবহাওয়াকে চিনে নেওয়ার পরিপূর্ণ সুযোগ পেয়েছে জীবনে। তাই স্বামীর এই সঙ্কটের দিনে, অকারণ লজ্জার বোঝা দূরে ঠেলে একেবারে সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো। ব'ল্‌লো, আমার মা-বাবাও যেমন, তোমার মা-বাবাও তেমন। সুতরাং আমাদের কর্ত্তব্য উভয় সংসারের আকর্ষণ থেকে সমান দূরত্বের ব্যবধানে বসবাস করা। তাতে হয়ত সাময়িক দুর্ণাম র'ট্‌বে, কিন্তু আত্মীয়তা ও প্রীতির মধুর সম্পর্কটা উভয় পক্ষের কাছে সমান মর্য্যাদালাভে সমর্থ হবে। আমার মা কিংবা বাবা তাঁদের খুশীমত যাতায়াত ক'র্‌তে পার্‌বেন—ওপাশে শ্বশুরম'শায় বা শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণীও তাঁদের নিজস্ব অধিকারের দাবীটা প্রতিষ্ঠা ক'র্‌তে পার্‌বেন নিজেদের খুশী ও খেয়ালমত !

কথাটা বিনয়ের মনে লেগে গেল। এক পক্ষকে সে খুশী ক'র্‌তে চাইলেই—অপরে পক্ষপাতিত্বের দোষারোপ ক'র্‌বেই এবং সে বস্তুটাই স্বাভাবিক। তার চেয়ে বরং একটু দূরে সরে থাকাই শ্রেয়ঃ এবং যুক্তিসঙ্গত।

বিয়ের উৎসবের জেরটা স্তিমিত হ'লে, বিনয় সেই কথাটাই পাড়্‌লো অঘোরনাথের কাছে। ব'ল্‌লো—আমার ইচ্ছা নয় তোমাদের আবাল্য বন্ধুত্ব আমাদের উপলক্ষ্য ক'রে কেন্দ্রচ্যুত হয়। তাই চাই, একটু দূরে পৃথকভাবে বসবাস ক'র্‌তে। তাতে লাভ বা ক্ষতি হবে না কারও।

কথাটা যুক্তিযুক্ত হ'লেও পিতৃ-হৃদয় ক্ষুব্ধ হ'ল। ভাব্‌লেন, ছেলের বিয়ে দিলেই সে মা-বাবার কথা যায় ভুলে। কারণ, কর্ত্তব্য তাঁদের শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মূল্যও তাঁদের ছেলের জীবন-পটভূমি থেকে ঝরে পড়ে নিঃশব্দে। অথচ দোষারোপও করা চলে না কাউকে। প্রকৃতির রীতিই ত এই ! যে ব্যক্তি ও বস্তুকে কেন্দ্র ক'রে রচিত হবে জীবন-ইতিহাস, সে-ই বস্তু ও ব্যক্তি জীবনে প্রিয়তর হওয়াই স্বাভাবিক।

সুতরাং এই এক আক্ষেপ ও দীর্ঘশ্বাস ছাড়া দ্বিতীয় পথ খোলা নেই আর ; ব'ল্লেন—বেশ, যা ভাল বোঝ, তাই করো ! বয়স হ'য়েছে, লেখাপড়াও শিখেছো—জোর ক'রে কিছু বোঝানো বা করানো ত যাবে না ! তবে তোমরা সুখী হও বা সুখে থাকো—এটাই মা-বাবা কামনা করেন সকল সময় ! এর বেশী বলা বা করার কিছুই অবশিষ্ট নেই আমাদের !

বিনয় বুঝ্লো বাপের অন্তরের গোপন ব্যথার সেই মর্ম্ম-বেদনা ! অথচ এটাও সত্য, তাঁর ক্ষুব্ধ অন্তরের এই সাময়িক উচ্ছ্বাস নামান্তরে ব্যথাহত জীবনের রুদ্ধ অভিমান—এর স্থায়ীত্ব স্বল্প কয়েকটা দিনের। তার বেশী কোন মর্য্যাদাই সে পাবে না বা পেতে পারে না কোনকালে। মাত্র কয়েকটা দিনের ব্যবধানে কাল্পনিক সেই অভিমানের পাহাড়টা নিজেরই অন্তরদাহে নিজেই গলে জল হ'য়ে যাবে অবশেষে। তবুও ত ব্যথা লাগে ! হায়রে স্নেহশীল পিতৃ-হৃদয়ের চরম দুর্ব্বলতা—

মনোরমার কানেও কথাটা ভেসে এলো। তিনি বিমর্ষ হ'লেন মনে-প্রাণে ! ছেলে-বৌ নিয়ে কোথায় সংসার বাঁধ্বেন—না অঙ্কুরেই তা উৎপাটিত হ'য়ে গেল। হায়রে সংসার ! তবুও ত তাকে গড়্তে ইচ্ছা হয় মনের মত ক'রে ! বুক ভেদ ক'রে নেমে আসে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস। বসে বসে ভাবেন—সমানে সমানে আত্মীয়তা না পাতালে, সংসারের সুখ-দুঃখের সমভাগী হ'তে পারে কি কেউ কোনদিন ! সে ধনীর দুহিতাই হোক্ আর দীন দরিদ্রের ঘরের মেয়েই হোক্—সে আবহাওয়াকে কোনদিনই কেউ আপন ব'লে গ্রহণ ক'র্তে পারে না। সুতরাং দোষ তাঁদের কাল্পনিক জীবনের। বাস্তব জীবনে কাউকে ত অপরাধী করা চলে না ! এটাই বাস্তব জগতের রূঢ় ইতিহাস !

* * *

মাধুরী ফিরে গেল বাপের বাড়ীতে। সেখানেও চলেছে সেই টানা অন্তর দ্বন্দ্ব। জয়ী হবে কে? স্নেহ না বন্ধুত্ব? জীবনে কোন্ বস্তুটার মূল্য সকলের চেয়ে বেশী? যাঁকে তিনি আমরণ বন্ধু ব'লে জানতেন, আজ স্বার্থের সংঘাতে চকিতে তাঁরও মুখোস গেছে খ'সে। অথচ এই আত্ম-বিস্মৃতির পথে, যে নোতুন বাঁধন উঠ্লো গড়ে, তাকেও ত উপেক্ষায় উড়িয়ে দিতে পারা যায় না আজ সহজে!

ভাবেন কেদারনাথ, মাধুরী তাঁর বাস্তব জীবনের হৃৎপিণ্ড। তাকে সুখীই তিনি দেখ্তে চান। কিন্তু তার সেই তৃপ্তিভরা হাসি-খুশী মুখ, নিজের চোখে না দেখ্লে—নিজেই যে নিশ্চিন্ত হ'তে পারে না একটি মুহূর্ত্ত। এখন উপায়?

বিনয়—সেও কি হবে এত বড় নির্দ্দয়? বুঝ্বে না পিতৃ-হৃদয়ের রিক্ততার বেদনা? না—না—না, সে বুঝ্বে না! কোন মতেই বুঝ্তে পারে না! রক্তের বাঁধনকে কেউ কি কোনদিন উপেক্ষা ক'র্তে পেরেছে? না—তাকে দোষারোপ করা আজ বৃথা! সেও ত সামাজিক মানুষ! তারও ত একটা সমাজ আছে। সেখানে মাথা উঁচু ক'রেই তাকে বসবাস ক'র্তে হবে। নইলে মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা সে পাবে কেমন ক'রে? না—না—না,—বিচলিত হ'য়ে ওঠেন কেদারনাথ। না—তাকে মুক্তি দেওয়াই ভাল। মুক্তিই আমি দেবো—

কিন্তু মাধুরী? সে ত তাঁর নিজের ঔরসজাত সন্তান! সে কি বুঝ্বে না, তাঁর তৃষাতুর হৃদয়ের ব্যথা ও বেদনার রিক্ততা? সেও কি এই স্নেহ, প্রীতি ও মমতার প্রতিদানে—এতটুকুও স্বার্থ ত্যাগ ক'র্তে পার্বে না তার জীবনে? এই যে বাঁধন—মাত্র কয়েকটা দিনের বাঁধন! সেটাই কি হবে তার জীবনে সব চেয়ে প্রিয়তর বস্তু? না—না—না—তাকি সম্ভব কোনদিন? দীর্ঘ ষোল বছরের প্রাণের এই গভীর সংযোগকে কি এতই সহজে সে উপেক্ষায় উড়িয়ে দিতে সমর্থ হবে

কোনকালে? তবুও নিশ্চেষ্ট হ'তে পারেন না কেদারনাথ। নিজের মনে নিজেই প্রশ্ন তোলেন—তবে কি স্নেহ, মমতা, ও প্রীতির মূল্য সত্যই নেই এ দুনিয়ায়?

কে বলে নেই? তবে কিসের আশায়, কিসের আকর্ষণে তিনি আজও জীবনযাপন ক'রে চলেছেন দিনের পর দিন? সহসা অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ থেকে কে যেন কাত্‌রে উঠ্‌লো সেই মুহূর্ত্তে!

কানটা খাড়া ক'রে—শোনেন কেদারনাথ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, সত্যই আকুলি বিকুলি হ'য়ে কাঁদ্‌ছে তাঁর অন্তর। কাঁদ্‌ছে তাঁর মন। কাঁদ্‌ছে দেহের শিরা-উপশিরা। যে দু'দিন আগেও ছিল আমার, আজ সে—সেরূপ একান্ত আপন হ'য়ে আমারই বা থাক্‌বে না কেন? না—না, থাক্‌বে—আপনার রূপেই সে থাক্‌বে! মনকে প্রবোধ দেন কেদারনাথ। না—না—না,—তাকে ত্যাগ করার শক্তি তাঁর নেই। তাকে কেন্দ্র ক'রেই পরিপূর্ণ তিনি! সে ছাড়া তাঁর কোন মূল্য আছে কি এ জগতে?

নিজের অজ্ঞাতে গণ্ড ব'য়ে গড়িয়ে পড়্‌লো কয়েক ফোঁটা চোখের জল। উষ্ণ পরশে তার সহসা সচকিত হ'য়ে উঠ্‌লেন তিনি। ভাব্‌লেন, স্বার্থান্ধ হৃদয়ের একি দুর্ব্বলতা! সে যে জীবনের পুঞ্জীভূত আশার প্রতিবিম্ব! রক্ত-মাংসের জীবন্ত প্রতীক—সন্তান আমার! না—না—সে সুখী হোক্! সর্ব্বান্তঃকরণে সেই কামনাই ত আজ হৃদয়ে পোষণ করেন তিনি!

তবুও অন্তরে জাগে একটা বেদনার সুর। তার তীব্র কশাঘাতে হৃদয়টা প্রতিনিয়তই টন্ টন্ ক'রে ওঠে।...ভাবেন কেদারনাথ, কিন্তু এরই জন্য ত সৃষ্টি! এরই জন্য এত আকুলতা, এত ব্যাকুলতা, এত আশা ও উদ্দীপনা!—এদের কেন্দ্র ক'রেই ত চলে জীবন-সাধনা—অথচ জীবনে ওরা কেউ নয়, কেউ নয়, কেউ নয়,—হায়রে জগত!

তবুও চাই, হ্যাঁ চাই। ওদের সারা জীবনে নিবিড়তর ক'রে পাওয়া চাই—নইলে জীবন পায় না রূপ, সৃষ্ট পায় না তার নিজস্ব চলার গতিবেগ—আসে না নিজেকে চেনার পরিপূর্ণ অবসর।

…আনন্দ! হ্যাঁ, হ্যাঁ—আনন্দ বই কি! সেই পুলকের অমৃত ধারায় ভুলে যায় মানুষ তার সৃষ্টির ব্যথা—নিজেকে হারিয়ে খুঁজে পায় নিজেরই বৈশিষ্ট্য! তাই স্বেচ্ছায় তুলে নেয় শত দুঃখের বোঝা। হাসিমুখে সেই বোঝার ভার ব'য়েও সে পায় তৃপ্তির সুখ-পরশ। নিরাশার আবর্ত্তে বার বার ঘুরপাক খেয়েও সেই দুঃসহ বেদনার রাজ্যে করে অমৃতের সন্ধান। এরই নাম জীবন—এরই সাধনায় থাকে সে মগ্ন! ক্ষয় করে তার শরীরের প্রতিটি রক্তবিন্দু—দিনের পর দিন, বছরের পর বছর।

চুড়ির ঝন্ ঝন্ শব্দে সহসা সচকিত হ'য়ে উঠ্‌লেন কেদারনাথ। মুখ তুলে চেয়ে দেখ্‌লেন, সম্নে দাঁড়িয়ে মাধুরী। চোখে মুখে তার উদ্বেলিত হৃদয়ের উদ্ভাসিত এক গভীর আবেশময়ী নেশা। আশা ভরপুর চোখের দুটো তারা—আনন্দের মৃদু কম্পনে শিহরিত ঠোঁটের দুটো পাতা। তারই ফাঁকে ভেসে আসে লঘু মৃদু কণ্ঠস্বর,—বাবা!

কেদারনাথ ভুলে যান আপনাকে। অতৃপ্ত পুলকে উদ্বেলিত হয় অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ। আবেগে কোলের কাছে মাধুরীকে টেনে নিয়ে ব্যাকুল কণ্ঠে বলে ওঠেন, কখন এলি মা!

এই ত আসছি বাবা! মাথা নত ক'রে মাধুরী তুলে নেয় তাঁর পায়ের ধূলো। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে পুনরায় জিজ্ঞাসা করে—তুমি কেমন আছো বাবা?

ভালোরে ভালো! খুব ভালো! একটু জোর দিয়ে শেষের কথা কয়টি উচ্চারণ ক'র্‌লেন কেদারনাথ। সস্নেহে মাধুরীর চিবুকখানা তুলে কয়েক সেকেণ্ড গভীরভাবে কি যেন নিরীক্ষণ ক'র্‌লেন তিনি। পরমুহূর্ত্তেই কিন্তু বুক ভেদ ক'রে নেমে এলো একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস। মাত্র কয়েকটি

দিনের অ-দেখা এই মুখ! এরই বেদনায় ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে গিয়েছে তাঁর হৃদয়খানা। মনে হয়েছে, দিন ত নয়, যেন একটা যুগের দীর্ঘ পদক্ষেপ। আবেগে মাথাখানা তার সেই ক্ষতস্থানে চেপে ধ'রে ধীরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন—তুমি কেমন ছিলে মা?

মাধুরী উত্তরের ভাষা খুঁজে পেল না। শুধু তৃপ্তিভরা হাসি হেসে বারেক কেদারনাথের মুখের দিকে তাকিয়েই নামিয়ে নিল তার চোখের পাতাগুলো।

সেই মুহূর্ত্তে কেদারনাথের অন্তরখানাও আনন্দে ভরপুর হ'য়ে উঠ্‌লো। যেন এ জগত থেকে তাঁর পৃথক সত্ত্বাবোধ লুপ্ত হ'য়ে গেছে চিরদিনের মত। কন্যার অন্তরের আশা ও আকাঙ্ক্ষার সুখ-পরশ তিনি মর্ম্ম দিয়ে উপলব্ধি ক'র্‌লেন নিশ্চিন্ত—নীরবে। কয়েক সেকেণ্ড পরে, ধীর অথচ আবেগ-মিশ্রিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, বিনয় আসেনি, মা?

এসেছেন ত! মাধুরীর কণ্ঠস্বর আবেগে ও উচ্ছ্বাসে ভরপুর হ'য়ে উঠ্‌লো। তেমনি আত্মভোলা সুরে ব'ল্‌লো—পাশের ঘরে মার সঙ্গে কথা কইছেন তিনি।

এসেছে! ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌লেন কেদারনাথ। ব'ল্‌লেন—তাহ'লে চলো, আমরাও যাই সেখানে!...

* * * * *

অনাবিল আনন্দের মধ্যে কেটে গেল কয়েক সপ্তাহ। কেদারনাথের হৃদয়ের ব্যথা ও বেদনার ছায়া, উচ্ছ্বসিত আনন্দের প্রাবল্যে তলিয়ে গেল কোন্ অতল তলে। ভুলে গেলেন তিনি সেই বেদনাময় দিনের অতীত ইতিহাস। নোতুন আশা ও উদ্দীপনায় কন্যা ও জামাতার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রচনার স্বপ্নসৌধ নির্ম্মাণ ক'র্‌তে ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌লেন দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। তাদের সুখ ও শান্তিই ত তাঁর জীবনের শেষ

পাথেয়। জীবনের অবশিষ্ট কটা দিন কেটে যাবে তাদেরই কেন্দ্র ক'রে। তারা ছাড়া অন্য কোন চিন্তার ঠাঁই নেই তাঁর অন্তর-জগতে!

তিনি স্থির ক'রলেন, বি. এল্‌টা. পাশ ক'র্‌লেই ব্যারিষ্টার হ'য়ে আসার জন্য বিনয়কে বিলেতে পাঠাবেন। সেখান থেকে পাশ ক'রে ফিরে এলে, পশার জম্‌বে ভালো ক'রে, আয়ও হবে মোটা। তখন আর আত্মীয়-স্বজন গরীব জামাই ব'লে সহসা মুখ বিকৃত ক'র্‌তে সাহসী হবে না—বরং তারা সেদিন তারই পরিচয়ে নিজেদের পরিচিত ক'র্‌তে ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌বে। এটাই স্বাভাবিক। এটাই জগতের ধর্ম্ম। তারা শক্তের ভক্ত—নরমের যম। নিজের চিন্তাধারার মাঝে নিজেই হেসে ওঠেন কেদারনাথ।...

* * * * *

সন্তানের যাবতীয় দোষ ও ত্রুটি, ক্ষমাশীল পিতৃহৃদয়ের সুশীতল স্নেহ-ছায়ায় আত্মগোপনের অবকাশ পায়, নিভৃতে—নিশ্চিন্তে। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম দেখা গেল না। অঘোরনাথ ভুলে গেলেন বিনয়ের সমস্ত অপরাধ। হৃদয়টা বরং তাঁর স্নেহানুকম্পায় ঢল ঢল ক'র্‌তে লাগ্‌লো। ভাবলেন, তিনি পিতা!—তাঁর নিজেরও একটা কর্ত্তব্য ব'লে বস্তু আছে এ দুনিয়ায়! অকারণ অভিমানে, রুষ্ট ও নিশ্চেষ্ট হ'য়ে ব'সে থাক্‌লে—লোকে যে দোষারোপ ক'রে তাঁকেই! সুতরাং মনে মনে স্থির ক'রে নিলেন, আগামী মাসে ভাল একটা দিন দেখে ঘরের লক্ষ্মীকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন তিনি!

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও সুরু হ'লো সেই আলোচনা। মনোরমা—মা! কয়েক মুহূর্ত্তের ব্যবধানে তিনিও ভুলে গিয়েছিলেন সন্তানের সমস্ত অপরাধ। তাই কথাটা শুনেই উৎসাহিত হ'য়ে উঠ্‌লেন। ব'ল্‌লেন—প্রথমে একটু ভয় হ'য়েছিল, বড়লোক ও বড় ঘরের মেয়ে, আমাদের মত

গরীবের ঘরে এসে কি ঠিকমত মানিয়ে চল্‌তে পারবে? কিন্তু দেখা গেল বৌমার আমার সে চালও নেই—চলনও নেই। একটু থেমে ব'ল্‌লেন মনোরমা, যখন অতবড় বাপের মেয়ে, অহঙ্কার একটু আধটু থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। অথচ আমি কেন, পাড়ার প্রতিবেশীরাও মুগ্ধ হ'য়েছে মার আমার সরল ও অমায়িক ব্যবহারে। দেখ্‌লে না, ক'টা দিনের মধ্যেই কেমন সকলকে আপন ক'রে নিয়েছে। বড়-বৌমা ত মেজ-বৌ ব'ল্‌তে একেবারে অধীর ও উন্মুখ! ক'টা দিনই বা হ'ল সে গেছে, এরই মধ্যে পাঁচ-সাত বার তাগিদ দিয়েছে—মাধুরীকে নিয়ে আসুন না! সংসারে আমরা দু'টো মাত্র বৌ! একসঙ্গে না থাক্‌লে ঘর কি আপনার মানায়? কথাটা কিন্তু খুবই সত্যি! মাধুরী যে ক'দিন ছিল, সে ক'দিনই সংসারটা আমার হাস্যে লাস্যে মুখর হ'য়েছিল! না—না, তুমি বরং এই আষাঢ়েই বৌমাকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা ক'রে ফেল। বেয়াই-ম'শায়কে একটু বুঝিয়ে বরং ব'লো, যখন খুশী তিনি মেয়েকে নিয়ে যাবেন, কোন আপত্তিই উঠ্‌বে না আমাদের তরফ্ থেকে।

আনন্দের এই আতিশয্যের মধ্যেও মনটা কেমন যেন একটু খচ্ ক'রে উঠ্‌লো! মাঝপথে, একটু গম্ভীর হ'য়ে ব'লে উঠ্‌লেন অঘোরনাথ—বিনয়েরও একটা মতামত নেওয়ার প্রয়োজন আছে! বোধহয় তোমারও স্মরণ থাক্‌তে পারে—"স্পষ্টই সেদিন সে জানিয়েছিল—তোমরা দু'জনেই আমার কাছে সমান। কারও মনে ব্যথা দেওয়ার ইচ্ছা আমার নেই। তাই ভাব্‌ছিলাম, আমাদের একটু দূরে বসবাস করাই বোধ হয় শ্রেয়ঃ। তাতে তোমারও সম্মান বজায় থাকে—তাঁরও থাকে।" একটু থেমে ব'ল্‌লেন—অবশ্য কথাটা শুন্‌তে কটু ঠেক্‌লেও একেবারে উপহাস্যে উড়িয়ে দেওয়ার মত নয়!

ও ছেলেমানুষ! ওর কথার কি কোন দাম আছে! মনোরমা স্বামীকে আশ্বাস দেওয়ার চেষ্টা করেন।

ম্লান মৃদু একটু হাস্‌লেন অঘোরনাথ। ব'ল্‌লেন—ছেলে, তোমার কাছে সেই সেদিনের শিশু ব'লে মনে হ'লেও বয়স তার হ'য়েছে। এ বিশ্ব সংসারকে দেখেশুনে নেওয়ার মত জ্ঞানও তার বেড়েছে। বিশেষ ক'রে এ-বংশের সে সেরা শিক্ষিত সন্তান। সুতরাং তার নিজস্ব মতামতের একটা দাম আছে বইকি!

মনোরমার সেই হাস্যমুখর মুখখানা সহসা গম্ভীর হ'য়ে উঠ্‌লো। একটু নীরব থেকে ব'ল্‌লেন—লোকে বলে, ছেলের বিয়ে দিলে সে আর আপনার থাকে না! হয়ত সেই কথাটাই সত্যি!

একটু জোর দিয়ে হেসে উঠ্‌লেন অঘোরনাথ। ব'ল্‌লেন—মিথ্যে মনোক্ষুণ্ণ হ'চ্ছো মনোরমা। এ সংসারের নিয়মই এই! আমরা শুধু আপন আপন করি, অথচ সত্যিকার বাঁধন যে কোথায় সেকথা কোনদিন চিন্তা ক'রে দেখার অবসর আমরা পাইনি। তাই নিজের জীবনের যাবতীয় দোষ-ত্রুটি অপরের কাঁধে চাপিয়ে আমরা শান্তি ও স্বস্তি ফিরে পেতে চাই। তাইত এর নাম—সংসার!

কিন্তু···একটু থেমে ব'ল্‌লেন—এই খেলাঘরে খেল্‌তে বসে আমরা শুধু খেলাই করি না, একটু শিক্ষাও লাভ করি। তার নাম কর্ত্তব্য। সেই কর্ত্তব্যই ক'রে যেতে হবে আমাদের। অবশ্য তার মর্ম্ম যদি তারা কোনদিন উপলব্ধি ক'র্‌তে সমর্থ হয়, ফিরে তাকাবে আমাদের দিকে—নইলে আক্ষেপই হবে জীবনের পাথেয়। তাই ব'লেছিলাম, ও-বিষয় নিয়ে মিথ্যে চিন্তা না করাই ভাল। তবে বিনয়কেও একবার জানানো উচিত মনে করি!

*　　*　　*　　*　　*

বিনয় কেদারনাথকে ভাল ক'রেই চিন্‌তো। তাই প্রথমেই কথাটা মাধুরীর কাছে তুল্‌লো। ব'ল্‌লো—মার ইচ্ছা, তোমাকে ওমাসের প্রথমে ও-বাড়ীতে নিয়ে যান। অথচ শ্বশুরম'শায় কথাটা শুন্‌লে হয়ত একটু ক্ষুণ্ণও হবেন! এখন আমাদের কি করা উচিত বলো ত?

মাধুরী চতুর মেয়ে। ব'ল্‌লো—তোমাকে কিছু ব'ল্‌তে হবে না—কথাটা আমিই প্রথমে তুলে দেখি, তারপর বিবেচনা ক'রে দেখা যাবে—কি করা উচিত বা অনুচিত!

সেই ভাল! নিশ্চিন্ত মনে বিনয় ফিরে এ'লো বাসায়।···

খেতে ব'সেছেন কেদারনাথ। পাশে ব'সে মৃদু হাত-পাখার বাতাস ক'রে চলেছে মাধুরী। এ-কথা সে-কথার পর সহসা মনের কথাটা ব্যক্ত ক'রে ব'স্‌লো মাধুরী—তোমার জামাই ব'ল্‌ছিল—আমার শাশুড়ী ও-মাসে নাকি আমায় নিয়ে যেতে চান!

মাঝপথে কেদারনাথ ঝাঁপিয়ে প'ড়্‌লেন, কেন? অঘোরনাথের সঙ্গে তো সে-কথা ছিল না! আমার মেয়ে-জামাই, আমার কাছে থাক্‌বে। তাদের ভাল-মন্দ, ভূত-ভবিষ্যৎ—সব কিছুই হবে আমার। অবশ্য সে ছেলের বাবা, তার একটা দাবী থাকাও স্বাভাবিক। একটু টেনে ব'ল্‌লেন—আর সে-কথাও আমি অস্বীকার ত ক'র্‌ছি না! তা ছাড়া দু'দিন পরে বিনয়কে ত আমি বিলেতে পাঠাবো ঠিক ক'রেছি। আমার বন্ধু রবার্টসন সাহেবের কথা তোমার মনে পড়ে কি মা?···তোমার দাদাকে বড় ভালবাসতেন তিনি। মাঝে মাঝে এ-বাড়ীতে আস্‌তেন দাবা খেল্‌তে—অবশ্য ওটা ছিল তাঁর দু'দিনের সখ! কিন্তু খুব ভাল শিকারী ছিলেন তিনি। তাঁর সঙ্গে কতবার শীকারে গিয়েছি, আনন্দও ক'রেছি। সেদিনের কথাগুলো মনে প'ড়্‌লে সত্যই যেন সেই হারানো দিনগুলোকে পুনরায় আপন ক'রে ফিরে পাই আমি। দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে ব'ল্‌লেন—তিনি এখন বিলেতেই আছেন। তাঁকে একখানা চিঠি লিখেছিলাম। তিনি খুশীভ'রে উত্তর দিয়েছেন—অন্য কোথাও বাসা নেওয়ার প্রয়োজন দেখিনে। আমার বাসায় থেকে তোমার জামাই অনায়াসেই ব্যারিষ্টারীটা পাশ ক'রে নিতে পারেন

তুমি ওকে বিলেত পাঠাবে বাবা? হাসিভরা মুখখানা মাধুরীর ভয়ে বিবর্ণ হ'য়ে উঠ্লো।

কেন মা? কত লোক আস্ছে যাচ্ছে! ভয় কি? ব্যারিষ্টার হ'য়ে এলে, ওর আয়টাও বাড়্বে, সমাজে বিলেত-ফেরতা ব'লে একটা প্রতিষ্ঠা-লাভও হবে সহজে। তখন ত আর কেউ ব'ল্তে পার্বে না—কেদারনাথ মেয়েটাকে তার একেবারে জলে ফেলে দিয়েছে?

কিন্তু—কি যেন ব'ল্তে চায় মাধুরী, অথচ শেষ ক'র্তে পার্লো না। একটা অকারণ আড়ষ্টতায় কণ্ঠস্বর তার রুদ্ধ হ'য়ে এলো।

কি ব'ল্তে চাইছো মা?—বলো, স্পষ্ট ক'রে বলো! সহজ সুরে উত্তর দিলেন কেদারনাথ।

বিলেত না গিয়েও ত অনেকেই মানুষের মত মানুষ হ'য়ে থাকে বাবা!

ম্লান একটু হাসি হাসলেন কেদারনাথ। ব'ল্লেন—হয় না, তা নয় মা! তবে কি জানো, আমাদের দেশটা এমনই একটা দেশ, যেখানে সত্যকার মানুষ হওয়ার পথে তার অনেক বাধা—অনেক অন্তরায়। তাকে অতিক্রম ক'রে চলার মত ধৈর্য্য ও সামর্থ্য খুব কম লোকেরই থাকে। অথচ এমনই বিচিত্র যে, একবার বিদেশ থেকে ঘুরে এলেই চলার পথটা সুগম হ'য়ে ওঠে। অবশ্য কারণও একটা আছে। ওদেশের মানুষগুলো আর যাই হোক্, তারা যে খাঁটি মানুষ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। দেখছো না, বিদেশী জিনিষগুলোর যেমন গঠন সুন্দর, তেমনি টিকেও বহু দিন। সেদেশের শিক্ষাটাও সেই ছাঁচে ঢালা। তাই দেশী ডিগ্রীর চেয়ে বিদেশী ডিগ্রীর মূল্য এত বেশী। তাছাড়া, হামেশাইত দেখা যাচ্ছে—যে-ই বিদেশ থেকে একবার ঘুরে আস্তে পারে, সেই কেউ-কেটা হয়—এদেশে তার খাতিরও যায় বেড়ে। আমরাও ভাবি—হ্যাঁ, ছেলের মত ছেলে একটা বটে! তাই অনেক ভেবেচিন্তে স্থির ক'র্লাম, বিনয়কেও একবার

বিলেত পাঠাবো। ঘুরে ত এখন আসুক, তারপর দেখা যাবে লাভ-ক্ষতির অঙ্কটা।

মাধুরী উত্তর দিল না। নীরবে শুনে গেল তাঁর সমস্ত কথা।

কেদারনাথ কয়েক মিনিট উত্তরের আশায় অধীরভাবে অপেক্ষা ক'র্লেন, কিন্তু মাধুরীর কোন জবাব না পেয়ে মুখ তুলে তাকালেন।

মাধুরী মাথা নীচু ক'রে নীরবে তেমনি মৃদু পাখার বাতাস ক'রে চলেছে। আলো-আঁধারে মুখটা তার স্পষ্ট ক'রে না দেখা গেলেও কেদারনাথ অনুমান ক'রে নিলেন অকারণে যেন একটু গম্ভীর হ'য়ে উঠেছে সে। একটু উৎসাহ দেওয়ার আশায় তিনি পুনরায় ব'ল্লেন—এতে ভয়ের কিছু নেই মা! কত লোক যাচ্ছে—কত আস্ছে! আর সত্যকথা ব'ল্তে কি, সত্যকার স্বাধীন দেশে কিছুদিন ঘুরে না এলে, মানুষ—মানুষ হ'য়ে ওঠার অবসর পায় না এ-জীবনে।

ভয়! উত্তরে মৃদু হাসলো মাধুরী। কিন্তু তার অন্তরাত্মা আঁৎকে উঠ্লো পর মুহূর্ত্তেই।—হ্যাঁ, ভয়। সত্যই একটা অজানা আশাঙ্কায় তার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ শিউরে উঠ্লো নিজেরই অজ্ঞাতে। কারণ নেহাৎ ছেলে মানুষ ত সে নয়। জগতের ভালমন্দ বোঝার বয়সও হ'য়েছে তার যথেষ্ট। তা ছাড়া জন্ম তার আভিজাত্য শ্রেণীর জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে। এই বয়সের মধ্যে অনেক কিছুই শুনেছে সে। হয়ত সেগুলো সেদিন সে শুনেছিল কুতূহলবশে, শ্রুতির মুখোরোচক খাদ্য হিসাবেই, কিন্তু বাস্তব জীবনের খাতায় যেদিন সেই হিসাব-নিকাশের দিন হ'ল সমাগত তখন কি নিঃশ্চেষ্ট হ'য়ে বসে থাক্‌তে পারে কোন মানুষ? স্বামীকে সে চিনেছে সেই মুহূর্ত্তেই যেদিন পরস্পরের দেহ ও মনের ব্যবধান মুছে গিয়ে, একত্বের ঘনীভূত সুরের মাঝে বিলীন হ'য়েছে একান্ত। সেদিন দেহ-মনে যে বিপ্লবের সুর ধ্বনিত হ'য়েছে তার বাঁধন কতটুকু—সঠিক না জানা থাক্‌লেও

সেই সুরের জেরই পরস্পরকে এক অভিন্নতার সূত্রে গ্রথিত ক'রে দিয়ে গেছে চিরদিনের মত। এইটুকুই জীবনের মোহ—এইটুকুই সুখ—এইটুকুই তার নেশা। এরই জন্য সুরু হয় জীবন-সাধনা। সেই সুখ-স্মৃতিটুকুকে বাঁচিয়ে রাখার আশায় মানুষ বাঁধে সংসার, পাতে সুখ ও শান্তির নীড়। তাকে কেন্দ্র ক'রেই সুরু হয় সৃষ্টি—নেমে আসে কৃষ্টি! আবার তাদের বাঁচিয়ে রাখার জন্যই সুরু হয় জীবন-মরণ দ্বন্দ্ব।

চুপ ক'রে রইলে যে মা! কেদারনাথ তার চিন্তার স্রোতে বাধা দিলেন সহসা।

সচকিত হয়ে উঠ্‌লো মাধুরী। ব'ললো, ঠিক ভয় নয় বাবা—একটু ভেবে দেখার অবসর আমায় দাও!...

তিনদিন পরে কেদারনাথ মাধুরীকে পুনরায় জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, কি স্থির ক'র্‌লে মা?

মাধুরী সলজ্জ মৃদু একটু হেসে ব'ল্‌লো, কিছুই স্থির ক'রে উঠ্‌তে পারিনি বাবা!

কিন্তু দিন যে ব'য়ে যায় মা!

মাধুরী স্থিরকণ্ঠে জবাব দিল—মন্‌টা বড় অবুঝ। বুঝেও সহসা সে সাড়া দিতে চায় না। অথচ তোমার সেই সেদিনের কথাগুলো বারবার ভেবে দেখেছি, স্বাধীন দেশের আবহাওয়ার সঙ্গে পরিচিত না হলে যদি সত্যই সত্যকার মানুষ হওয়া সম্ভবপর না হয়, তাহ'লে আমিও ওঁর সঙ্গে কিছুদিন ঘুরে আসিনা বাবা!

তুমি যাবে? বিস্ময়ে ফেটে প'ড়্‌লেন কেদারনাথ। ব'ল্‌লেন, তাকি হয় মা? একটু থেমে শুষ্ক হাসি ঠোঁটের পাতায় ফুটিয়ে ব'ল্‌লেন, তা সম্ভব নয় মা! সেখানের খরচা কত? তাছাড়া তোমাকে যে একটি মুহূর্ত্তও চোখের আড়াল ক'র্‌তে পারি না!

মাধুরীর ইচ্ছা হল উত্তর দেয়, আমার অবস্থাও যে সেইরূপ বাবা! ঠিক তিনিও একটি মুহূর্ত্ত চোখের অন্তরাল হ'লে তেমনি ব্যথা আমিও অনুভব করি অন্তরে···কিন্তু লজ্জা এসে রুদ্ধ করে দিল তার ঠোঁটের পাতা দুটো। সংযতকণ্ঠে উত্তর দিল, কি দরকার বাবা অত দূর দেশে যাওয়ার। এখানে থেকেও ত অনেক কিছু বড় কাজ করা যায়! অবশ্য একটু টেনে ব'ল্‌লো, চেষ্টা থাক্‌লে সব কিছুই সম্ভব—না থাক্‌লে কোন কিছুই সম্ভব নয়! তাই ব'ল্‌ছিলাম, এত ব্যস্ত হওয়ার কি প্রয়োজন এখন আছে?

আছে—আছে বইকি মা! একটু জোর দিয়ে ব'লে উঠ্‌লেন কেদারনাথ। পরমুহূর্ত্তে নিজেকে সংযত ক'রে নিয়ে ধীরকণ্ঠে ব'ল্‌লেন, হয়ত তোমরা বুঝ্‌বে না—কিন্তু মানুষের জীবনের সঠিক একটা প্ল্যান থাকা চাই। সেই চিন্তাধারাই হয় জীবনের বার্ত্তাবহ। সে-ই মানুষের ঘাড় ধরিয়ে কাজ করিয়ে নেয়। টেনে একটু হাসলেন কেদারনাথ। ব'ল্‌লেন, চলতি ভাষায় যাকে আমরা বলি, জীবনের সুনির্দ্দিষ্ট আশা ও আকাঙ্ক্ষা। তাকে—সঠিকভাবে চালাতে হয়। যে পারে, সেই ভবিষ্যতে মানুষ হ'তে পারে, যে পারে না সে কোন কিছুই ক'র্‌তে পারে না এ জগতে। এটা এ দুনিয়ার নিয়ম মা! তাই ত ব্যস্ত হই। তোমাদেরও তাগিদ দিই বারবার।

* * * * *

অঘোরনাথ পরদিন সন্ধ্যায় জানিয়ে গেলেন, ওমাসের ৩১শে তারিখে বৌমাকে আমি নিয়ে যাবো স্থির ক'রেছি।

কথাটা শুনে কেদারনাথ শুধু ক্ষুব্ধ হ'লেন না, রীতিমত উত্তেজিত ও হ'য়ে উঠ্‌লেন। ব'ল্‌লেন, কথা ত' তা ছিল না অঘোরনাথ!

অঘোরনাথ কথাটা গায়ে মাখ্‌লেন না। হাসিমুখে উত্তর দিলেন,—

মিথ্যে উত্তেজিত হ'চ্ছো কেদারনাথ। নোতুন-বৌ। তাকে নিয়ে একটু আহ্লাদ-আমোদের সখ ত সকল সংসারেই থাকে। তাই বুঝ্‌লে না—

কথাটা শেষ হ'তে দিলেন না কেদারনাথ। ব'লে উঠ্‌লেন, কিন্তু ভাই, তুমিও ত জানো, মেয়েকে আমি দুদণ্ড চোখের আড়াল ক'র্‌তে পারিনে। ঠিক সেই জন্যেই অনেক মেজে কষে, দেখে শুনে তোমার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছি আমি। তোমার নিজেরও ত একটু বুঝে দেখা উচিত অঘোরনাথ! আমারা পরস্পরের আবাল্য বন্ধু। তুমি যদি আমার অন্তরের দুঃখ ও বেদনার প্রতি এতটুকু করুণা প্রকাশ না করো, ক'র্‌বে কে বল্‌তো? তা ছাড়া—আরে ছ্যা, ছ্যা—তুমি দাঁড়িয়ে র'ইলে যে! বসো অঘোরনাথ, বসো। তোমার সঙ্গে যে আমার অনেক কথা আছে! শোন, বসো—মিছে রাগ ক'রো না। অন্তরের কথা খুলে ব'ল্‌ছি আজ, মেয়েটার প্রতি আমার এমন একটা দুর্ব্বলতা আছে যে, অন্যের মুখে তার সম্বন্ধে কিছু শুন্‌লেই মেজাজটা আমার সেই মুহূর্ত্তে আগুন হ'য়ে উঠে। অবশ্য—পরমুহূর্ত্তে নিজের ভুলটা নিজেরই চোখে ধরা প'ড়ে যায়। তবুও কি নিজেকে ধ'রে রাখ্‌তে পারি! এই দেখনা—তুমি শ্বশুর, তার একান্ত আপনার জন—তবুও গর্জ্জে উঠে মাঝে মাঝে! বুঝ্‌লে না, ঘনিষ্ঠতম বাল্যবন্ধু ব'লেই ত তোমার ওপর জোর করি, অন্তরের সুখ-দুঃখের দুটো কথাও খুলে বলি। বসো হে, বসো। ওরে—কে আছিস্—বাবুর জন্যে একটু ভাল ক'রে তামাক সেজে আন্। আর তোর দিদিমণিকে ব'লে আয়—

কথাটা শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই বাড়ীর পুরাতন ভৃত্য যদুনাথ ভেতরে এসে দাঁড়ালো। ব'ল্‌লো, বাবুকে ভেতরে একবার ডাক্‌ছে দিদিমনি।

হেসে ফেল্‌লেন কেদারনাথ। ব'ল্‌লেন, দেখ্‌লে ত অঘোরনাথ—যার জিনিষ তাকে কিছুই ব'ল্‌তে হয় না। তুমি এসেছো সে খবর শব্দের মত ভেসে গেছে অন্তঃপুরে। তা' যা যদু, ভাল ক'রে একটু তামাক

সেজে আন্, আর তোর দিদিমণিকে বল্ একটু পরেই উনি যাচ্ছেন। তারপর শোন অঘোরনাথ—আরে, এখনও দাঁড়িয়ে র'য়েছো যে তুমি! রাগ হ'য়েছে বুঝি? এতদিন দেখে শুনেও বুঝি চিন্‌তে পার্‌লে না আমাকে! এসো, এই পাশে এসে বসো। অনেক শলা-পরামর্শ আছে হে, অনেক শলা-পরামর্শ অছে!

অঘোরনাথ অবশেষে তাঁর পাশের তাকিয়াটার উপর ভর দিয়ে ব'স্‌লেন। সবিস্ময়ে ব'লে উঠ্‌লেন, আবার নোতুন কিছু ঘট্‌লো নাকি?

বিষয় থাক্‌লেই হয়, হবেও। অন্ততঃ যতদিন পর্য্যন্ত ও বস্তুটা থাক্‌বে! কিন্তু ওসব নিয়ে মাথা ঘামানো ছেড়ে দিয়েছি আজকাল। শোন, একটা কথার মত কথা আছে—হেসে উড়িয়ে দিয়োনা যেন। অনেক ভেবেচিন্তে দেখার প্রয়োজন আছে হে! একটু থেমে শুষ্ক গলাটা লালারসে সিক্ত ক'রে নিয়ে ব'ল্‌লেন, অনেক দিন থেকেই তোমায় ব'ল্‌বো, ব'ল্‌বো ভাব্‌ছি! কিন্তু তুমি এলেই সব কথা ভুলে যাই একেবারে। আজ হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল—একটু খুশীভরা হাসি হেসে ব'ল্‌লেন, আমি বিনয়কে বিলেত পাঠাবো ঠিক ক'রেছি।

বিলেত পাঠাবে?

চম্‌কে উঠ্‌লে যে! আমার আর কে আছে বলো। যা আছে, যা থাক্‌বে—সবই ত ওদের। এখন কথাটা কি জানো, ঘটির জল গড়িয়ে কতদিনই বা চলে! তোমার কাছে লুকানো-ছাপানোর কিছুই ত নেই আমার! একটু থেমে ব'ল্‌লেন, যা আছে, তা খুবই যৎসামান্য। তবে তাল-পুকুরের নামডাকের মত পৈত্রিক জমিদারীর নামটা ভাঙিয়ে এতদিন চলে এলো, আর বাকী যেটুকু রইলো—তাতে একটা জীবন যে স্বচ্ছন্দে কেটে যাবে সেরূপ নিশ্চয়তা দেবার মত সামর্থ্য আমার নেই। তাই ভাব্‌ছিলাম, যদি ওকে একটিবার বিলেত ঘুরিয়ে নিয়ে আস্‌তে পারি, তা হ'লে—ওর একার উপায়ের টাকা খায় কে? তা'ছাড়া তুমি ত

জানো আমার ওই একটিমাত্র মেয়ে! আজীবন সুখ ও ঐশ্বর্য্যের মধ্যে লালিত পালিত। আমি চোখ বুঝ্‌লেই ও চোখের জলে ভাস্‌বে আর দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌বে, সে ভাই আমি মরেও সহ্য ক'র্‌তে পার্‌বো না। তাতে স্বর্গে গিয়েও সান্ত্বনা পাবো না একটি মুহূর্ত্ত! তাই, আমার ইচ্ছা—একটু থেমে ব'ল্‌লেন—অবশ্য তোমাদের যদি কোন আপত্তি না থাকে—মেয়েটাকে বুঝিয়ে মত করাতে পারি কিনা একটি বার চেষ্টা ক'রে দেখি! এতে নিশ্চয় ক'রে আমি ব'ল্‌তে পারি, বংশের তোমার মুখ উজ্জ্বল হবে, আর আমিও জীবনের বাকী কটা দিন, নিশ্চিন্তে কাটিয়ে দিতে পার্‌বো।

বৌ-মাকে ব'লেছিলে?

আর কেন বল ভায়া। গিন্নী ত কথাটা শুনেই চম্‌কে উঠ্‌লেন! মেয়ে ত মুখ ভার ক'রে গুম হ'য়ে বসে রইলো। সে যা হোক্, তারজন্য বিশেষ কিছু ভাব্‌না নেই। শুধু ওদের বুঝিয়ে দিতে পার্‌লেই চল্‌বে, যা কিছু ক'র্‌ছি, তা তোমাদের ভবিষ্যৎ সুখ-শান্তির আশায়। এখন তোমাকে তোমার ঘর সাম্‌লানোর ভার নিতে হবে ভাই! বেয়ানঠাকুরাণী কি সহজে রাজী হবেন?

সেই কথাই ত ভাবছি!

ভাব্‌লে চল্‌বে না অঘোরনাথ। তোমাকে এ ভার নিতেই হবে। আর একটা কথা তোমায় বলি শোন, মেয়েকে অবশ্য আমি তাঁর খুশীমত পাঠিয়ে দিচ্ছি, তবে একটা সর্ত্ত থাক্‌বে ভাই তার মধ্যে—

সে আবার কি? বিস্ময়ে ফেটে পড়েন অঘোরনাথ।

চিবুকে বার দুই হাত বুলিয়ে গভীর স্বরে কেদারনাথ ব'ল্‌লেন, তুমি ত আমার দুর্ব্বলতার কথা জানো অঘোরনাথ! মেয়েটাকে দিনে একটিবার অন্ততঃ না দেখ্‌লে স্থির থাক্‌তে পারিনে। তাই ব'লছিলাম, মাকে আমার দুপুরে একটিবার ক'রে পাঠিয়ে দেবে, আর

সন্ধ্যায় না হয় বিনয় এসে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। এতে তোমার কিংবা বেয়ানঠাকুরাণীর আপত্তির প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে না।

ব'লে দেখবো। উঠে দাঁড়ালেন অঘোরনাথ।

চকিতে অঘোরনাথের হাত দুটো চেপেধ'রে কেদারনাথ ব'লে উঠ্‌লেন, শুধু দেখ্‌লে চল্‌বে না ভাই, ব্যবস্থা যা হোক্ একটা ক'র্‌তেই হবে।··

*　　*　　*

মনোরমা অঘোরনাথের মুখে কথাগুলো ধীরভাবে শুনে গেলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থেকে, মুখর হ'য়ে উঠ্‌লেন—তাঁর মেয়ে জামাই, সুতরাং তাদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করার অধিকার তাঁর আছে বইকি! কিন্তু—

থাম্‌লে কেন মনোরমা?

ভাব্‌ছি, আমি মা, আমারও ত একটা কর্ত্তব্যবোধ থাকা উচিত! ছেলে বড় হবে, পাঁচজনের একজন হবে, এর বেশী কি কোন কামনা মা ক'র্‌তে পারে এ দুনিয়ায়? না এর বেশী সুখের আশা মনে পোষণ করে এ জীবনে? কিন্তু কি জানো? মার কাছে টাকাটা খুব বেশী বড় বস্তু নয়। বড়, তার সুখ। সে যদি সুখী হয়, একটু টেনে ব'ল্‌লেন, না—না·· যত ব্যথাই অন্তরে আমার বাজুক্ না কেন, তবুও দৃঢ় আমায় হ'তেই হবে। তুমি বেয়াই-ম'শায়কে ব'লো; আমি তাঁর ইচ্ছার অন্তরায় হবো না। আমার ছেলে বিনয়! সে বড় হবে···সে সুখী হবে, হ্যাঁ, হ্যাঁ— তাই হোক্—এই কামনাই আমি করি মনে-প্রাণে।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত নিজেকে ধ'রে রাখ্‌তে পার্‌লেন না মনোরমা। কণ্ঠস্বর তাঁর ক্রমশঃই জড়তায় পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌লো। চোখের পাতাগুলো একটা অচেনা শঙ্কার ভারে সিক্ত হ'য়ে উঠ্‌লো। অন্তরাত্মা কাৎরে উঠ্‌লো—"আমার" দাবীটাকে কি এত সহজে ত্যাগ করা যায়? না মুখে

ত্যাগ ক'র্‌লাম ব'ল্‌লেই—অন্তর তা এত সহজে স্বীকার ক'রে নিতে পারে? পারে না বলেই, অকারণে চোখের পাতাগুলো সিক্ত হ'য়ে ওঠে। পর মুহূর্ত্তে সচকিত হ'য়ে আঁচলের খুঁটে সযত্নে চোখের পাতা মুছে নিলেন তিনি। হৃদয় তবুও কি বোধ মানে! ত্যাগের এই যে তাঁর আত্মম্ভরি অহমিকার দম্ভ—সবই যেন চূর্ণ হ'য়ে প্রতিটি পলে রচনা করে অব্যক্ত বেদনার এক জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড—যার দাহ্য শক্তি-প্রবাহে দেহ ও মনের প্রতিটি গ্রন্থি, প্রতিটি শিরা-উপশিরা, অহর্নিশি শিথিলতর হ'য়ে দিগন্তব্যাপী হাহাকারের বুকে শুধু আছাড় খেয়ে মরে। এই আত্মবিস্মৃতির পথে, তবুও সচেতন মনটা দোলা দিয়ে ওঠে, 'দশ মাস, দশ দিন যারে জঠোরে ক'রেছি ধারণ—দেহের প্রতিটি রক্ত বিন্দু ক্ষয় ক'রে, যার দেহ ও মনের ভিত প্রতিষ্ঠার দিয়েছি অবকাশ, যাকে এক অসহায় দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে বুকের তাজা রক্ত দান ক'রে, প্রতিটি পলে স্বকীয় চেতনা উপলব্ধির দিয়েছি অবসর, সেই সন্তানকে ত্যাগ করা কি সহসা চলে কোনকালে? না, সেই আপন-সত্ত্বাবোধের কেন্দ্রবিন্দু থেকে, তাকে এত সহজে বিচ্যুত করা সম্ভব কোনদিন?' তাইত হৃদয়ে জাগে এত দ্বন্দ্ব, এত ব্যথা, এত বেদনা, এত হাহাকার। হায় রে জগত! তবুও আত্মপ্রকাশের নেই অবসর—নেই অবকাশ। তিনি যে মা! সন্তানের মঙ্গল কামনা ছাড়া সম্বল আর কিছু কি আছে এ দুনিয়ায়? ··

*   *   *

কেদারনাথ তৈরী হ'তে লাগ্‌লেন। আস্‌ছে বছরে বিনয়ের যাত্রা প্রায় স্থির হ'য়ে গেল! কিন্তু মাধুরী কেমন যেন শুকিয়ে যায় দিনের পর দিন।

কেদারনাথ ভয় পেলেন। ভাবলেন, হয় ত কোন কারণে শরীরটা তার অসুস্থ হ'য়ে থাক্‌বে! ডাক্তার দেখানোর ব্যবস্থা ক'র্‌লেন। কিন্তু

রোগ ধরা পড়ে না। রোগ তার মনের—তার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশের।

মা সুচারুদেবী ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌লেন। ভাব্‌লেন, হয়ত মেয়ে তাঁর সন্তানবতী হ'তে চলেছে! তাই এতদিন পরে, প্রথম প্রতিবাদ ক'র্‌লেন, এখন কিছুদিন বিনয়ের বিলেতযাত্রা স্থগিত রাখাই যুক্তিসঙ্গত।

কারণ? প্রশ্ন তুল্‌লেন কেদারনাথ।

উত্তরে সুচারুদেবী বলেন, এ সময়ে বিনয়ের কাছে থাকাই ভাল!

কিন্তু কয়েক মাস পরে দেখা গেল তাঁর সে অনুমান মিথ্যা। শঙ্কিত হ'য়ে উঠ্‌লেন তিনি। মেয়েকে কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, তোর কি হ'য়েছে স্পষ্ট ক'রে খুলে বল তো মা! আমি মা। আমার কাছে কি মনের কোন কথা গোপন ক'র্‌তে আছে? বল্, খুলে বল্ সব।

মাধুরী উত্তরে ম্লান একটু হাস্‌লো। ব'ল্‌লো, আমার কোন কিছুই ত হয়নি!

তবে, দিনের পর দিন এমনি ক'রে শুকিয়ে যাচ্ছিস্ কেন?

সঠিক কোন কারণ আমিও খুঁজে পাইনি! পুনরায় মৃদু হাস্‌লো মাধুরী!

সুচারুদেবী প্রশ্ন তোলেন, তবে কি তোর ইচ্ছা নয়—বিনয় বিলেত যাক্!

স্বামী বড় হোক্—কোন্ স্ত্রী না কামনা ক'রে মা! স্নিগ্ধ হাসি হেসে উত্তর দিল মাধুরী।

তবে?

কি জানি কেমন একটা ভয় হয় মনে।

ভয়? তবে কি—

না—না—মিথ্যে ওঁর প্রতি দোষারোপ ক'রোনা মা! সত্যই

ওঁকে পেয়ে মনে-প্রাণে সুখীই হ'য়েছি আমি। কিন্তু—মনটার সঙ্গে আজও ঠিক বোঝাপড়া ক'রে উঠ্‌তে পারিনি।

সুচারুদেবী বোঝেন—কোথায় সুরু হ'য়েছে তার অন্তর দ্বন্দ্ব। কিসের আশংকায় সে শঙ্কিত হ'য়ে উঠ্‌ছে দিনের পর দিন। বল্লেন—তার জন্যে এত মনমরা হ'য়ে থাকারই বা প্রয়োজন কি?

উত্তরে মৃদু হাস্‌লো মাধুরী। ব'ল্‌লো—তোমার মুখে একথা ত শোভা পায় না মা! সে কথাটা কি তোমাকেও বুঝিয়ে ব'ল্‌বো আমি!

মনের কথা খুলে না ব'ল্‌লে—সব কিছুই ত অনুমানের উপর নির্ভর ক'র্‌তে হয়!

বিশ্বাস করি। কিন্তু একদিন তোমরাও ত ছিলে ঠিক আমাদেরই মত! মনের আশা-আকাঙ্ক্ষাও ছিল, ঠিক এমনি কাঁচা, এমনি সবুজ—

ছিল—কিন্তু আজ আর তা স্মরণে আসে না। কারণ বয়সের সঙ্গে মনটাও চলে এগিয়ে। তার স্বার্থ ও চলার পথ—দিনের পর দিন ভিন্ন রূপ করে পরিগ্রহ। তাই মানুষ বুঝেও বোঝে না কিছু। উত্তরে তাই, একটু মৃদু হাসি হাস্‌লেন সুচারুদেবী। ব'ল্‌লেন, সে দিন কি মনে হ'য়েছিল, কি বাসনা জেগেছিল, সে সব কি এ বয়সে স্মরণ করা যায়?

উত্তর খুঁজে পায় না মাধুরী। স্নেহের কাছে মানুষকে চিরদিনই হার মান্‌তে হয়। সেখানে তর্ক বা যুক্তির কোন স্থান নেই। বিচার, বিবেচনা ও মনুষ্যত্বের গর্ব্ব সমাধিপ্রাপ্ত হয় এখানেই।

মাধুরীকেও হার মান্‌তে হ'ল। কয়েক সেকেণ্ড নীরব থেকে একটু মৃদু হেসে ব'ল্‌লো—আমি কিন্তু বেশ স্পষ্টই স্মরণ ক'র্‌তে পারি, বিয়ের আগে, চিন্তাধারাটা কিরূপ ছিল—আর আজই বা সে কিরূপ সে গ্রহণ ক'রেছে! একটু থেমে ব'ল্‌লো, সেদিন নিজের কথা ছাড়া অন্য কোন চিন্তার ঠাঁই ছিল না মন-জগতে! অথচ যে মুহূর্ত্তে তোমরা একান্তে সঁপে দিলে একজনের হাতে, সেই মুহূর্ত্ত থেকেই দেহ-মনে ঘটে গেল—এমন একটা বিপর্য্যয়,

এমন একটা বিপ্লবী—যার প্লাবনে হারিয়ে ফেল্‌লাম নিজেকে। এমন কি নিজস্ব ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যকেও পৃথক ক'রে রাখা গেল না একটি মুহূর্ত্ত!

সেটা ত সুখের কথা মা! সুচারুদেবী সহাস্যে ঝাঁপিয়ে প'ড়্‌লেন কথার মাঝে।

মাধুরী সহসা গম্ভীর হ'য়ে উঠ্‌লো। ব'ল্‌লো—সুখ কতটা ঠিক জানিনে—তবে এর দুঃখ ও জ্বালাও অনেক!

তার মানে? সুচারুদেবী সশঙ্ক দৃষ্টিতে মাধুরীর দিকে ফিরে তাকালেন।

বুঝ্‌তে পার্‌লে না! লঘু একটু হাসি হাস্‌লো মাধুরী। ব'ল্‌লো, যতদিন ছিলাম একা, ততদিন নিজের আনন্দ, সুখ ও সুবিধার কথাই বার বার ভেবেছি এবং সে বাসনার পরিতৃপ্তিতেই তৃপ্তিবোধ ক'রেছি নিশ্চিন্তে। কিন্তু বিয়ের পর, সেই বিগত জীবনের সরল ও সহজ গতিটাকে যেন হারিয়ে ফেলেছি নিজেরই অজ্ঞাতে। আজ তাই বার বার অপর একজনের মুখের দিকে না তাকালে যেন জীবনের সুখ ও দুঃখের অনুভূতিটাকে গভীর ক'রে অনুভব ক'র্‌তে আর পারি না! হয়ত বাঁধনের দুর্ব্বলতা—এইখানেই।

সুচারুদেবী কি যেন উত্তর দিতে চেষ্টা ক'র্‌লেন—

বাধা দিয়ে মাধুরী তেমনি মধুর হাসি হাস্‌লো। ব'ল্‌লো—ভয় পেয়ো না মা,—দুঃখবোধ আমি করি না! তবে মনে কি হয়, জানো? একদিন যার মৃদু পরশের মধু-মাদকতায় দেহ ও মন উদ্বেলিত হ'য়ে উঠ্‌তো, আজ তার গভীর পরশ পেয়ে—জীবন হ'ল ধন্য, কিন্তু সেই উচ্ছ্বাস-মুখরিত জীবনের রূপ হ'ল অন্তর্হিত। তাই বাধা তার প্রতিপদে, ব্যথা তার প্রতিটি মুহূর্ত্তে। তবুও তৃপ্তির তার নেই শেষ—

সুচারুদেবী মাধুরীর এই উচ্ছ্বাসপূর্ণ কথাগুলোর মর্ম্ম সঠিকভাবে উপলব্ধি ক'র্‌তে পার্‌লেন না। বিস্ময় ভরা দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে রইলেন শুধু।

আবেগ-মুখর মাধুরী ব'লে চ'ল্‌লো—কারণ, নিজেকে হারিয়েছি সত্য, কিন্তু নিজস্ব সত্বাকে পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধির অবকাশ পেয়েছি ফিরে আমি! তাই সুখ আজ আমার একার নয়—উভয়ের। অপমান—সেটাও আমার একার নয়—উভয়ের, আমাদের উভয়ের—

মাধুরীর উক্তিগুলো, সুচারুদেবীর কাছে একটানা অর্থহীন উচ্ছ্বাস ব'লে প্রতীয়মান হ'ল। তিনি মাঝপথে বাধা দিয়ে উঠ্‌লেন—নিজের মনে এ সব কি প্রলাপ ব'কে চ'লেছিস্‌ বল্‌তো?

মাধুরী ক্ষুব্ধ হ'ল না বরং একটু জোর দিয়েই হেসে উঠ্‌লো। আপন মনে ব'ল্‌লো—ঠিকই ব'ল্‌ছি মা! কথাটা রূঢ় সত্য হ'লেই—হয় প্রলাপ। দাবীটা ন্যায্য হ'লেই—হয় অন্যায়। মনের কথাটা চেপে রাখ্‌লেই হয়—সভ্যতা, প্রকাশ পেলেই লোকে বলে, নগ্নতা! জীবনের ধর্ম্মইত এই! কিন্তু, একটু থেমে ব'ল্‌লো—আমার কাছে তুমি ত সত্য কথাই শুন্‌তে চেয়েছিলে মা! মনের রুদ্ধ দরজাটা খুলে যদি স্পষ্টই তোমায় বলি—যাওয়া ওর হবে না—আমি যেতে দেবে না, তখন—টেনে একটু হাস্‌লো মাধুরী। ব'ল্‌লো, তোমরা হবে ক্ষুব্ধ—হবে আশা-হত। ব'ল্‌বে—মেয়েটা বোকা! কিন্তু আমার স্থানে তুমিও যদি এসে দাঁড়াতে—তুমিও কি বাধা দিয়ে ব'ল্‌তে না—যাওয়া হ'তে পারে না—কারণ, ও পথটা বড় পিচ্ছিল! হাঁপিয়ে উঠেছিল মাধুরী। একটু থেমে ধীর ও শান্ত কণ্ঠে ব'ল্‌লো - আচ্ছা তুমিই বলতো মা—জীবনের একান্ত প্রিয়জনকে কি এত সহজে স্বেচ্ছায় দূরে সরিয়ে দেওয়া যায়, না সম্ভব কোনদিন?

এ কথার জবাব দেওয়ার সামর্থ্য ছিল না সুচারুদেবীর, তাই নিরুত্তরে দাঁড়িয়ে রইলেন শুধু।…

* * * *

কথাটা কেদারনাথেরও গেল কাণে। প্রথমে, রীতিমত ক্ষুব্ধ হ'লেন কিন্তু একটু স্থিরচিত্তে কথাগুলো ভেবে দেখে—নিজেই লজ্জিত হ'য়ে

প'ড়্লেন। ভাব্লেন—অসহিষ্ণুতাই ব্যর্থতার প্রধান কারণ। সুতরাং দোষী সাব্যস্ত ক'র্বেন তিনি আজ কাকে?

অঘোরনাথকে একদিন কথা দিয়েছিলেন—কিন্তু কয়েক দিনের ব্যবধানে তিনি তা পুনরায় ফিরিয়েও নিয়েছেন—শুধু মেয়েটাকে খুশী ও সুখী দেখার আশায়! একেই ত কেন্দ্র ক'রে তিনি তাঁর বাকী জীবনের ক'টা দিন নিশ্চিন্তে কাটিয়ে দিতে চান! অথচ সে সাধনায় বাদ সাধ্লেন তিনি নিজেই! ব্যথিত হ'লেন কেদারনাথ, কিন্তু মুখ ফুটে একটিও কথা ব'ল্লেন না। ভাব্লেন, মানুষ যা আশা ক'রে, তা আচম্বিতে ভেঙে দেওয়াই হয়ত প্রকৃতির রীতি—নইলে মানুষ তার নিজের ভাল, নিজেই বুঝ্তে চায় না কেন?

অঘোরনাথ রীতিমত মনোক্ষুণ্ণ হ'য়েছিলেন, তা তাঁর আচরণ দেখলেই বোঝা যায়। কিন্তু অত্যন্ত চাপা প্রকৃতির লোক ব'লেই সব কিছু মানিয়ে নিয়েছিলেন তিনি।...

নিত্যকার মত সন্ধ্যায় হাজিরাটা ঠিকই দিয়ে যান। পারিপার্শ্বিক আলোচনায় কিছুক্ষণ মুখর থেকে সে স্থান ত্যাগের উদ্যোগ করেন, একটা না একটা কাজকে উপলক্ষ্য ক'রে। কেদারনাথ সবই লক্ষ্য ক'র্ছিলেন—কিন্তু তাঁর বলার ছিল না কিছু। কারণ অপরাধী ত তিনি নিজেই! অথচ এই গুমোট আবহাওয়াটা তাঁর কাছে একেবারে অসহনীয় হ'য়ে উঠেছিল। তাই সহসা আত্মপ্রকাশ ক'রে ব'ল্লেন, আরে ব'সো—একটু ব'সো! কাজ ত তোমার প্রতিদিনই থাকে, আজ না হয় একটু ফাঁকিই দিলে—তাতে মহাভারতটা নিশ্চয় অশুদ্ধ হ'য়ে যাবে না!

অঘোরনাথ অনিচ্ছা সত্ত্বেও ব'স্লেন আরও কিছুক্ষণ। কেদারনাথ নিজের মনেই ব'কে চ'ল্লেন। অঘোরনাথ মাঝে মাঝে, হ্যাঁ—না—সাড়া দিয়ে একাগ্রতার পরিচয় দেন। এ ছাড়া তাঁর উপায়ই বা

ছিল কি? কিন্তু এ চতুরতা চাপা থাক্‌লো না কেদারনাথের কাছে।

তিনি নিজেই অশোয়াস্তিবোধ করেন। কথার মাঝে থেমে, নিজেও ভেবে দেখেন, আসরটা জম্‌ছে না ঠিক পূর্ব্বের মত! একটা আন্তরিকতার অভাব যেন স্পষ্টতর হ'য়ে উঠ্‌ছে! মুখ তুলে তাকালেন অঘোরনাথের দিকে। দেখ্‌লেন, একটা অসহিষ্ণুতার ছায়ায় গম্ভীর সে মুখখানা! চকিতে মনে পড়ে গেল সেদিনকার কথাক'টা। একটু আবদারের সুরেই ব'লেছিলেন—তুমি ত আমার বাল্যবন্ধু হে অঘোরনাথ! সেই বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে যদি আজ একটু স্বার্থত্যাগ ক'র্‌তে না পার্‌লে ত বন্ধুত্বের মর্য্যাদা রইলো তোমার কোথায়?

হ্যাঁ···নিজের মনে নিজেই ভাবেন কেদারনাথ—সেদিন থেকেই অঘোরনাথ রীতিমত গম্ভীর হ'য়েছে বটে! হয়ত মনে ব্যথাও পেয়েছে গভীর। সেও ত মানুষ! তাঁর নিজেরই মেয়ে-জামাই নিয়ে আহ্লাদ-আমোদ ক'র্‌তে ভাল লাগে, আর তাঁর মনে আহ্লাদ-আমোদের বাসনা জাগাটা, অস্বাভাবিক কিছু কি এ জগতে!

চিন্তাস্রোত মনটাকে দোলা দিয়ে গেল। কেদারনাথ স্থির ক'রে ফেল্‌লেন, অন্ততঃ এক সপ্তাহের জন্যও তাঁকে ত্যাগ স্বীকার ক'র্‌তে হবে। তিনিও বন্ধু! তাঁরও ত কিছু ত্যাগ স্বীকার করা উচিত।···

পরদিন সন্ধ্যায় জানালেন কেদারনাথ, তোমার কথাটা সত্যই ভেবে দেখ্‌লাম অঘোরনাথ, সংসারে তুমি ত একা নও। তোমারও আত্মীয়স্বজন আছে, লোক-লৌকিকতাও আছে। আর সেটাকেও মানিয়ে চলা উচিত—বিশেষ ক'রে যখন আমরা সামাজিক জীব! তা তুমি তোমার নির্দ্দিষ্ট দিনে মাধুমাকে আমার, নিয়ে যেয়ো, কিন্তু ভাই একটা সর্ত্ত তোমায় স্বীকার ক'রে নিতে হবে—

কেদারনাথের ব্যবহারে অঘোরনাথ রীতিমত বিস্ময় বোধ ক'রলেন। তার উপর আবার সর্ত্তের সেই আরোপটা, তাঁকে অধিকতর বিচলিত ক'রে তুললো। মুখ তুলে তাকালেন তিনি।

কেদারনাথ ব'ললেন—বিস্মিত হ'য়ো না অঘোরনাথ। শুধু একটা কথা,—তোমারও মান থাক্, আর আমারও জিদ্ বজায় থাক্—সাত দিন পরে মাকে আমার পাঠিয়ে দিও। আশাকরি এতে তোমার আপত্তি কিছু থাকতে পারে না!

অঘোরনাথ খুশী ভ'রেই ব'লে উঠলেন—কোন কিছুতেই আমার আপত্তি নেই ভাই! ওরা দুটি প্রাণী সুখী হোক্, আর আমাদের আবাল্য বন্ধুত্বও বজায় থাক্—এটুকুই শুধু মনে-প্রাণে কামনা করি! একটু টেনে ব'ললেন—সেটাই কি সবচেয়ে সুখের ও আনন্দের বিষয় বস্তু নয়!

আবেগে অঘোরনাথের হাতখানা চেপে ধ'রলেন কেদারনাথ। ব'ললেন, তোমায় ত আমি চিনি অঘোরনাথ! তোমার উদারতার ঋণ কি এ জীবনে শোধ ক'রতে পারবো কোনদিন? তবে কি জানো—আমরা অতি সাধারণ মানুষ! তাই ভুলভ্রান্তিও করি মাঝে মাঝে। কিন্তু আন্তরিকতা যেখানে আছে, সেখানে বিভেদের ঠাঁই নেই, বুঝলে হে অঘোরনাথ, বুঝলে।...

* * * * *

মাধুরী নির্দ্দিষ্ট দিনেই এলো এবং ফিরেও গেল তার বাপের বাড়ীতে। নোতুন-বৌ-এর আগমনে অঘোরনাথের চিরদারিদ্র্য নিপীড়িত সংসার, আত্মীয়স্বজনের আগমন ও তাদের মধুর কলহাস্তে মুখর হ'য়ে রইলো ক'টাদিন। তারপর যেই নিস্তব্ধ পুরী—সেই নিঝুম পুরীতেই হ'ল পরিণত।

মনটা অকারণ বেদনায় ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠ্‌লো অঘোরনাথের। সত্যই লোকজন না এলে, একটু হৈ-চৈ না হ'লে—সংসার কি মানায় কোনকালে! তাই মনে ইচ্ছা জেগেছিল, নোতুন-বৌ আরও কিছুদিন অন্ততঃ থাকুক্—তাঁর ভাঙা এই দেউলে, কিন্তু সে ইচ্ছাটাকে দমন ক'র্‌তে তিনি বাধ্য হ'লেন কেদারনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে। একে তিনি ধনী-আত্মীয়, তার উপর বাল্যবন্ধু। সামান্য একটু খেয়াল ও খুশীর আনন্দে তিনি ত এই প্রীতির মধুর সম্পর্কটাকে তিক্ত ক'রে তুল্‌তে পারেন না!

আত্মীয়স্বজন কিন্তু ক্ষুণ্ণ হ'লেন মনে মনে। তাঁরা সবাই মনের সেই ক্ষোভটা প্রকাশ ক'রে ব'ল্‌লেন, ধনীর সঙ্গে আত্মীয়তা পাতালে সারাটা জীবন এমনি ক'রেই অপদস্থ হ'তে হয় অঘোরনাথ!

অঘোরনাথ আজীবন দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই ক'রে এসেছেন। বোঝেন, নিজের শক্তি ও সামর্থ্যের রূপ। তাই অকারণ উত্তেজনা ও উচ্ছ্বাসের স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিলেন না। কারণ, তাঁর সারাটা জীবনের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার রূপ বড় রূঢ় ও তিক্ত। মনে-প্রাণে বিশ্বাসও করেন, 'নতি' স্বীকার ছাড়া এ সংসারে শান্তি রক্ষার দ্বিতীয় পথ খোলা নেই। তাই একটু ম্লান হাসি হেসে ব'ল্‌লেন, কথাটা তোমাদের মিথ্যে নয় অম্বিকানাথ! কিন্তু সবটুকুই যে নগ্ন-সত্য, একথা জোর দিয়ে ব'ল্‌তে পারো না কোনদিন।

অম্বিকানাথ মনোরমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। বয়সে তিনি প্রায় অঘোরনাথের সমবয়সী। তাই উভয়েই উভয়কে নিজ নিজ নামে সম্বোধন ক'রে থাকেন। তিনি কিন্তু অঘোরনাথের কথায় তুষ্ট হ'তে পার্‌লেন না। ভ্রুকুটিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে ব'লে উঠ্‌লেন, তার মানে?

পুনরায় একটু মৃদু হাস্‌লেন অঘোরনাথ। ব'ল্‌লেন, ছেলে কিংবা

মেয়ে, একটি মাত্র হ'লে—তার প্রতি মায়া, মমতাটা একটু উগ্রধরণের হওয়াটাই স্বাভাবিক। কেদারনাথের দোষ এখানেই। তাই তোমাদের বলি, তাঁর প্রতি তোমরা একটু উদারতা প্রকাশ করো। একটু ক্ষমা ঘেন্না ক'রে সবকিছু মানিয়ে চ'ল্‌তে চেষ্টা করো। তাতে সুখী হবো আমরা সকলেই!

অম্বিকানাথের আত্মসম্মানে আঘাত লাগ্‌লো। গর্জ্জে উঠ্‌লেন সঙ্গে সঙ্গে, ভুলে যেয়ো না হে অঘোরনাথ, তুমি ছেলের বাপ্‌! নতি তুমি স্বীকার ক'র্‌বে না—ক'র্‌বেন্ কেদারনাথ।

মিথ্যে উত্তেজিত হ'য়ো না অম্বিকানাথ। সংসারে বাস ক'র্‌তে গেলে এত অধৈর্য্য হ'লে কি চলে? সবকিছু মানিয়ে চ'ল্‌তে হয়, তবেই শান্তি পাওয়া যায়, হাসতেও পারা যায়—

থামো, থামো—বাধা দিয়ে উঠ্‌লেন অম্বিকানাথ। ব'ল্‌লেন, এত ভাল মানুষ হ'লে সংসারে বাস করা চলে না। আর সবচেয়ে বিস্ময়ের বস্তু, মাথার চুলগুলো তোমার সাদা হ'য়ে এলো, তবুও আত্মসম্মান-জ্ঞানটা স্পষ্টতর হ'য়ে উঠ্‌লো না!

কিন্তু—কি যেন ব'ল্‌তে চাইলেন অঘোরনাথ।

বাধা দিলেন অম্বিকানাথ। ব'ল্‌লেন, রাখো তোমার—কিন্তু! গরীব হ'তে পারো, মূর্খ হ'তে পারো—তবুও তোমার আত্মসম্মান ব'লে একটা বস্তু আছে এবং থাকাটাও স্বভাবিক। সেটাকে এত সহজে বিকিয়ে দাও বলেই, প্রতিটি পদে অপদস্থ হও, অপমানিত হও। অথচ কেমন ক'রে যে তুমি নির্ব্বিকারচিত্তে সেগুলো হজম ক'রে যাও, সেই কথাটাই ভাবি!

হেসে উঠ্‌লেন অঘোরনাথ। ব'ল্‌লেন, মিথ্যে উত্তেজিত হ'য়ে লাভ কি অম্বিকানাথ? মানটা যদি খুইয়েই থাকি, হৈ-চৈ ক'র্‌লে, তা কি আর ফিরে পাবো কোনদিন? না এতে সমাজে আরও খেলো হ'য়ে প'ড়্‌তে হবে দিনের পর দিন!

রেখে দাও তোমার সমাজ! ভয়েই তুমি মরেছো।

একটু জোর দিয়েই হেসে উঠ্‌লেন অঘোরনাথ। ব'ল্‌লেন, আজও মরিনে ভাই! তাই ত এত কথা, এত দ্বন্দ্ব—এত অনুশোচনা। কিন্তু একি তুমি ক'র্‌ছো অম্বিকানাথ! নোতুন কুটুম, কথাগুলো যদি তাঁদের কাণে ভেসে যায়—তাঁরাই বা কি মনে ক'র্‌বেন বলোত? একটু থেমে ব'ল্‌লেন, যারা ছোট বুঝ্‌লে অম্বিকানাথ, তারা চিরদিনই ছোট। তাদের সকল সময়েই মানুষ পায়ে দলে; অথচ এমনই আশ্চর্য্য যে, তবুও তারা মাথা খাড়া করে রাখে। কিন্তু যারা বড়—অন্ততঃ নিজেদের বড় ব'লে পরিচয় দিতে ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে, তাদের মানুষ পায়ে দল্‌তে পারে না সত্য, কিন্তু ঝড়্‌টা ব'য়ে যায় তাদেরই উপর দিয়ে। সেদিন আমরা কি দেখি, বলোত? দেখি, একটু টেনে মৃদু হাসলেন অঘোরনাথ। ব'ল্‌লেন, সব মুড়িয়ে গেছে—না হয় একেবারে সমূলে উৎপাটিত হ'য়েছে। সেদিনের বিচারের আসনে স্থায়িত্বটা কার বেশী অম্বিকানাথ? সেই চির-পদদলিত, অবহেলিত—দুর্ব্বাদলের, না চির-শিরোন্নত অশ্বত্থ বৃক্ষের?

থামো অঘোরনাথ, সব সময় রসিকতা ভাল লাগে না। সব কিছুরই একটা মাত্রা আছে, বুঝ্‌লে?

কথাটা উপহাস্যে উড়িয়ে দিয়ো না অম্বিকানাথ! রীতিমত গম্ভীর হ'য়ে উঠ্‌লেন অঘোরনাথ। ব'ল্‌লেন, এটা যুক্তি নয়, উপমাও নয়—বন্ধুর পৃথিবীর রূঢ় বাস্তব চিত্র এই! আমরা দিনরাত নানা রূপের বিচিত্র ছবি দেখে থাকি অথচ তাৎপর্য্য বুঝি না ব'লেই দুঃখের আমাদের শেষ থাকে না! বুঝ্‌লে অম্বিকানাথ, যে মানী, মান খোয়া যায় তারই; কিন্তু যার মান নেই, তাকে সম্মানও কেউ দেয় না, খোয়াও তার কিছু যায় না—তাই প্রাণখুলে সে হাস্‌তে পারে, মনের বেদনাও প্রকাশ ক'র্‌তে পারে অসঙ্কোচে। একটু ভেবে দেখো, সে দুর্ব্বল

হ'য়েও সবল, শক্তিহীন হ'য়েও শক্তিধর। তাই তার ক্ষয় নেই, শেষ নেই—সে অনাদি, অনন্ত। তোমরা দুঃখবোধ ক'র্ছো কিন্তু আমি হাস্‌ছি! কারণ, কেদারনাথ আমার বন্ধু, তার অন্তরের বেদনা আমি মর্ম্মদিয়েই উপলব্ধি করি।

আত্মীয়স্বজন ক্রুদ্ধ হ'লেন অঘোরনাথের কথা ও আচরণ লক্ষ্য ক'রে। তাঁর সম্মুখে তাঁরা নীরব রইলেন বটে কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতিতে উপেক্ষাভরে, নাক, চোখ ও ভ্রূ কুঁচ্‌কে, উপহাস ক'রে উঠ্‌লেন—পাগল…একটা পাগল! নইলে হাসিমুখে এত বড় অপমান, বর্দ্দাস্ত ক'র্‌তে কি কেউ পার্‌তো কোনকালে?

সে কথা সমর্থনের লোকেরও অভাব দেখা গেল না। তাঁরা ব'ল্‌লেন, পাগল বলেই ত মান-অপমানের গুরুত্ব ও পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম ক'র্‌তে পার্‌লো না, বরং সেটাকে উপহাস্যে উড়িয়ে দিয়ে, আমাদেরই অপমাণ ক'র্‌লো বারে বারে। হায়রে দুর্ভাগ্য।…

*　　*　　*　　*

অঘোরনাথ উপহাস্যের লঘু হাসি হেসে আত্মীয়স্বজনের অনুযোগ ও অভিযোগ উড়িয়ে দিলেন সত্য, কিন্তু অন্তর তাঁর জ্বলেপুড়ে ছাই হ'তে লাগ্‌লো প্রতিটি মুহূর্ত্তে।

সকলেই তাঁর এই বাইরের রূপটা দেখ্‌লেন, কেউ কেউ নির্ব্বোধ ব'লে অভিযোগও ক'র্‌লেন, কিন্তু মনোরমা স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়েই অনুভব ক'র্‌লেন, তাঁর অন্তরের গোপন গভীর সেই ব্যথা ও বেদনা। মনের কোপ মনে চেপে, একান্তে পাশে এসে দাঁড়ালেন তিনি। ব'ল্‌লেন, সন্তান সে ছেলেই হোক্ আর মেয়েই হোক্, তাকে কি সহসা চোখের আড়াল ক'র্‌তে মা-বাবার মন চায়? বৌমাকে পাঠিয়ে দিয়ে, তুমি ভালই ক'রেছো। ঘুরে আসুক বরং

কিছুদিন! তাতে বেয়াইম'শায়ও খুশী হবেন, শান্তিও পাবেন অনেক-খানি। কথাগুলো নীরবে শুন্‌লেন অঘোরনাথ কিন্তু সহানুভূতি পেয়েও উচ্ছ্বসিত হ'লেন না। কারণ, তাতে মনের ক্ষোভ খানিকটা সোয়াস্তি বোধ ক'র্‌লেও—অন্তর-বেদনা রুদ্ধ দ্বারমুক্তির অবকাশ খুঁজে পায় না। তুষাগ্নির মত ধূমায়িত হ'য়ে, দেহ ও মনকে জীর্ণ ক'রে চলে প্রতিটি মুহূর্ত্তে। সুতরাং অহেতুক বাদ-প্রতিবাদের দ্বন্দ্ব বাড়িয়ে লাভ কি? তাই নীরব থাকাই তিনি শ্রেয়ঃ মনে ক'র্‌লেন। সেইসঙ্গে মনোরমাও মৌনব্রত অবলম্বন ক'র্‌লেন, কিন্তু সে রূপ মাধুরীর কাছে অপ্রকাশিত র'য়ে গেল না। সে চতুর মেয়ে। পাঁচজনের মত শ্বশুর ও শ্বাশুড়ীর মুখের হাসিটা শুধু লক্ষ্য ক'রেনি, দৃষ্টিও রাখ্‌লো তাঁদের বক্ষভেদী চাপা সেই দীর্ঘশ্বাসের প্রতি। শঙ্কিত হ'ল মন। অজানা আশঙ্কায় হৃদয়টা কাঁপলো বার বার। ভাব্‌লো, চক্ষুলজ্জায় এতদিন বলি বলি ক'রেও যা প্রকাশ করা সম্ভবপর হ'য়ে ওঠেনি, আজ আর তা রুদ্ধ ক'রে রাখা চলে না! কিন্তু…তারও ত একটা উপলক্ষ্য থাকা চাই!

* * * * *

বাপের বাড়ীতে ফিরে এলো মাধুরী। চকিতে আনন্দ-মুখর হ'য়ে উঠ্‌লো সেখানের আকাশ-বাতাস, এমন কি ঘরের জানালা, দরজা, বরগাটি পর্য্যন্তও। মনে হ'ল সবই যেন মধুময়—সবই যেন আনন্দময়। কেদারনাথও আনন্দে মুখর হ'য়ে উঠ্‌লেন। কন্যার মাথাটা বুকে চেপে আবেগমিশ্রিত কণ্ঠে বল্‌লেন, সত্যই এতক্ষণে প্রাণটা যেন ফিরে পেলাম মাধু'মা—ফিরে পেলাম সবকিছু! জগতটা এতক্ষণ যেন অন্ধকারে ঢাকা পড়েছিল—যেই তুমি এলে মা, আলোতে সব ভরপূর হ'য়ে গেলো। একটু হেসে উঠে ব'ল্‌লেন, সাধে কি বলি, মাধু'মা ঘরের আমার আলো—সে নইলে ঘর আমার পরিপূর্ণ

হয় না! কোথায় গেলে, ওগো? আরে দেখেছো, কে এসেছে? মা এসেছে, মা এসেছে আমার! তারপর ওবাড়ীর সব খবর ভাল ত?

মাথাটা মৃদু হেলিয়ে মাধুরী উত্তর দিল, হ্যাঁ।

বিনয়?

ভালই আছেন। মাধুরীর চোখে মুখে আনন্দের ছায়া উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠ্‌লো।

কেদারনাথও খুশী হ'লেন। ভালবাসার রূপই ত এই! যে যাকে অন্তর দিয়ে ভালবাসে, তার নামটুকু কাণে এলেও আনন্দে হৃদয় উদ্বেলিত হ'য়ে ওঠে।

সুচারুদেবী পরমুহূর্ত্তেই পাশে এসে দাঁড়ালেন। চোখেমুখে তাঁর আনন্দের উদ্ভাসিত ছায়া। ব'ল্‌লেন—তা' হ'লে বেয়াইম'শায় কথা তোমার রেখেছেন?

অঘোরনাথ! আরে চেনো না তাকে! এমন মানুষের জোড়া খুঁজে পাবে কি এ ভূ-ভারতে? বড় আত্মভোলা—বড় ভালমানুষ! প্রয়োজন-বোধে হাসিমুখে নিজের কল্‌জেটাও খুলে দিতে পারে সে! তাই ত এত জোর করি—এত আব্‌দার করি। জানি, সে ঠেল্‌তে পারবে না! যাও, এখন যাও—মাকে আমার ঘরে নিয়ে যাও—এপাশে দেখি, বাজারে কিছু ভাল জিনিষ পাওয়া যায় কিনা! ফির্‌তি পথে অমনি অঘোরনাথের সঙ্গে দেখা ক'রে ব'লে আসি, কাল রাত্রে বিনয় এখানে এসেই খাবে! কি বলো?

উত্তরের অপেক্ষা ক'র্‌লেন না কেদারনাথ। নিজের মনের আনন্দে বিভোর হ'য়ে বেরিয়ে প'ড়্‌লেন পথে।

সুচারুদেবী মেয়েকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। হাসিমুখে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন—এ কটা দিন সেখানে কোন কষ্ট হয়নি ত মা?

কষ্ট! কেন মা?

কথাটা অপ্রাসঙ্গিক। নিজের ভুলটা বুঝ্‌তে তাঁর একটি মুহূর্ত্তও বিলম্ব হ'ল না। মোড় ফিরিয়ে নিয়ে ব'ল্‌লেন—কষ্ট ঠিক নয়—মানে নোতুন আবহাওয়া ত! মানিয়ে কি সবাই চল্‌তে পারে?

পারে না হয়ত সত্য কিন্তু চ'ল্‌তেও ত হয়! ধীরকণ্ঠে জবাব দিল মাধুরী।

সুচারুদেবী গম্ভীর হ'য়ে উঠ্‌লেন। ব'ল্‌লেন, ঠিক ওই কথাটাই ব'ল্‌তে চেয়েছিলাম—প্রথম, প্রথম একটু কষ্ট ত হবেই! আর সেটা স্বাভাবিকও এ-সংসারে।

মাধুরী উত্তরে মৃদু হাস্‌লো। ব'ললো—উপায় কি মা? এটাই ত এ-জগতের নিয়ম!

সহসা উত্তর খুঁজে পেলেন না সুচারুদেবী। মনে মনে ভাব্‌লেন, প্রবাদটা নিছক মিথ্যা নয়, বিয়ে দিলেই মেয়ে এমনি পর হ'য়ে যায়! প্রকাশ্যে কিন্তু ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটিয়ে ব'ল্‌লেন—বেয়াইম'শায় এবারে কিন্তু সহজে পাঠাতে রাজী হন্‌নি! ব'ল্‌লেন—মেয়ে আপনার, জামাইও আপনার! আমরা বুড়ো-বুড়ি যে কটা দিন আছি একটু আমোদ-আহ্লাদ ক'রে নিই বেয়ানঠাকুরাণী! আমি ত ছাড়বার পাত্র নই! ব'ল্‌লাম—আপনার সব কথাই সত্যি, কিন্তু দেখ্‌ছেন ত আমার এপুরীর সবকিছুই অন্ধকার। যেন খাঁ-খাঁ ক'র্‌ছে দিনরাত—

একটু থেমে সুচারুদেবী ব'ল্‌লেন, বেয়াইম'শায় বড় দরদী লোক! কথাটা শুনে তাঁরও চোখের পাতাগুলো ছল-ছল ক'রে উঠ্‌লো। ব'ল্‌লেন, তাই হবে বেয়ানঠাকুরাণী! কালই আমি বৌ-মাকে পাঠিয়ে দেবো।—সত্যই বড় ভালমানুষ উনি!

মাধুরী কিন্তু সে হাসিতে যোগ দিতে পার্‌লো না। সঙ্গে সঙ্গে তার চোখের তারায় ভেসে উঠ্‌লো—সেই নির্ব্বিরোধী আত্মভোলা

মানুষটির ম্লান ও কাতর মুখের ছায়াখানা। ব'ল্লো, কাজটা ভাল করোনি মা!

ভাল করিনি? বিস্ময়ে ফেটে প'ড়্লেন—সুচারুদেবী। মা-বাবা কি তবে তার আপনজন নয়? এত স্নেহ, মায়া, মমতা—সবই কি তবে অর্থহীন? হয়ত হবে! সুচারুদেবীর অন্তরখানা গুম্‌রে ওঠে—একটা অব্যক্ত বেদনায়। ভাবেন, মানুষ কি তবে মিথ্যাই আপন আপন গণ্ডী কেটে মাথাকুটে মরে? অথচ যাদের জন্য এত করে, তারা কি কোনদিন পিছন ফিরে তাকাবে না? হায় রে দুনিয়া—

মাধুরী বলে—সত্যই ভাল করোনি মা! যাঁরা হৃদয়ের ব্যথা বুঝেন, তাঁদের অন্তরে করুণার উদ্রেক ক'র্‌তে যাওয়াটাই ধৃষ্টতা! হয়ত ব'ল্‌বে, কেন? উত্তরে আমি ব'ল্‌বো—তাঁরা বোঝেন ব'লেই—কারেও প্রাণে ব্যথা দিতে পারেন না—সেখানেই তাঁরা শক্তিহীন—সামর্থ্যহীন—একান্ত অসহায়! অথচ আমরা সাধারণ মানুষ, তাঁদের সেই দুর্ব্বলতার সুযোগ গ্রহণ ক'রে নির্ব্বিকারচিত্তে হয় 'পাগল, না হয় বোকা' উপাধিতে ভূষিত ক'র্‌তে এতটুকুও দ্বিধা বোধ করি না!

সুচারুদেবী রীতিমত গম্ভীর হ'য়ে উঠ্‌লেন।

মাধুরী ব'ল্লো—তুমি হয়ত রাগ ক'র্‌বে, কিন্তু এটাই ত সত্য দুনিয়ায়!

উত্তর দিলেন না—সুচারুদেবী। নীরবে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে ভাব্‌লেন—কথাটা মিথ্যা নয়! কিন্তু সে বস্তুর মূল্য এ-জগতে কে আর দিয়েছে কবে? সাধারণ অর্থে মূল্য হ'ল বিনিময়। যেখানে সে বস্তু আছে, মূল্যও একটা তার পাওয়া যাবেই: কিন্তু যেখানে নেই, সেখানেই সে মূল্যহীন। এর বেশী—সে-গণ্ডীর ধার দিয়ে কি কেউ চলে কোনদিন? তাই বাস্তব হয় রূঢ়—চলার পথটাও হয় বন্ধুর। সোজা পথকেই তারা ক'রে নেয় আপন—এটাই তাদের জন্মাগত সংস্কার!...

*　　*　　*　　*　　*

কয়েকটা দিন হৈ চৈ-এর মধ্যে কেটে যাওয়ার পর, কেদারনাথ পুনরায় জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন—তা হ'লে তুমি কি মনঃস্থির ক'র্‌লে মা !

কথাটার মর্ম্ম ঠিকভাবে উপলব্ধি ক'র্‌তে না পেরে সবিস্ময়ে মাধুরী কেদারনাথের মুখের দিকে ফিরে তাকালো।

ভুলটা বুঝ্‌তে পার্‌'লেন কেদারনাথ। কথাটা আরও একটু স্পষ্ট ক'রে ব'ল্‌লেন—আমি বিনয়ের বিলেত যাওয়ার কথা পেড়েছি মা ! আমার মনের ইচ্ছা ত তুমি জানো ! যখন সে আস্‌ছে বছর ফাইন্যাল দিচ্ছে, তখন সব ব্যবস্থা ত এখন থেকেই সেরে রাখা উচিত !

মাধুরী নীরব।

কেদারনাথ ব'ল্‌লেন—ভাল ক'রে ভেবে দেখ মা ! তোমার মঙ্গল ছাড়া অন্য কোন কামনাই আজ আর জীবনে আমার নেই। লোকে জানে, আমি জমিদার। কথাটা উত্তরাধিকারসূত্রেই নেমে এসেছে বটে, কিন্তু আর কেউ জানুক্ বা না জানুক্, আমি ত নিজে বুঝি, তালপুকুরের নামডাকই সার—জল নেই সেখানে ! যা আছে, তাতে, আমার নিজেরও বাকী কটা দিন স্বচ্ছন্দে, সচ্ছলভাবে কাট্‌বে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ ! তাই ব'ল্‌ছিলাম—যদি ও একটিবার বিলেত থেকে ঘুরে আসে—ওর উপায়ের টাকা খায় কে ? অহেতুক চিন্তার প্রয়োজনও আমার থাকে না !

মাধুরী সংক্ষেপে জবাব দিল—সবই বুঝি, কিন্তু মনটা যে সায় দিচ্ছে না বাবা !

মৃদু একটু হেসে স্নেহমিশ্রিত মধুরকণ্ঠে ব'ল্‌লেন—সংসারে বাস ক'র্‌তে হ'লে, এত দুর্ব্বলতা কি শোভা পায় মা ? একটু দৃঢ় হও, মনটাকে সংযত করার চেষ্টা ক'রো !

চেষ্টার ত ত্রুটি রাখিনে, কিন্তু পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায়—

বক্তব্যটা শেষ ক'র্‌তে পার্‌লো না মাধুরী। কণ্ঠস্বর তার আর্দ্র হ'য়ে উঠ্‌লো।

একটু জোর দিয়ে হেসে উঠ্‌লেন কেদারনাথ—ও বুঝেছি! কিন্তু ভয় কিসের মা?

মাধুরী জবাব দেয় না।

কেদারনাথ আশ্বাস দেন—সংসারে আগুন জ্বলে কথাটা ঠিক। সে চিত্র, আমি নিজের চোখে দেখেছি, শুনেওছি বহুবার। কিন্তু বিনয় ত আমার সে প্রকৃতির ছেলে নয়!

তা ভাল ক'রেই জানি বাবা! কিন্তু—

কথাটা সম্পূর্ণ ক'র্‌লেন কেদারনাথ নিজেই। ব'ল্‌লেন—নিজের ওপর তোমার সে বিশ্বাস নেই—তাই এত ভয়—এত ব্যাকুলতা। কিন্তু মা, তুমি ত আমার এত বুদ্ধিমতী! এ কথাটা কি ভেবে দেখেছো—ঘটির জল গড়িয়ে খেলে—বেশীদিন চলে না! তাতে জল ভ'র্‌তে হয়, নইলে তৃষ্ণা মেটাবার সামর্থ্য তার থাকে না। তেমনি নিজেরও কিছু আয়ের ব্যবস্থা ক'রে রাখা উচিত, নইলে পৈত্রিক সম্পত্তির আয় কিংবা সঞ্চিত অর্থে একটা জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ করাও সম্ভব হয় না কোনকালে! তাই বলি—একটু টেনে জোর দিয়ে ব'লে উঠলেন—একটু ধীর ও স্থির চিত্তে কথাগুলো আমার ভেবে দেখো মা! তাড়াতাড়ি এখুনি যে তোমায় মত দিতে হবে সেরূপ কথা অবশ্য তোমায় আমি ব'ল্‌ছিনে!

* * * * *

মেয়েকে বোঝানোর উদ্দেশ্যেই কথাকয়টি ব'লেছিলেন কেদারনাথ। কিন্তু বিচলিত হ'ল মাধুরী। কুমারী জীবনে বহু কথাই সে শুনেছে

আত্মীয়স্বজনের মুখে, কিন্তু গায়ে সে মাখেনি। এক কানে শুনেছে, অপর কানে তা বেরিয়েও গেছে নিঃশব্দে। তার মূল্য কতটুকু, সে কথা বাচাইয়ের হয়ত অবসরও ছিল প্রচুর—কিন্তু তলিয়ে দেখার মত ধৈর্য্য তার ছিল না সেদিন! সব কথা তাই সে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল—মূল্য তার দেয়নি। অথচ যেদিন, যে মুহূর্ত্তে সে মাথায় দিল ঘোমটা, সিঁথিতে প'র্‌লো সিঁদুর, সেই মুহূর্ত্ত থেকেই যেন তার কেন্দ্রচ্যুত আমি, সহসা কেন্দ্রীভূত হ'য়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার দিল অবকাশ। সে, হ'ল সচেতন। প্রতিটি জিনিষ তলিয়ে দেখ্‌তে, শুন্‌তে ও ভাব্‌তে, সুরু ক'র্‌লো। ফলে, হ'ল সে গম্ভীর, হ'ল নোতুন মানুষ! পরিবর্ত্তিত হ'ল মন, দিগ্‌পরিবর্ত্তন ক'র্‌লো চিন্তাধারা। আজ ত আর সে একা নয়! নোতুনের সংস্পর্শে এসে জীবনে তার এসেছে বিপ্লব—পেয়েছে সে নোতুন পথের সন্ধান। শিহরিত হ'য়েছে মন—রোমাঞ্চিত হ'য়েছে দেহ, পুলক হিল্লোলে স্পন্দিত হ'য়েছে দেহের শিরা-উপশিরা। তাই নিজেকে হারিয়েও পেয়েছে সে তৃপ্তি, হৃদয় পেয়েছে আত্মপ্রতিষ্ঠার দীর্ঘ অবসর।

একদিন যে কল্পনারাজ্যের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের রূপধারায়, তনু-মন ছিল মগ্ন, সেই স্বপ্ন-জীবনকে বাস্তব সুখ-পরশে একেবারে রিক্ত ক'রে নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে না পার্‌লে, তৃপ্তি কি পাওয়া যায় কোনদিন? রিক্ততাই ত পূর্ণতা! নিজেকে পূর্ণতর ক'রে নেওয়ার সেই ত দেয় অবকাশ! এরই নাম ভালবাসা, এরই নাম প্রেম, এরই নাম তৃপ্তি, এরই নাম সুখ, এরই নাম শান্তি! যেখানে নেই এই রিক্ততার ঠাঁই, সেখানে পরিপূর্ণ ক'রে ভরিয়ে নেওয়ার নেই অবকাশ—দ্বন্দ্ব জাগে সেখানেই। কলহও বাঁধে বাসা—ভাঙন সুরু হয় প্রতিটি মুহূর্ত্তে।

মাধুরীর জীবনে এসেছে সেই শুভ মুহূর্ত্ত। তাই সে নিজেকে রিক্ত

ক'রে, নিজেই নিজেকে ক'রেছে পূর্ণ! নিজের পৃথক সত্ত্বা উপলব্ধির অবসর আজ আর তার নেই। তাই স্বামীর অপমানে, অন্তরে তার জাগে ব্যথা, স্বামীর শক্তিহীনতায়—জীবনে নামে দৈন্যতার ছায়া। মুখের হাসি যায় ঝ'রে।

"ঘটির জল গড়িয়ে খেলে"—শেষ সে হবেই! কথাটা সবাই জানে, সবাই বোঝে। তবুও ত বাবা তার সেকথা স্মরণ করিয়ে দেন বারে বারে!

মাধুরী ভাবে—নিবিড়তর ক'রে ভাবে, স্বামী তার দরিদ্র—কথাটা রূঢ় হ'লেও সত্য, কিন্তু শক্তিহীন ত নয়! বিদ্যাবুদ্ধিতে কারও চেয়ে কি হীন কোনকালে? না—না—না, অন্তরাত্মা তার চীৎকার ক'রে ওঠে।

. . .

কখন যে বিনিদ্র রজনী কেটে গেল, বুঝ্‌তে পার্‌লো না মাধুরী। সে বোধশক্তি আজ তার স্তিমিত। ক্ষোভে, অপমানে, লজ্জায় সে আজ দিশেহারা। না, না, না—তার স্বামীর অপমান, তার নিজের অপমান, তার আত্মার অপমান। না—না—না—এ অপমানের বোঝা নীরবে সে বহন ক'র্‌তে পারে না কোনদিন!

বিলাস-ব্যসন ও ঐশ্বর্য্যের মধ্যে আশৈশব সে লালিত ও পালিত। সে-মোহ ও সুখের নেশাকে উপেক্ষা ও অবহেলায় সহসা উড়িয়ে দেওয়ার সাধ্য তার নেই, একথা মনে-প্রাণে বিশ্বাসও ক'রে সে। তবুও সেই একান্ত প্রিয় বস্তুগুলো যেন তার কাছে আজ কণ্টকাকীর্ণ ব'লে প্রতীয়মান হ'ল। না—না, পদদলিত, অবহেলিত এই সুখের নেশার মধ্যে যত মাদকতাই লুকানো থাকুক্ না কেন, আজ সত্যই তা অসহনীয়! সে বাঁধন তাকে ছিন্ন ক'র্‌তেই হবে।

দুঃখ! সে যতই রুক্ষ ও বেদনাদায়ক হোক্, যতই রূঢ় ও নির্ম্মম হোক্, তার মধ্যেও আছে স্বাধীনতা, আছে মুক্তির

আনন্দ! আজ সেই বস্তুটাই তার কাছে স্বর্গসুখ ব'লে প্রতীয়মান হল। নিজের মনে ভাবলো—হ্যাঁ—হ্যাঁ, সেটুকুই ত সে চায়! তারই জন্য ত অন্তরাত্মা কাঁদে বারে বার!···সেই ত স্বাধীনতা, সেই ত মুক্তি, সেই ত সুখ, সেই ত তৃপ্তি, সেই ত দেবে তাকে আত্মপ্রতিষ্ঠার দীর্ঘ অবসর!···

* * * *

পরদিন সন্ধ্যায়, বিনয়ের সঙ্গে দেখা হ'ল মাধুরীর। চকিতে অন্তরাত্মা তার আত্মপ্রকাশের আশায় উদ্‌গ্রীব হ'য়ে উঠ্‌লো। কিন্তু অবসর সে পেল না। হাসিমুখে সাম্‌নে এসে দাঁড়ালেন কেদারনাথ। ব'ল্‌লেন, বাইরে দু'কাপ চা পাঠিয়ে দিয়ো তো মা!

মাধুরী সেই হাসিভরা মুখের দিকে তাকিয়েই প্রকৃতস্থ হ'য়ে প'ড়্‌লো। একপাশে স্নেহময় পিতা, অন্যপাশে জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের জীবন্ত প্রতীক—তার স্বামী—তার অন্তর-দেবতা। একপাশে সে নিজে, অন্যপাশে জীবনকে পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধির স্নিগ্ধ পরিবেশ। জীবনে উভয়েরই প্রয়োজন আছে—মূল্য উভয়েরই সমান। হীন কেউ নয় কারও কাছে!

কয়েক সেকেণ্ড স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইলো মাধুরী। কোন্‌টা বড়? স্নেহ, মায়া, মমতা—না জীবনের এই নির্ভর অবলম্বন!

কে বড়?···কে বড়? কাৎরে উঠ্‌লো তার অন্তরাত্মা। জীবনের যাত্রাপথে কোন্ বস্তুটার মূল্য সকলের চেয়ে বেশী?

কে যেন কর্ণকুহরে তার ফিস্ ফিস্ ক'রে ব'লে উঠ্‌লো, বড় তোমার জীবন—বড় তোমার আশা—বড় তোমার আকাঙ্ক্ষা! তাকে পরিপূর্ণ ক'রে ভরিয়ে নেওয়ার জন্যই ত তোমার সৃষ্টি!

সৃষ্টি···সৃষ্টি···সৃষ্টি···নিজের মনে নিজেই চিন্তা বিভোর হ'য়ে, মাধুরী ফিরে গেল নিজের ঘরে। বিনয়কে একটু অপেক্ষা ক'রতে ব'লে, ফিরে গেল পাশের ঘরে।

পরিপাটি ক'রে তৈরী ক'রলো চা। বাইরের জন্য, বেয়ারার হাতে দু'টো পেয়ালা তুলে দিয়ে সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো। বিনয়ের হাতে পেয়ালাটা তুলে দিয়ে ব'ল্‌লো, দাঁড়িয়ে র'য়েছো যে? বসো!

বিনয় পালঙ্কের উপর একটু চেপে ব'স্‌লো। ব'ল্‌লো, তোমার কি শরীর খারাপ মাধু?

কই, না তো! ম্লান একটু হাসার চেষ্টা ক'রলো মাধুরী।

তবে মুখখানা তোমার এত শুক্‌নো দেখাচ্ছে, কেন? হাতখানা তার নিজের হাতে টেনে নিয়ে স্নেহবিগলিত কণ্ঠে ব'ল্‌লো বিনয়, আমার চোখ দুটোকে কি এত সহজে ফাঁকি দিতে পারো? বলো, কি হ'য়েছে?

কই, কিছু ত না! আত্মগোপনের আশায় মৃদু একটু হাস্‌লো মাধুরী। কিন্তু আত্মসংবরণ ক'রতে পার্‌লো না। সেই মুহূর্ত্তেই পুলক শিহরণে শিহরিত হ'ল তার দেহ। অপরূপ সেই তড়িৎ প্রবাহে দুলে উঠ্‌লো তার মন। মাধুরী—মনে-প্রাণে অনুভব ক'রলো এরই নাম পূর্ণতা! এরই মাঝে জীবনের যতকিছু বোঝা-পাড়া, যত কিছু বাদ-বিসম্বাদ, সব কিছুই একান্তে হ'য়েছে লীন। তাই জীবনের কাম্য হ'ল পূর্ণতা—আদর্শ হ'ল তার সৃষ্টি। অহরহ এরই দ্বন্দ্ব চলে যুগ যুগ ধরে।

কিন্তু রুদ্ধ হ'ল তার বুকের ভাষা। অপলক দৃষ্টিতে শুধু স্বামীর মুখের দিকে রইলো সে তাকিয়ে।

আদরে তার চিবুকখানা তুলে ধ'রে বিনয় জিজ্ঞাসা ক'রলো—কিছু কি ব'ল্‌বে?

মাধুরী উত্তর দিল না। স্বামীর কাঁধে মাথাখানা রেখে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো কয়েক মিনিট। তারপর মৌনতা ভেঙ্গে জড়তা-ভরা কণ্ঠে ব'ল্‌লো—ব'ল্‌বো···আজ কিন্তু নয়!

ব্যাকুলকণ্ঠে বিনয় জিজ্ঞাসা ক'র্‌লো—কবে? কবে মাধুরী? কি ব'ল্‌বে? বলো—লক্ষ্মীটি, বলো—

উত্তর দেয় না মাধুরী।

বিনয় মিনতি জানায়—বলো—মাধুরী—বলো! লক্ষ্মীটি, বলো—

মাধুরী মুখ তুলে স্বামীর মুখের দিকে তাকালো। ব'ল্‌লো—শুন্‌বে?···এখুনি?

হ্যাঁ! আজই! নইলে এতটুকুও যে শান্তি পাবো না মাধু!

কিন্তু সে কথাটা যে বড় রূঢ়!

হোক্‌! তবুও আমি শুন্‌বো। বলো লক্ষ্মীটি, বলো—

তোমায় স্বাবলম্বী হ'তে হবে—

আবেগে মাধুরীকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে ব'ল্‌লো—এই কথা? বেশ, তাই হবে! কথা তোমায় দিলাম।

মাধুরী নীরব।

বিনয় তার চিবুকখানা হু'হাতে তুলে ধরে আবেগমিশ্রিত কণ্ঠে ব'ল্‌লো—বিশ্বাস করো মাধুরী—তোমার জন্য এ-দুনিয়ায় কী না আমি ক'র্‌তে পারি—

বাধা দিল মাধুরী। ব'ল্‌লো—ওগো, আমি আর কিছু চাই না—শুধু চাই, শুধু দেখে যেতে চাই—তুমি হ'য়েছো সুখী! এর বেশী কোন কামনাই যে আজ হৃদয়ে আমার নেই—

আবেগে পুনরায় মাধুরীকে বুকের মধ্যে চেপে জড়তাপূর্ণ ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বিনয় ব'লে উঠলো—আমিও যে তোমায়—সুখী ও খুশী

দেখতে চাই মাধু! সর্ব্বান্তঃকরণে সেই কামনা যে আমিও পোষণ করি!

মাধুরী মনে-প্রাণে তা বিশ্বাস করে বলেই নীরবে স্বামীর বুকের ওপর মাথাখানা রেখে নিশ্চিন্তে বিশ্রাম গ্রহণ করে। উত্তর সে দেয় না—দেওয়ারও ছিল না কিছুই। কিন্তু সারা দিন, সারা রাত যে কথাগুলো বারবার অন্তরে তোলপাড় ক'রেছিল, যার বেদনা-ভরে জর্জ্জরিত সে হ'ল প্রতিটি পলে, তার বহিঃপ্রকাশই দিয়েছে তাকে মুক্তি! তাই নীরবে উপভোগ করে সে নির্ম্মল প্রশান্তি। তার বেশী, হয়ত চায় তার অন্তর—কিন্তু গভীর উত্তেজনা ও অবসাদে শিথিল হ'য়েছে তনু, অবশ হ'য়েছে মন। পূর্ণতার রূপ-ই হয়ত এই!...

*　　*　　*　　*　　*

বিনয়ের জীবনে এসেছে পরিবর্ত্তন। একদিন যে বস্তুটিকে জীবনের পরিপূর্ণ রূপ ব'লে সে চিন্‌তো, যেটুকু পেয়ে অন্তর তার পেয়েছিল তৃপ্তি, আজ দেখলো—সেটুকু জীবনের চাওয়া-পাওয়ার ভগ্নাংশ মাত্র। তাতে শান্তি পাওয়া যায়, কিন্তু দেহ-মন পায় না তৃপ্তি, প্রাণ পায় না প্রাণের পরশ, হৃদয় পায় না তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের সন্ধান। তাই জীবনের সহজাত সরল রূপ, গণ্ডীর এই ক্ষুদ্র আবেষ্টনে পিষ্ট হয় প্রতিটি মুহূর্ত্তে।

কিন্তু যে মুহূর্ত্তে দেখ্‌লো এবং চিন্‌লো সেই পূর্ণতার পরিপূর্ণ রূপ—সেই মুহূর্ত্ত থেকেই জীবনে অনুভব ক'র্‌লো সে এক অপূর্ব্ব উদ্দীপনা ... ভুলে গেল নিজেকে।

এতদিন নিজের সুখ ও শান্তির কথাই সে ভেবে এসেছিল মনে-প্রাণে, কিন্তু একি বিপ্লব ঘটে গেল তার জীবনে!

এত সহজে, এত আয়াসে সে ভুলে গেল সেই সুখ-শান্তির ক্ষুধা!

নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে, এত গভীর আনন্দ ও তৃপ্তি যে মানুষ লাভ ক'র্‌তে পারে, ইতিপূর্ব্বে সেকথা ভেবে সে দেখেনি কোনদিন—সে চিন্তার অবসরও ছিল না তার। তাই নবোপলব্ধ এই আবেগ ও শিহরণের আবর্ত্তে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্ত—সজীবতার স্পন্দনে মুখর হ'য়ে উঠ্‌লো।

অথচ মাত্র কয়েক দিন পূর্ব্বেও যে জীবনের রূপ ছিল স্বপ্নময়—ছন্দমালায় গাঁথা ছিল যার হৃদয়-তন্ত্রী—আশা আকাঙ্ক্ষার প্রদীপ যার—স্বকীয় স্বার্থসিদ্ধির গণ্ডী অতিক্রম ক'র্‌তে ব্যথা অনুভব ক'র্‌তো, সেই মানুষই আজ পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলো—রিক্ত কঙ্কাল আর রক্তমাংসের প্রলেপে সুগঠিত জীবনের সাধনা এক নয়!

সেদিনের স্বপ্ন ছিল—বড় হবো। পাঁচজনের একজন হ'য়ে সমাজে, সংসারে, নিজেকে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত ক'র্‌বো। সকল বাধা-বিঘ্নকে চূরমার ক'রে নিজেই হবো প্রধান!···আর আজ?

হৃদয়ে একটিমাত্র সুর ধ্বনিত হ'চ্ছে—মানুষের মত মানুষ হ'তে হবে! সমাজে, সংসারে, সকলের মুখে হাসি না ফোটালে, জীবন কি কভু সার্থক হ'তে পারে? বিনয় গভীর ক'রে ভাবে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই ত পথ! নইলে মানব জনমটা যে ব্যর্থ হ'য়ে যাবে!···

দিন যায়, মানুষের জীবনের রূপও বদলায়। একদিন যা ছিল সত্য, যার একনিষ্ঠ সাধনাই ছিল সেদিন—সে-জীবনের চরম সার্থকতা, কালে সেই ছায়ারূপ পরিগ্রহে ঘৃণ্য বস্তুতে হয় রূপায়িত! বিনয়ও, মানুষ! তার অতীত-জীবনের যাবতীয় কিছু, সমস্তই মনে হ'ল যেন প্রবল, রূঢ় ও রূক্ষ। নোতুনের সংস্পর্শে এসে তার দৃষ্টি গেছে ব'দ্‌লে, চিন্তাধারার রূপও ক'রেছে পথ পরিবর্ত্তন। তাই নির্জ্জনে বসে বার বার ভাবে—সত্যই সেদিন, সে-জীবনের রূপ তার ছিল

যেন কায়াহীন ছায়া। আর আজ সেই কায়া, কমনীয়তা ভরপূর তাজা রক্তমাংসের প্রলেপে হ'য়েছে স্বয়ং-সম্পূর্ণ। তাই মমতায় ভ'রে গেছে প্রাণ, ত্যাগের বাসনায় মুখর হ'য়েছে প্রতিটি হৃদয়-তন্ত্রী। তারই আবেগ ও উত্তেজনায় ভুলেছে সে সুতীব্র সেই কামনার তীব্র হলাহল। পরিবর্ত্তে, নেমেছে নিবৃত্তির ছায়ে ঢাকা সুতৃপ্তির স্নিগ্ধ পরিবেশ। তাইত লাগে ভাল তার এই নবীন জীবন!

মাতাপিতার স্নেহের তুলনা নেই এ জগতে! সে যেন নির্ঝরিণীর স্বচ্ছ-শীতল ধারা! তার পরশে দেহ-মনের মলিনতা হয় বিদূরিত, কিন্তু প্রাণ আত্ম-প্রতিষ্ঠার পায় না অবকাশ। তাই চঞ্চলতায় সে মুখর হ'য়ে ওঠে বার বার। নিজস্ব আসন প্রতিষ্ঠার আশায় ব্যাকুল হ'য়ে ছুটে চারিধার।—

যেখানে নেই লেন-দেন, নেই চাওয়া ও পাওয়ার নিবিড়তর কামনা—সেখানের সেই গুরু-গম্ভীর পরিবেশে, সাময়িক শান্তিলাভের সম্ভবনা থাকে বটে, কিন্তু স্থায়ী বসবাসের আসন পাতা সম্ভব হয় না কোনকালে। তাই যখন স্থায়ী ব্যথার হাহাকারে হৃদয়টা পুড়ে ছাই হ'য়ে যায়, তখনই সেই নির্ঝরিণীর শীতল পরশের আশায়, দেহ-মন ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে—অথচ স্থায়ী স্নিগ্ধতার সেই শীতল পরশও জীবনের দ্বারে বোঝায় রূপায়িত হ'য়ে, জীবনকে পিষ্ট ক'রে প্রতিটি মুহূর্ত্তে। হয়ত এ'টাই প্রকৃতির রীতি—জীবনের সহজাত ক্ষুধা! এরই আশাপথ চেয়ে মানুষের জীবন-তরী খেয়া-পথ বেয়ে চলে যুগ যুগ ধরে…

* * *

হৃদয়ের তৃষা মেটাবার আশায় মানুষ বাসে ভালো। সেই ভালবাসাই হয় তার জীবনের নেশা ও পেশা। সেইটুকুই হয় তার জীবনের শেষের সঞ্চয়! তাই ভালবেসে হৃদয়ের ক্ষুন্নিবৃত্তি ঘটে, অথচ বিনিময়

ব্যতিরেকে ও তৃপ্তি সে পায় না কোনকালে। তাই যেখানেই আছে সেই বিনিময়, মানুষ স্থিতির আসন পাতে সেখানেই। সেখানেই সে নিজেকে রিক্ত ক'রে পায় সুখ, পায় তৃপ্তি। তার বৈচিত্রই হয় জীবনের রূপ। বিনয় তলিয়ে দেখার চেষ্টা করে, মা-বাবার এই যে নিবিড় স্নেহ, প্রীতি ও ভালবাসা—সত্যই সে শুধু দিয়ে যায়—বোধ করি, হৃদয় তাই ভরে না। ফিরে কিছু পাওয়ার আশা ও নেশায়, হৃদয়ে জাগে চিরন্তনীর সেই দীর্ণ হাহাকার। সেই ব্যথা ও বেদনা পরিপূরণের নেশাই হ'য় জীবনের রূপ! তার পথ চেয়েই, ছুটে সে নিরন্তর—ঠিক যেমনটি ধায় নদী, সাগর অভিমুখে।...

জীবনে প্রেমের গতিধারাও ঠিক সেইরূপ। নিজেকে বিলিয়ে দিয়েই তার তৃপ্তি! অথচ ফিরে তার কিছু পাওয়া চাই, নইলে বুক ভরে না—মনও বাঁধে না বাসা!

চর নদীর গতিবেগকে করে রুদ্ধ, তার জীবনের মেয়াদ হয় শীর্ণতর। তবুও সেটাই হয় সৃষ্টি! সেটাই হয় তার জীবনের পূর্ণতার রূপ। তারই জন্য নিজেকে রিক্ত ক'রে সে প্রতিটি মুহূর্তে।

সন্তানও মা-বাবার জীবনতটের সেই চরভূমি। তার পুষ্টিসাধনই হয় তাঁদের জীবনের একমাত্র কামনা। কিন্তু সন্তানের প্রকৃতিজাত জীবনের ক্ষুধা তৃপ্ত হয় না, মা-বাবার হৃদয়-নিঃসৃত ওই স্নিগ্ধ স্নেহ-ধারায়—তাই সে ছুটে—হয় বহির্মুখী।

যেখানে পায় সে মিলন-পিয়াসী হৃদয়ের সান্ত্বনা, পায় লেন-দেনের দীর্ঘ অবকাশ—জীবনে সেই হয় প্রিয়তর বস্তু—হয় জীবন অপেক্ষা প্রিয়!—আজ তাই বিনয়ের জীবনে, মাধুরীর আসন-ই হ'ল সকল কিছুর্র চেয়ে শ্রেয়ঃ এবং প্রিয়। তাকে সুখী ক'রেই সে তৃপ্ত। এ-দুনিয়ায় সকল কিছু ত্যাগ ক'র্তেও দ্বিধাও জাগে না তার মনে।

মাধুরী চেয়েছে সে স্বাবলম্বী হোক—হ'তেও হ'বে তাই। কারণ,

আজ আর ত সে একা নয়—নিজের খেয়াল ও খুশীমত চলার অধিকারও তার নেই! যাকে কেন্দ্র ক'রে তার জীবনে এসেছে পূর্ণতা, তার সুখ ও শান্তি নইলে জীবন-সাধনা কি কভু পূর্ণতর হ'তে পারে কোনদিন ?...

*　　*　　*

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারে, ছেলে-মেয়েদের স্বাবলম্বী হওয়ার অর্থই হ'ল—হয় দাসত্বের শিকলে আত্মসমর্পণ—নয় আত্মবিক্রয়! বিনয়কে শেষ পর্য্যন্ত সেই পথই অবলম্বন ক'র্‌তে হ'ল। এ ছাড়া উপায়ই বা কি ? এই চির দারিদ্র্য নিপীড়িত দেশে, পৈতৃক সঞ্চিত অর্থ ছাড়া এক পা অগ্রসর হওয়া সম্ভব কি কোনদিন! মানুষের শক্তি ও সামর্থ্যকে উপেক্ষা করাই ত এ দেশের ধর্ম্ম!—সেখানে বিশ্বাস কথাটা অবান্তর—সততা মূল্য-হীন, শঠতাই হয় চলার পাথেয়। এটা বঞ্চিত, রিক্ত ও শোষিত দেশের সহজাত জীবন- চিত্র, এর বেশী আশা করা শুধু পাপ নয়, অন্যায়ও বটে অনেকখানি!

কয়েকদিনের মধ্যে বিনয় দাসত্বের এই বন্ধন জ্বালাটা উপলব্ধি ক'র্‌লো মর্ম্মে মর্ম্মে ; অথচ মুক্তির সহজাত পথের সন্ধানও পেল না সহসা খুঁজে। তার দুর্ব্বল হৃদয়—বন্ধনের সেই অহরহ বৃশ্চিক দংশনের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায়, নিজেকে বিক্রয় ক'র্‌তে উদ্যত হ'ল কিন্তু বাধা দিল মাধুরী। একটু জোর দিয়ে ব'লে উঠ্‌লো—না, মাথা তোমায় নত ক'র্‌তে দেবো না কোনদিন! অন্ততঃ এ দেহে যতক্ষণ প্রাণ আছে আমার—

বিনয় কি যেন ব'ল্‌তে চায়, কিন্তু মনের সেই অবগুন্ঠিত ভাষা আত্মপ্রকাশ ক'র্‌তে পারে না। দ্বিধা ও সঙ্কোচে ঠোঁটের পাতা দুটো আপনা থেকেই রুদ্ধ হয়ে আসে।

মাধুরী বলে—সামান্য মুখের ভাষায় অন্তরের ব্যথার কাহিনী নোতুন কি আমায় শোনাবে বলো? আমি যে সব জানি—সব বুঝি! তবুও তোমায় দৃঢ় হ'তে হবে।

বিস্ময়বোধ করে বিনয়। বলে—বোঝ তুমি!

ম্লান মৃদু একটু ফেকাসে হাসি হাস্‌লো মাধুরী। ব'ল্‌লো, যদি নিজেকে নিঃস্ব ক'রে ভালবাস কোনদিন, বুঝ্‌বে সেখানে ভাষার প্রয়োজন থাকে না, মুখের ছায়ায় অন্তরের ভাষাগুলো স্পষ্টতর হ'য়ে উঠে নিজেরই অজ্ঞাতে। তাই—

মাঝপথে থেমে যায় মাধুরী। বিনয় ব্যাকুল কণ্ঠে বলে, থাম্‌লে কেন মাধু? বলো—বলো—

ব্যথা আমি নিজেও কম বোধ করিনে—তবুও ত তোমায় কারও কাছে হেয় হ'তে দিতে পারিনে! একটু সহ্য করো—একটু ধৈর্য্য ধরো—দু'দিন পরে সব স'য়ে যাবে—মাধুরী মনের উচ্ছ্বাস ও বেদনাটাকে সংযত ক'রে নেওয়ার চেষ্টা করে—কিন্তু পারে না। নিজের অজ্ঞাতেই চোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে প'ড়লো কয়েক ফোঁটা অশ্রু!

অভিভূতের মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে মাধুরীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো বিনয়। ব'ল্‌লো—তুমি কাঁদছো মাধু?

আঁচলে চোখের পাতগুলো ভাল ক'রে মুছে নিয়ে মাধুরী ব'ল্‌লো, প্রিয়জনকে ব্যথা কি কেউ দিতে চায়? তবুও ত দিতে হয়! রূঢ় বাস্তবের ধর্ম্মই ত এই!

ছিঃ ছিঃ, এ কি ব'ল্‌ছো মাধু? বাধা দিয়ে ওঠে বিনয়।

নিজের মনে নিজেই ব'লে চলে মাধুরী—একটু কষ্ট স্বীকার ক'রে যদি কখনও নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হও—দেখ্‌বে, সেদিন, প্রশংসায় তোমার পঞ্চমুখ হ'য়ে উঠেছে সকলে, কিন্তু আজ যদি কারও

কাছে এতটুকু সাহায্য প্রার্থনা করো—সবাই উপেক্ষার হাসি হেসে দূরে সরে দাঁড়াবে—এমন কি আমার নিজের বাবাও!

বিনয় বাধা দিল—অহেতুক উত্তেজিত হ'য়ে প'ড়েছো মাধু।

মৃদু হাস্‌লো মাধুরী। ব'ল্‌লো, না—এতটুকুও উত্তেজিত আমি হইনি। কারণ জগতের ধর্ম্মই ত এই! সেইজন্যই ত বাস্তব এত রূঢ়! আজ যদি বাবা তোমায় এতটুকু সাহায্য করেন—পাঁচজনে ব'ল্‌বে, আরে ছ্যা—শ্বশুর যদি সাহায্য না ক'র্‌তো—ওর সাধ্য কি যে, ও নিজের পায়ে দাঁড়ায়! একটু থেমে রীতিমত গম্ভীর হ'য়ে উঠ্‌লো মাধুরী। ব'ল্‌লো, দেখো,—ও কথাটা আমি সহ্য ক'র্‌তে পারবো না ব'লেই—তোমায় একটু সহ্য ক'র্‌তে বলি—দোহাই আর ম্লান মুখে সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়ো না আমার—সহ্য ক'র্‌তে যে পারি না সে দৃশ্য!

কান্নায় প্রায় ফেটে প'ড়্‌লো মাধুরী! অন্য সময় হ'লে হয়ত নিজেও ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌তো বিনয়। কিন্তু ব্যথার সমব্যথী পেয়ে অন্তর তার খুশীতে ভরপূর হ'য়ে উঠ্‌লো। ভাব্‌লো—তবুও ত দুঃখ বোঝার মত সাথী সে পেয়েছে একজন! তার চেয়ে সুখী কি কেউ আছে এ জগতে?…কিন্তু, কে যেন মনের কোণে সহসা আঘাত হেনে ব'স্‌লো, এই সাময়িক সুখে আত্মবিভোর হ'য়ে, নিশ্চেষ্টভাবে ব'সে থাক্‌লে ত তোমার চ'ল্‌বে না! তোমাকে সবল অর্থে—স্বাবলম্বী যে হ'তেই হবে—অন্ততঃ মাধুরীর মুখের দিকে তাকিয়েও!

বিনয়ের ব্যবহারে সকলেই বিস্ময় বোধ ক'র্‌লো। আত্মীয়-স্বজন ব'ল্‌লেন—এমনি ক'রেই মানুষ নিজের পায়ে কুড়ুল মারে অঘোরনাথ! সত্যই বরাত্‌টা তোমার খারাপ, নইলে শিক্ষিত ছেলের এ বুদ্ধিভ্রংশ দেখা দেবে কেন? শ্বশুরের একটিমাত্র মেয়ে, তাঁর মন জুগিয়ে চ'ল্‌তে পার্‌লে, তার অভাব কিসের শুনি? বিশেষ

ক'রে আর একটা বছর পড়্লেই ত ওকালতি পাশটা হ'য়ে যেতো!

অঘোরনাথ নিজেই উত্তরের ভাষা খুঁজে পান না। হতবাক তিনি। কিন্তু আশা ছাড়্তে পারেন না! ভাবেন, এ জগতে স্বার্থই যেখানে সকল কিছুর চেয়ে শ্রেয়ঃ এবং প্রিয়, সেখানে আজ না হোক্—দু'দিন পরেও চৈতন্যোদয় তার হবেই—সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই! বিশেষ ক'রে সে নিজেও যখন শিক্ষিত, নিজের ভালমন্দের বিচার ও বিবেচনার শক্তি রাখে বইকি একটু!

কেদারনাথ কিন্তু ক্ষুব্ধ হ'লেন সকলের চেয়ে বেশী। অঘোরনাথকে ব'ল্লেন—আজকালের ছেলেমেয়েদের মতিগতি বুঝে ওঠা দায় হে অঘোরনাথ! নইলে সুখে থাক্তে ভূতে ধ'র্বে কেন? বেশ ত পড়াশুনা ক'র্ছিল, কোন অভাব ত আমি রাখিনি! তবুও ছেলের তোমার মন ধ'র্লো না—চাক্রী ক'রে নিজের পায়ে—নিজে দাঁড়াবে! একটু ম্লান হাসি হেসে ব'ল্লেন, সেটা অবশ্য খুবই সুখের কথা! আমি চাইও তাই। কিন্তু—

থেমে গেলেন কেদারনাথ। অঘোরনাথ ঔৎসুক্যভরা দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকালেন—পর মুহূর্ত্তে।

কেদারনাথ লালারসে শুষ্ক তালুদেশ সিক্ত ক'রে নিয়ে ব'ল্লেন—শরীরটা যে ভেঙে যাবে—সে কথা কে কাকে বোঝাবে ব'লো? মেয়েটাকে ব'ল্লাম, হ্যাঁরে বিনয় ক'র্ছে কি? তাকে বুঝিয়ে বল্—এ বয়সে শরীরটা ভাঙ্লে বাঁচ্বে ক'টা দিন? মেয়েটা কি উত্তর দিলে শুন্বে অঘোরনাথ? ব'ল্লে—একটু না খাট্লে—শরীর-মন তাজা থাক্বে কেন? তা ছাড়া তোমার জামাই, তোমার স্নেহের বস্তু কিন্তু আর পাঁচজনে ব'ল্বে কি? ভাব্বে কি? তুমি এ কাজে আর ওকে বাধা দিয়ো না বাবা!

একটু থেমে কেদারনাথ ব'ল্লেন—কথাটা শুনে হতবাক হ'লাম হে অঘোরনাথ! আজকালের ছেলেমেয়েরা ভাবে কি বলতো? আমাদের চেয়েও বোঝে ওরা বেশী! হা ভগবান—

কয়েকসেকেণ্ড নীরবে কেটে গেল। কেদারনাথ পুনরায় মুখর হ'য়ে উঠ্লেন—তা ভাল, কি বলো অঘোরনাথ! নিজেই ক্ষেতে নেমে দেখুক্, কত ধানে কত চাল!—আমাদের জীবন, আর ক'টা দিন বইতো না ··

*   *   *

প্রথম সন্তানের জননী হ'ল মাধুরী। বিনয় এখন পাকা চাকুরীজীবি হ'য়ে উঠেছে স্বল্প এই সময়টুকুর ব্যবধানে। এবার হ'ল সে ঘোর সংসারী! ভালমন্দের কথা এখন চিন্তা ক'র্তে হ'বে নিজেকেই।

মনের খেদে, নিজেই গুম্‌রে থাকেন কেদারনাথ। একদিন সহসা আত্মপ্রকাশ ক'রে ব'ল্লেন—বুঝ্লে হে অঘোরনাথ, লোকে ব'লে—পাঠ্যাবস্থায় ছেলেমেয়ের বিয়ে দিলে, লেখাপড়া আর হয় না! দেখ্লাম কথাটা তোমার মিথ্যে নয়! লোক-মুখে শুন্‌ছি, বাবু তোমার আজকাল কলেজ যাওয়াও ছেড়ে দিয়েছে। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে ব'ল্লেন—সবই ভাগ্য অঘোরনাথ! নইলে, কেউ সুযোগ পেল না ব'লে সারা জীবন আক্ষেপ ক'রে বেড়ায়, আর কেউ সে সুযোগ হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও তার সদ্ব্যবহার ক'র্তে পারে না! নইলে, ঘরের খেয়ে-পরে, পড়াশুনাটাও সে ক'র্তে পার্লো না! সবই বরাত ভায়া সবই বরাত! এবার বুঝ্বে নবাগতের আগমন, সুরু হ'ল!—

পরমুহূর্ত্তেই কিন্তু একগাল হাসি হেসে ব'ল্লেন, আর যাই বলো অঘোরনাথ, নাতিটি কিন্তু দেখ্তে আমার বেশ ফুট্‌ফুটে হ'য়েছে! বাপের মত নাক, চোখ, মার মত গোলগাল, ফুট্‌ফুটে ধপ্‌ধপে—যেন

ছোট একটি মোমের পুতুল! তা তুমি একবার দেখে এলে না কেন? আমার চেয়েও ত নিকটতম তুমি! চলো—নাতির মুখটা দেখে আসি দু'জনে। আর কিছু লাভ হোক্ বা না হোক্—স্বর্গে বাতি দেবে হে—বাতি দেবে!

নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠ্‌লেন কেদারনাথ। ব'ল্‌লেন—কেন এত ইতস্তত: ক'র্‌ছো বলতো?

ম্লান একটু হাস্‌লেন অঘোরনাথ। ব'ল্‌লেন, তুমি ত সবই জানো কেদারনাথ! নাতি আমার বংশের সন্তান—কত প্রিয়জন বলতো! তার মুখ কি শুধু দেখা যায়? আর লোকেই বা ব'ল্‌বে কি?

উত্তেজিত হ'য়ে ওঠেন কেদারনাথ, লোকে ব'ল্‌বে কি!—তোমার মুখেও সেই এক কথা! মেয়েটা এই কথা ভেবে ভেবে ত নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই ডেকে আন্‌লো—আবার তুমিও ব'ল্‌বে সেই এক কথা! লোকে যার যা খুশী বলুক্, তাতে আমাদের কি যায় আসে? চলো—চলো—

কিন্তু আমরা যে সামাজিক মানুষ ভাই—

বাধা দিয়ে উঠ্‌লেন কেদারনাথ—আরে রেখে দাও—যত সব আবর্জ্জনা! দিলে, লোকে ব'ল্‌বে—আহা বেশ দিয়েছে—বুড়ো বেশ দিয়েছে! না দিলে ব'ল্‌বে—কি কিপ্‌টে বলতো? নাতির মুখ দেখে গেল, হাতে এতটুকু জলও গোল্‌লো না! ব্যাস্—সেখানেই সব শেষ।—কিন্তু তুমিই বলতো ভায়া জীবনে কোন্ বস্তুটার মূল্য বেশী? সামাজিকতার না আন্তরিকতার? হয়ত ব'ল্‌বে সামাজিকতার। কারণ, লোকে সেটাই দেখে—কিন্তু আন্তরিকতাটা একেবারে অন্তরের। তার সন্ধান কেউ রাখে না! লোকে যে যাই বলুক্ না কেন—তুমি ত অস্বীকার ক'র্‌তে পারো না—জগতে এ বস্তুর মূল্যই সকলের চেয়ে বেশী। আর কিছু না হোক্ আশীর্ব্বাদ ত ক'র্‌তে পার্‌বে! চলো—

চলো—ব'লেই অঘোরনাথের হাতখানা চেপে ধ'র্লেন কেদারনাথ। ফিস্ ফিস্ ক'রে ব'ল্লেন—লজ্জা বাহিরের বস্তু—অন্দরমহলে ওটা অচল হে, অচল!

সে রসিকতায় হেসে উঠ্লেন উভয়েই।....

* * *

অনেক বিচার বিবেচনার পর নবাগতের নাম রাখা হ'ল "অজয়"। কেদারনাথ ও অঘোরনাথ উভয়েই হ'লেন একমত। সত্যই চিত্তজয়ী সে! সে-ই জয় ক'রেছে সকলকে—জয় তাকে ক'র্তে হয়নি—সুতরাং অজয় নামের উপযুক্ত পাত্রই বটে সে!

খুশী হ'লেন সবাই। বিনয়ের চাকুরী জীবনেও সামান্য সফলতা দেখা দিয়েছে। নিজেকে চালিয়ে নেওয়ার মত ক্ষমতা অর্জ্জন ক'র্লো সে এতদিন পরে। গর্ব্বে মাধুরীর বুকখানা দুলে উঠ্লো! কায়মনবাক্যে এইটুকুই ত সে কামনা ক'র্তো দিনের পর দিন!

জামাতা, সে আদরের পাত্র! কিন্তু স্থায়ীভাবে শ্বশুর গৃহে বসবাস ক'র্লে তার সেই বিশেষত্বটুকু হয় ক্ষুণ্ণ! আচার-ব্যবহারে সে ঘরের লোকে হয় পরিণত।

আত্মীয়-স্বজন ভাব্তে সুরু করে, সে ঘরের ছেলে, ব্যবহারও করে ঠিক সেই মত। কিন্তু মেয়ে আশা করে তার চেয়েও একটু বেশী। সত্যই সংসারে সে ত পাঁচজনের মত সাধারণ শ্রেণীভুক্ত নয়!

মাধুরী বহুদিন থেকেই এ অভাবটুকু অনুভব ক'র্ছিল মনেপ্রাণে। কিন্তু বুকের ভাষা তার রুদ্ধ ছিল—কতকটা লৌকিকতায়, কতকটা বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে বলাও চলে। মা-বাবা জীবনের একান্ত প্রিয়বস্তু। তাঁদের মনে আঘাত দেওয়া সহজ বস্তু নয় ব'লেই—দীর্ঘদিন

একটা উপলক্ষ্যের প্রতীক্ষায় বসেছিল সে! একটা কিছু ত চাই, নইলে মনের কথা প্রকাশ করা চলে কি কোনদিন!

সেই সুযোগ মিলে গেল এতদিন পরে। অঘোরনাথের ইচ্ছা, পুত্রবধূ ও পৌত্রকে কিছুদিন নিয়ে যান নিজের বাড়ীতে। একটু আমোদ-আহ্লাদে মনের সাধটা নেবেন তিনি মিটিয়ে। বলা ত যায় না জীবনের মেয়াদ কতটুকু!

কেদারনাথ কিন্তু রাজি হ'লেন না। ব'ল্‌লেন—তোমার অন্তরের কথা আমি বুঝি অঘোরনাথ, কিন্তু হৃদয় আমার শূন্য ক'রে, তোমার ধন ত তোমায় ফিরিয়ে দিতে পার্‌বো না!

অঘোরনাথ ব'ল্‌লেন—মাত্র এক সপ্তাহের জন্যে না হয় পাঠিয়ে দাও কেদারনাথ! মেয়েরা যে জীবনটাকে অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছে! বোঝ ত তাদেরও একটু আহ্লাদ-আমোদের সখ হয়—

কিন্তু তোমার ও-বাড়ীতে গেলে নাতির আমার যে অসুখ ক'র্‌বে অঘোরনাথ! তার চেয়ে বলি—আরও কিছুদিন থাক্! একটু বড় হোক্, তারপর নিয়ে যেয়ো। তাছাড়া তোমার রক্তের জিনিষ, তোমার কাছেই ফিরে যাবে—আমি ত দু'দিনের সখ মিটিয়ে নিচ্ছি মাত্র!

অঘোরনাথ উত্তর দিলেন না—ফিরে গেলেন নীরবে। নিজের মনে নিজেই ভাব্‌লেন সারাটা পথ—সত্যই ত! ভাঙা কুটীরে গেলে তাঁর সোনার দাদুর যদি একটা কিছু অমঙ্গল ঘটে যায়! তখন? না—না—কেদারনাথ ঠিকই ব'লেছে! থাক্ না—না হয় আরও দু'চার মাস—কিন্তু অবুঝ এই মেয়েরদলকে তিনি বোঝাবেন কেমন ক'রে! তাঁরা যে ব'লেন—এ ঘরে বিনয় মানুষ হ'ল, আর তোমার নাতি মানুষ হবে না? আরে, হবে না কেন? সবই ত হয়, কিন্তু ছোট-বড়োর পার্থক্য যে র'য়ে গেছে! বিনয়ের বাপ ছিল গরীব, মাও ছিল দরিদ্র-

ঘরের মেয়ে! তাই সয়েছিল সব, কিন্তু নাতির আমার মা যে ধনীর ঘরের মেয়ে, তার ছেলের এই স্যাঁৎস্তেতে আবগাওয়া সহ্য হবে কেন? তার জন্য সময় চাই, নিশ্চয় সময়ের প্রয়োজন বইকি!...

* * *

মনোরমা কথাগুলো শুনে মনঃক্ষুণ্ণ হ'লেন একটু। কিন্তু এই ভেবে মনকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা ক'রলেন—বেশ ত, এতদিন যখন গেল তখন আরও না হয় মাস-দুই যাক্ না এমনি ক'রে কেটে! শীতটা যাবে চ'লে, ভয়ের কারণও থাকবে না কোনকিছু। ব'ল্লেন, —বিচার ক'রে দেখ্‌তে গেলে, একদিকে বেয়াইম'শায় ঠিকই ব'লেছেন। এই স্যাঁৎস্যেতে মাটির ঘরে ঠাণ্ডা লেগে যদি হিতে কিছু বিপরীত হ'য়ে যায়! না—না—সেই ভাল। তুমি বরং আমায় একদিন সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেয়ো। আমার বিনয়ের ছেলে, তাকে না দেখে কি স্থির থাক্‌তে পারি একটি মুহূর্ত্ত?

অঘোরনাথ ব'লেন—তা কি ক'রে সম্ভব বড়-বৌ? তুমি যে ছেলের মা!

মনোরমা একগাল হাসি হেসে উত্তর দিলেন—হ'লই বা! ছেলেও আমার—বৌও আমার। নাতিও আমার। সবাই তারা আপন আপন জন। তাদের কাছে গেলে বুঝি মান খোয়া যায়!

লোকে শুন্‌লে কি ভাব্‌বে বলতো?

যার যা খুশী! তা'তে আমার কি আসে যায়?

অঘোরনাথ গম্ভীর হ'য়ে ওঠেন। বল্লেন—তোমাদের আর কি? দিব্যি আরামে ঘরের মধ্যে থাক্‌বে, আর ওপাশে কথা শুন্‌তে শুন্‌তে কান আমার ঝালাপালা হ'য়ে যাবে—

মনোরমা দমলেন না এতটুকু। বরং একগাল তৃপ্তিভরা হাসি হেসে ব'লে উঠলেন—না হয় শুনলে একটুকু। আমার ত নাতির মুখ দেখা হবে।

বেশ—যা খুশী করো। বিরক্তিভরে উঠে গেলেন অঘোরনাথ। নিজের মনে নিজেই গজ গজ ক'রতে লাগলেন—মেয়ে-জাতটাই এমনি! একবার গোঁ ধ'র্‌লে, তা রোধ করে কার বাপের সাধ্য!

কথাটা বিনয়ের কানে গেল। মাধুরীকে ব'ল্‌লো—মার ইচ্ছা খোকাকে একবার তিনি দেখেন! কিন্তু—

মাধুরী মৃদু হাস্‌লো। ব'ল্‌লো—বেশ ত! বাবাকে ব'ল্‌বো'খন!

শ্বশুরম'শায় যে রাজী নন! মা নিজেই আস্‌তে চান। কাজটা কি ভাল দেখায়?

দরকার কি? চলো না—একদিনের জন্যে না হয় ঘুরে আসি দু'জনে। খুশীও ত হবেন সবাই!

কিন্তু—

পুনরায় হেসে ওঠে মাধুরী। বলে—বাবার মত আমি করিয়ে নেবো, তুমি বরং তৈরী হ'য়ে থেকো—

কেদারনাথ কিন্তু রাজী হ'লেন না। ব'ল্‌লেন—ছোট ছেলে, কোথায় ঠাণ্ডা লাগবে কে জানে? দরকার কি মা? দুটো মাস পরে পাঠাবো, অঘোরনাথকে ত কথা দিয়েছি! আর তাঁদেরই বা এত ব্যস্ত হওয়ার প্রয়োজন কি? এখানে ত আর দাদুর আমার অযত্ন হ'চ্ছে না!

মাধুরী উত্তরে মৃদু হাস্‌লো। ব'ল্‌লো—ও প্রশ্ন ত তাঁরা তুলেননি বাবা! তাঁরা খোকাকে একটিবার দেখ্‌তে চান মাত্র—

মাঝপথে ঝাঁপিয়ে প'ড়্লেন কেদারনাথ—আমি কি তাতে বাধা দিচ্ছি?

মিথ্যে উত্তেজিত হ'চ্ছো বাবা! তাঁদের তরফ থেকে কোন কথাই ওঠেনি, বরং তুমিই, সেদিন ব'ল্ছিলে—এখন কি করা যায় মা! তাদের জিনিষ, বাধাও ত বারবার দেওয়া চলে না! তাই ব'ল্ছিলাম—যদি না যাই, তাঁরা দুঃখ আক্ষেপ ত ক'র্তে পারেন! তাতে খোকার যদি কিছু অমঙ্গল হয়—

অমঙ্গল? কথাটা টেনে কি যেন গভীরভাবে চিন্তা ক'রে দেখ্লেন কেদারনাথ। ব'ল্লেন—তা বটে! কিন্তু কখন যাবে আবার কখনই বা আস্বে ফিরে? তাছাড়া তোমার শরীরটাও ত এখন তেমন শক্ত-সমর্থ্য হ'য়ে ওঠেনি! একটু থেমে ব'ল্লেন—ভাব্ছো উঠে দাঁড়াতে যখন পেরেছি, তখন আর ভয় কি? কিন্তু আমি যে বাপ্! মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝ্তে পারি—এখনও সম্পূর্ণ সবল হ'য়ে ওঠোনি। একটু থেমে নিজের মনে কি যেন ভেবে নিলেন একটু। ব'ল্লেন,—তবে যখন তোমার ইচ্ছা হ'য়েছে তখন যাও, কিন্তু সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ফিরে আস্বে, বুঝ্লে! নইলে, আমার চিন্তার শেষ থাকবে না—

সদ্য এসেই ফিরে যাওয়াটাকে কেউ শ্রদ্ধার চোখে গ্রহণ ক'র্লো না। সত্যই এটা যেন দাম্ভিকতার পরিচয়! অথচ মুখফুটে একটি কথাও ব'ল্লো না কেউ। মাধুরীর মনটা কিন্তু সুস্থির হ'তে পার্লো না! গম্ভীর আবহাওয়া ও তার পরিবেশ, স্পষ্টই জানিয়ে দিল —কাজটা সুশোভন হ'ল না মাধুরী—সুশোভন হ'ল না! কিন্তু উপায়ই বা কি? ফিরে তাকে যেতেই হবে। একপাশে স্নেহ-কাতর পিতা, অন্যপাশে কঠোর কর্ত্তব্য। এ জীবনে কোন্ বস্তুটা বড়? একের মূল্য দিলে অপরটি হ'য় ক্ষুণ্ণ, অথচ সমান তালে পা ফেলে

চলার সেই স্বাধীন অধিকারটুকুও যে তার নেই—আজও যে সে তেমনি পরমুখাপেক্ষী !…

*   *   *

মনোরমা খুশী হ'য়েছিলেন। সারাক্ষণ নাতিকে কোলে ক'রে এঘর ওঘর ক'রে বেড়ালেন। তবুও যেন মনটা তাঁর তৃপ্তি পেল না ! ইচ্ছা জাগে, চিরদিন—চিরক্ষণ এমনি নিবিড়তর বাঁধনে, কোলে ধরে রাখেন তাকে ! কিন্তু হায়—দিনের আলোকটুকুও নিঃশেষ হ'য়ে এলো ! অন্তর তাঁর নিবিড়তর কামনার আবর্ত্তে যত বেদনাই উপলব্ধি করুক্ না কেন, হাসিমুখে বিদায় তাদের দিতেই হ'বে ! সময় যে ব'য়ে যায়—

অঘোরনাথ ব্যস্ত হ'য়ে ওঠেন—সন্ধ্যা যে উত্তীর্ণ হ'য়ে গেল ! তোমরা এখনও করো কি ? ছোট ছেলে—ঠাণ্ডা লেগে যাবে যে ! একটু হিসাব ক'রে কেন যে সব চ'ল্তে পারো না—কিছুতেই স্থির ক'রে উঠ্তে পারিনে ! ওপাশে হয়ত কেদারনাথ এখুনি তাঁর পাইক্ বরকন্দাজ পাঠিয়ে ব'স্বেন !

হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ'য়ে এলো। গম্ভীর স্বরে উত্তর দেন মনোরমা। বলেন, ঘরে বৌ এলো—মুখে তার কিছু না দিয়ে কি পাঠানো যায় ? তাছাড়া এইটুকু ত যাবে—আর কতক্ষণই বা লাগ্‌বে !

ছোট ছেলে যে ! তেমনি আবেগমিশ্রিত কণ্ঠে জবাব দিলেন অঘোরনাথ।

মনোরমা আদরে নাতির কপালে চুমু খেয়ে ব'ল্লেন—হ'লই বা ছোট—তবুও ত আপন ! তাকে কি এত সহজে দূরে পাঠানো যায় ? কি বলিস্‌রে দাদু ? কচি চিবুকে পুনরায় মৃদু দোলা দিয়ে ব'লে উঠ্লেন—দেখ্‌ছো এরই মধ্যে দাদু আমার আপন-পর—সব চিনে নিয়েছে !

এমন দুষ্টু, কিছুতেই মার কোলে ফিরে যাবে না! চুলের মুঠি ধ'রে টেনে বার বার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, কেন যাবো? তুমিও ত আমার তেমনি আপনজন! আদরে তার গণ্ডে পুনরায় চুমু খেয়ে ব'ল্লেন —সত্যি, বেশ ফুট্‌ফুটে হ'য়েছে। যেন সেই ছোট বিনয়েরই প্রতিবিম্ব। যেমন টুক্‌টুকে, তেমনি ফুট্‌ফুটে! এমন ছেলে নইলে কি ঘর মানায়?

অসহিষ্ণু হ'য়ে ওঠেন অঘোরনাথ। বলেন—রাত হ'য়ে গেল যে!

তা হোক্ একটু! হাসিমুখে উত্তর দিয়ে অন্দরমহলে ফিরে যান মনোরমা।···

যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হ'ল মাধুরী। পাশে দাঁড়িয়ে বিনয়। কোলে তার শিশু অজয়। সামনে হ্যারিকেনের বাতিটা ধ'রে দাঁড়িয়ে আছেন মনোরমা। মনটা তাঁর ভার, চোখের পাতাগুলো ঝাপ্‌সা হ'য়ে উঠেছে।··হ্যাঁ, প্রিয়জনকে একটু দূরে পাঠাতে হ'লে মনটা এমনি ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে বটে!

মাধুরী মনোরমার পায়ের ধূলো মাথায় তুলে নিয়ে ব'ল্লো—তাহ'লে আজ আসি মা!

মনোরমা তার চিবুক পরশ ক'রে সস্নেহ চুম্বন ক'র্লেন। কণ্ঠ তাঁর জড়তায় পূর্ণ। তবুও ব'ল্‌তে চেষ্টা ক'র্লেন—এসো মা!

কিন্তু সেটা এতই অস্পষ্ট যে, মনে হ'ল চাপা-কান্নায়-ভেঙে-পড়া টুক্‌রো রিক্ততার প্রতিবিম্বমাত্র!

মুখ তুলে তাকালো মাধুরী। হ্যারিকেনের অস্পষ্ট আলোকে কোন কিছু ভাল ক'রে চোখে না প'ড়্‌লেও অনুমান ক'রে নিল, তাঁর অন্তরের বেদনা। আর কিছু না হোক্ আজ ত সে মা! সুগভীর ব্যথার পরশ পেয়েছে ব'লেই, পরিপূর্ণরূপে সেই ব্যথা উপলব্ধির অবসর পেয়েছে সে জীবনে! তাই মনটাও তার গেল দমে। বুঝ্‌লো—মনোরমার চোখের

পাতাগুলো কেন সিক্ত হ'য়ে উঠেছে অকারণে। কিন্তু তবুও ত যেতে হবে তাকে!

হ'লও তাই! ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই বিনয় ব'লে উঠ্‌লো—দাঁড়িয়ে কেন? গাড়ীতে ওঠো এবার!

হ্যাঁ, উঠি! মাধুরী পুনরায় মনোরমার ম্লান গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে গাড়ীতে উঠে বস্‌লো ধীর পদবিক্ষেপে।

আর মনোরমা হ্যারিকেনের বাতিটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে নিস্পন্দের মত দাঁড়িয়ে রইলেন সেখানে। যতদূর দেখা যায় তৃষাতুর নয়নে রইলেন সেই পথের দিকে তাকিয়ে।

পাশে দাঁড়িয়েছিলেন অঘোরনাথ। ব'লে উঠ্‌লেন—এবার ফিরে চলো, বড়-বৌ।

হ্যাঁ, যাই। অকারণে বুক ভেদ ক'রে নেমে এলো চাপা একটা দীর্ঘশ্বাস। নিজের মনে নিজেই ভাবেন মনোরমা, ফিরে—হ্যাঁ·· তাঁকেও ফিরে যেতে হ'বে। ডাক্‌ছে পিছনের মায়া—চলো—চলো—শুধু চলো—

এটা অনাদি অনন্তের ডাক—এর শেষ নেই, এর অন্ত নেই! এটা চিরন্তনীর মতই চিরশাশ্বত—চিরপ্রবাহমানা। এরই আকর্ষণ ও বিকর্ষণের আবর্ত্তে জীবধর্ম্ম হ'য়েছে মূর্ত্ত। তাই, একে উপেক্ষার শক্তি নেই মানুষের—

ফিরে এলেন মনোরমা। কিন্তু তিনি তাঁর সেই সহজাত চেতনা ফেলেছেন হারিয়ে। কোথায় যেন ভেঙ্গে গেছে সেই সুর—হারিয়ে গেছে সেই খেয়াঘাটের খেয়া। অন্তর তাঁর তাই কাঁদে বার বার!

মনটা ফিরে যায় রিক্ত অতীতের শীর্ণ খেয়াপথে। চোখের পাতায় ভেসে ওঠে পরিত্যক্ত জীবনের জীর্ণ স্মৃতিছায়া। একদিন—হ্যাঁ, আজ জীবনস্রোতে সেটা একদিনই বটে! ভেসে এসেছিল—আশা-

ভরপূর ফুলমধু-ভরা জীবন্ত বসন্তের ডাক। বুকে জেগেছিল তৃষা—

বেশী কিছু নয়—সামান্য এতটুকু পরশ। তারই নেশায় হৃদয় হ'য়েছিল উন্মুখ।

এলো সেইদিন। পরশে তার পূর্ণ হ'ল না সে তৃষার নেশা—জাগলো নিবিড়তর ক'রে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা—

সেও এলো—তবুও কাঁদে সেই বুকের তৃষা। নিজেকে রিক্ত ক'রে বিলিয়ে দিতে না পার্‌লে তার তৃপ্তি নেই, মুক্তি নেই!

সেই মুক্তির শুভলগ্ন এলো ব'য়ে—হৃদয় পেল তৃপ্তি! তবুও মেটে না—সে তৃষার নেশা। বারে বারে তাই নোতুনের আশায় কেঁদে মরে সে।

এমনি ক'রে একে একে এলো—অনেকেই! হৃদয়ের সেই রিক্ততার বাসনা তবুও পেলনা সান্ত্বনা। সে চায়, আরও চায়—কিন্তু ফাগুন যায় ব'য়ে—

সে উন্মুখ হ'য়ে বসে থাকে, কবে তার শাখা-প্রশাখায় জাগ্‌বে নোতুন ফাগুন—বইবে নবীন বসন্তের হাওয়া! তার ফসলের সুখ-পরশ ও সৌরভে ভরিয়ে নেবে রিক্ত সেই হৃদয়-তৃষা। তারই…হ্যাঁ—তারই আশাপথ চেয়ে বসে থাকে নারী।

সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর জীবনে এসেছে সেই শুভ লগ্ন। তাদের কেন্দ্র ক'রেই তিনি আজ সুখী—ঘোর সংসারী। জীবনের ফাগুন তাঁর ব'য়ে গেছে সত্য, কিন্তু তার সেই ফসল ব'য়েই হৃদয় পায় তৃপ্তি। তাদের নিবিড় সেই সুখপরশে জীবন-সাধনা পায়—পূর্ণতারূপী অমৃতের সন্ধান। হৃদয়ে তাই ত জাগে এত ব্যাকুলতা!

নবপ্রস্ফুটিত মাধুরীর জীবন-প্রাঙ্গনে বসন্তের জয়যাত্রা সবে হ'য়েছে সুরু। তার ফস্‌লে বুকের তৃষা বিদূরণের অবসরও পাবে সে প্রচুর! কিন্তু মনোরমার বুকের সেই সুপ্ত তৃষা, নবাগতের কোমল পরশে সহসা

নোতুন ক'রে যে দাবানল প্রজ্বলিত ক'রে গেল, তার নিবৃত্তির পাথেয় আজ পাবেন তিনি কোথায়? তাই হৃদয় হল উন্মনা। নিজেকে তেমনি নিঃস্ব ক'রে বিলিয়ে দেওয়ার নেশায়—মুখরিত হল দেহের প্রতিটি শিরা-উপশিরা। কিন্তু···ভাবেন মনোরমা—সেই স্নেহের পুতুলটিকে ত নিবিড়-ভাবে ধরে রাখা গেল না! ক্ষণিক মোহজাল সৃষ্টি ক'রে চলে গেল—হাঁ, চলে গেল সে···

কোন কিছুই আজ আর ভাল লাগে না মনোরমার। একাকী নিভৃতে ব'সে ভাবেন নিজের মনে, হায়রে—জীবন-তৃষা! নিত্য নোতুন ক'রে, নোতুন রূপে পাওয়ার এই যে নেশা,—এটাই কি তবে নারী-জীবনের জীবন-মরণ সমস্যা?—শুধু কি এই আশার তৃষায় তার জন্ম? তার শৈশব, কৈশোর, যৌবন—তার প্রৌঢ়ত্ব ও বার্দ্ধক্য—জীবনের সকল প্রহরই কি তবে ঘনীভূত সেই ছায়ারই প্রতিবিম্ব মাত্র! হয়ত তারই প্রাবল্যে বুকের তাজা রক্ত রূপান্বিত হ'ল সুধায়। না, না—হয়ত কেন? সেই ত সত্য! সেই ত বাস্তব! ক্ষয় তার চাই, নইলে বুকের জ্বালা কি নিবারিত হয় সহসা? তাই ত নিভৃতে, কোলের কাছে যখনই সে পায় সেই আশার ফসল—সেই মুহূর্ত্তেই নিজেকে যায় সে ভুলে। বুকের সেই শুষ্ক পিযুষধারা পুনর্জ্জীবিত হ'য়ে—নিজস্ব গতিবেগে নিজেই ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে। অন্য কিছু নয়—শুধু মুখবিবরের উষ্ণ মৃদু পরশ—আর তার নিবিড় আকর্ষণের মধুর মৃদু মূর্চ্ছনা—দেহ-মনকে মাতিয়ে তোলে দুর্ণিবার পুলক শিহরণে।·· হ্যাঁ—হ্যাঁ, হৃদয় তাই কাঁদে। জীবন-পিপাসা, নিজেকে রিক্ত করার বাসনায়, আকুল-হৃদয়ে অস্ফুটকণ্ঠে নিবিড়তর ক'রে ডাকে—ওরে আয়, ফিরে আয়—নিত্য শিশু-রূপে অতৃপ্ত এই হৃদয় মাঝারে···

* * *

এগিয়ে চ'ল্লে গাড়ী! মাধুরীর চোখের পাতায় ভাস্তে লাগ্লো মনোরমার ম্লান-গম্ভীর মুখের ছায়াখানা। দু'টো দিন থাকলে—হয়ত কত খুশীই না হ'তেন তিনি—কিন্তু সে স্বাধীনতাটুকুও ত তার নেই! নিজের খুশীমত চলার অধিকার আজও ত সে অর্জ্জন ক'র্তে পারেনি!

যদিও এ বস্তুটা স্নেহের পীড়ন ও বাঁধন—সেখানে কোন বাধ্যবাধকতার ঠাঁই নেই, তবুও সে বোঝার ভার কারও চেয়ে কম কিছু নয়! জীবনকে ক্ষুদ্র গণ্ডীর আবেষ্টনে পিষ্ট করে সে প্রতিটি মুহূর্ত্তে!

না! তাকে স্বকীয় গণ্ডীর মাঝে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত ক'র্তেই হবে! নইলে তৃপ্তি নেই—শান্তি নেই এ জীবনে।...

.

সহসা মৌনতা ভেঙে মাধুরী মুখর হ'য়ে উঠ্লো—তুমি একটা বাসা দেখো না!

বিস্মিত হ'ল বিনয়। মাধুরী বলে কি? যে আজন্ম বিলাস ও ব্যসনের মধ্যে লালিত-পালিত, সে-ই স্বেচ্ছায় দুঃখের বোঝা বইতে চায়! এও কি সম্ভব, না দু'দিনের সখ ওরফে মনের বিলাস? লঘু পরিহাস করে বিনয়—সত্যই কি তুমি সে দুঃখের বোঝা বইতে পার্বে কোনদিন?

কেন পার্বো না? সবাই যা পারে—আমিই বা তা পার্বো না কেন? একটু ঝাঁঝলো স্বরে উত্তর দিল মাধুরী।

পারো—ভালই! মৃদু হাসে বিনয়। ব'ল্লো—কথা আর কাজ কিন্তু দু'টো এক বস্তু নয়!

জানি গো জানি! গম্ভীর স্বরে উত্তর দিল মাধুরী। জানি ব'লেই ত ব'ল্ছি! যেখানে তৃপ্তি নেই—শান্তি নেই—সেখানে মানুষ কি বসবাস ক'র্তে পারে কোনকালে?

বলে কি? বিস্ময়ে ফেটে প'ড়্‌লো বিনয়। এত সুখ ও ঐশ্বর্য্যের মধ্যেও যদি সে তৃপ্তির সন্ধান না পায়—সেই কণ্টকাকীর্ণ দুঃখের আসরে তৃপ্তির পরশ সে কি পাবে কোনদিন?

অস্ফুট কণ্ঠে তবুও বিনয় বলে, বাবা তো তোমার কোন অভাবই রাখেননি মাধু! সাধারণতঃ মানুষ যা চায়—সেই সুখ-ঐশ্বর্য্য, বিলাস-ব্যসন ও ভূষণ—কোন কিছুর ক্রটিই ত তিনি রাখেননি!

সে তুমি বুঝ্‌বে না! ঝাঁপিয়ে প'ড়্‌লো মাধুরী। ব'ল্‌লো—শুধু সেটুকুতে জীবন ভরে না— আশার তৃষা মেটে না—

তা হ'লে? মাঝপথে প্রশ্ন তোলে বিনয়।

মাধুরী হাসে! বলে, স্বকীয় জীবনের কল্পনার আসর সে সাজাতে চায়! তাই সেখানেই তার তৃপ্তি—সেটুকুই তার সুখ। যেখানে সে স্বাধীনতাটুকু আছে, সেখানে সে হাসি মুখে শত দুঃখের বোঝাও বইতে পারে—কিন্তু যেখানে নেই সেই সহজ বিচরণের সহজাত অবকাশ, সেখানের শত সুখ ও ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্যও রূপায়িত হয় বোঝায়। প্রাণটা হাঁপিয়ে ওঠে অকারণে। একটু থেমে ব'ল্‌লো, সে পরিসর যত ক্ষুদ্রই হোক্, যত সীমাবদ্ধই থাক্ না কেন মূল্য তার নারী-জীবনে অনেক গুণে বেশী!

বিনয় সহসা উত্তরের ভাষা খুঁজে পায় না। শুধু বসে বসে ভাবে, বাস্তব ও স্বপ্ন—দু'টো এক বস্তু নয়! মূল্যের তারতম্য শুধু নয়—গতিধারাও যে ভিন্ন-পথগামী!

মাধুরী স্বামীর চিবুকখানা তুলে জিজ্ঞাসা করে, বসে বসে কি ভাব্‌ছো গো? কথাগুলো বুঝি তোমার বিশ্বাস হ'ল না!

সপ্রতিভ হ'য়ে উঠ্‌লো বিনয়! ব'ল্‌লে, না—ঠিক তা নয়!

মাধুরী জিজ্ঞাসা করে—তবে? চুপ ক'রে রইলে যে!

এমনি!

অবিশ্বাসের হাসি হাস্‌লো মাধুরী! ব'ল্‌লো—মিছে ভুলোতে চেষ্টা করো না ব'ল্‌ছি। পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা হয়ত জীবনে আমাদের কয়েকটা মাসের, কিন্তু তারই মধ্যে তোমাকে চিনে নিয়েছি আমি! একটু টেনে হাস্‌লো মাধুরী। ব'ল্‌লো—মানে, তোমাদের পুরুষ-জাতটা এ জগতের প্রতিটি বস্তু গভীর ক'রে দেখে আর ভাবে-হয়ত এরই জন্য জন্ম তোমাদের। এতেই তোমরা পাও তৃপ্তি। কিন্তু আমাদের নারীজাতটা এই জাগতিক সমস্ত গুরুত্বকে লঘু পরিহাসে উড়িয়ে দিয়ে, সৃষ্টির প্রেরণায় হয় উন্মুখ—হয় চঞ্চল!

সেখানেই সে খুঁজে পায় জীবনের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য! পুনরায় একটু টেনে মৃদু হাস্‌লো মাধুরী। ব'ল্‌লো—পার্থক্য এখানেই। তোমরা সবকিছু পেয়েও পেলে না গভীরতরভাবে, একান্ত আপনার করে! আর আমরা সেই ছোট গণ্ডীর মাঝে নিশ্চেষ্ট মনে পাতি ছোট একটি সংসার। পাতি নিজ বৈশিষ্ট্যের আসন। কোলে তুলে নিই তুলতুলে এক একটি জীবন্ত পুতুল। বুঝ্‌লে—সেটুকুকে আঁকড়েই আমরা কাটিয়ে দিই—সারাটা জীবন। ওটা আমাদের আজন্মের সংস্কার—ওটুকুর মধ্যে অবাধ স্বাধীনতা না পেলে—জীবন আমাদের শুষ্ক মরুতে পরিণত হ'য়ে যায়!—তাই ওটুকু আমরা চাই! একটু থেমে ধীরকণ্ঠে ব'ল্‌লো—দেবে না এ ভিক্ষাটুকু—দেবে না আমায়?

মাধুরীর শেষের কয়টি কথা বিনয়কে বিচলিত ক'রে তুল্‌লো! মনে হ'লো—ওই যে কয়টি কথা—এ শুধু একা মাধুরীর অন্তরের কাতর চিরন্তনী ক্রন্দনধ্বনি নয়, অনাদি অনন্ত প্রকৃতির অন্তরের প্রতিধ্বনি মাত্র!

কয়েক সেকেণ্ড নিঃশব্দে মাধুরীর মুখের দিকে তাকিয়ে ব'লে উঠ্‌লো বিনয়—তাই হবে মাধু! তোমার নিজস্ব মর্য্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠার অবকাশ দেবো—কথা আমি দিলাম!

সত্যি! গভীর আবেগে স্বামীর হাতখানা চেপে ধ'র্‌লো মাধুরী।

বিনয় তার হাতে মৃদু একটু চাপ দিয়ে ব'লে উঠ্‌লো—সন্ধ্যা বহু পূর্ব্বেই উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে মাধু, বাবা হয়ত ভাব্‌ছেন কিংবা লোক পাঠিয়ে দিলেন কিনা কে জানে!

* * * *

বেদনাকে যারা সুখানুভূতি ভাবে, দুঃখকে যারা জীবনের গভীর সুখ-পরশ ব'লে মেনে নেয় সর্ব্বান্তঃকরণে—তাদের জন্য পৃথক আসন পাত্‌তেই হয়! কারণ, জীবনটা যে তাদের বৈশিষ্ট্যের সাধনায় মগ্ন! তাদের কল্পনা, তাদের সাধনা—নিজস্ব গতিপথ ধ'রে এগিয়ে চল্‌বেই—এটাই ত প্রকৃতির রীতি!

মাধুরী আজন্ম সুখের মধ্যে লালিত-পালিত হ'লেও, তার প্রকৃতির এই সহজাত ধারাকে ত সে উপেক্ষায় উপহাস্যের ঝুড়িতে নিক্ষেপ ক'রে নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বসে থাক্‌তে পারে না!—তারই আকর্ষণে তাকে বেছে নিতে হ'ল পথ—মুক্ত ক'র্‌তে হ'ল তার হৃদয়-দুয়ার।

হয়ত সে পথে দুঃসহ বেদনাই সে পাবে—তবুও ত তার জীবন-সাধনা আত্মপ্রতিষ্ঠার পাবে অবসর! সৃষ্টির বেদনা, অনুভব ক'র্‌বে গভীর তৃপ্তি—তার সার্থকতায় পাবে জীবনের গভীর সুখপরশ। এটাই ত তৃষিত হৃদয়ের চিরন্তনী ক্ষুধা! এরই নিবৃত্তির পথ-সন্ধানে মানুষ ছুটে অহরহ!

বিনয় পাত্‌লো নোতুন বাসা! যাকে কেন্দ্র ক'রে জীবন পেল নিজেকে প্রতিষ্ঠার অবসর, তার তৃপ্তিই ত জীবনের তৃপ্তি, তার সুখেই ত সে অনুভব ক'রে জীবনের গভীরতর সুখ!

কিন্তু অভিমানের ক্ষুব্ধ ব্যথা ও বেদনায় মুষ্‌ড়ে প'ড়্‌লেন কেদারনাথ! ব'ল্‌লেন—বুঝ্‌লে হে অঘোরনাথ,—ছেলেই বল, আর মেয়েই বল, এ দুনিয়ায় কেউ আপন নয়!—নইলে এ বুড়ো বাপ্‌কে এতবড় আঘাত দিয়ে নিষ্ঠুর পাষাণের মত নির্ম্মমভাবে দূরে সরে যেতে পার্‌তো কি কোনদিন?

অঘোরনাথ ছেলের আচরণে লজ্জা অনুভব করেন। সমবেদনা প্রকাশ ক'রে ব'লে ওঠেন—মিথ্যে আমরা আপন আপন করি কেদারনাথ—এ দুনিয়ায় সত্যই কেউ আপন নয়!

যা ব'লেছো! বিশেষ ক'রে এই মেয়েজাতটা! ওরা উড়ো পাখী। একবার মায়ার শিকল কাটিয়ে উড়্‌তে পার্‌লে পিছন ফিরে তাকাবে না কোনদিন! প্রবাদটা রূঢ় সত্য হে অঘোরনাথ—বড় বেশী রূঢ়! মেয়ের বিয়ে দিলে, সে পরই হ'য়ে যায়। যতই করো—আর সে ফিরে তাকায় না কোনদিন।

অঘোরনাথ বলেন—ছেলেই বা কিসে কম যায় বলো?

না, না—ঠিক অতটা নয় অঘোরনাথ—ঠিক অতটা নয়! তাদের চক্ষুলজ্জা ব'লে একটা বস্তু আছে—তাই ইচ্ছা থাক্‌লেও অতটা নির্দ্দয় হ'তে পারে না!

মিছে কথা কেদারনাথ! বিনয় কি আমার কাছ থেকেও দূরে সরে যায়নি? সত্য কথাই তুমি ব'লেছ ভাই—এ জগতে সবাই উড়ো পাখী—সে ছেলেই হোক্—আর মেয়েই হোক্—এ দুনিয়ার নিয়মই বোধ হয় এই!

গড়্‌গড়ায় একটা গভীর টান দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'র্‌লেন কেদার-নাথ। ব'ল্‌লেন—তুমি ঠিকই ব'লেছো! আমি শ্বশুর—আমার কাছে চিরদিন থাকাটা হয়ত তার আত্মসম্মানে বাধা সম্ভব, কিন্তু তুমি বাপ—তোমার কাছেও ত সে গেল না! না—কাজটা সে

মোটেই ভাল করেনি। বিশেষ ক'রে মা-বাবার মত আপন জন এ-জগতে আর কে আছে বলো? তাদের বুক ভেদ ক'রে দীর্ঘশ্বাস নেমে এলে, অমঙ্গল যে হবে তাদেরই! না—না—শিউরে উঠ্‌লেন। ব'ল্‌লেন, এই কে আছিস্—শুনে যা—

চঞ্চল চিত্তে অসহিষ্ণুভাবে উঠে দাঁড়ালেন কেদারনাথ! না, না—তারা ছেলে, একান্ত আপনার জন! বয়সে আজও তারা শিশু—ভুল করাটাও স্বাভাবিক. কিন্তু···তিনিই বা কেমন ক'রে নীরব দর্শকের স্থান অধিকার ক'রে চুপচাপ ব'সে থাকেন? ব্যাকুল কণ্ঠে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লেন ওরে কে আছিস্—

অঘোরনাথ তাঁর চঞ্চলতায় নিজেকে অসহায় মনে করেন। সভয়ে তাঁর হাতখানা চেপে ধ'রে বলেন—কি হ'ল কেদারনাথ? তুমি কি তবে অসুস্থ বোধ ক'র্‌ছো?

না,না,—সোফার উপর চেপে ব'সে তাকিয়াটায় হেলান দিয়ে ব'ল্‌লেন—না, বেশ ভালই আছি অঘোরনাথ! সুস্থ তবিয়েতেই বসবাস ক'র্‌ছি! কিন্তু কি জানো, মনটা বড় দুর্ব্বল হ'য়ে প'ড়েছে। তারা ছেলেমানুষ, কতটুকুই বা বোঝে! হয়ত অভিমানভরেই তারা চলে গেছে। আমার নিজেরও গোঁয়ার্ত্তুমী বা বাড়াবাড়ি, একটু ত ছিলই! হয়ত—সে বস্তুটাই তাদের অসহিষ্ণু ক'রে তুলেছে! একটু থেমে ব'ল্‌লেন, আমি ত বাপ্! তাদের সেই দোষ-ত্রুটিগুলো ত পড়্‌শীর মত ব'সে ব'সে দেখ্‌তে পারি না, কর্ত্তব্য ব'লে আমারও ত একটা বস্তু আছে!···

* * *

কেদারনাথ মনে মনে রূঢ় পণ ক'রে ব'সেছিলেন—যারা শুধু নিজের সুখ-সুবিধার কথাই ভাবে, অপরের দিকে ফিরে তাকিয়ে দেখার অবসর যাদের নেই, সে হ'লই বা নিজের মেয়ে কিংবা জামাই, তাদের সুখের

দিকে ফিরে, তিনিও তাকাবেন না সহসা। কিন্তু বেলা যতই গড়িয়ে প'ড়্‌তে সুরু হ'ল, মনের বাঁধনটাও যেন সেই সুরে সুর মিলিয়ে শিথিল হ'য়ে এলো। প্রতিটি মুহূর্ত্তে তাদের অভাবটা স্পষ্টতর হ'য়ে এমন একটা বিরাট শূন্যতার ব্যবধান সৃষ্টি ক'র্‌লো, যেখানে অন্তরাত্মা ডুকরে কেঁদে উঠেও সান্ত্বনার পথ খুঁজে পেল না।

জীবন অতিষ্ঠ বোধ হ'তে লাগ্‌লো! শূন্যতার বোঝা বইবার মত সামর্থ্য হারিয়েছে দেহ-মন। ব্যাকুল হ'য়ে অন্তর কাৎরে ওঠে প্রতিটি মুহূর্ত্তে। একবার মনে হয় দূর ছাই, ঘুরেই আসি না—দূর ত বেশী নয়; বড় জোর দশ কি পনেরো মিনিটের পথ—

হাতের নলটা ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন কেদারনাথ। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে কে যেন তাঁর কানে ফিস্ ফিস্ ক'রে ব'লে উঠ্‌লো—এটা যে তোমার নিজেরই পরাজয় কেদারনাথ!

পরাজয়!·· হ্যাঁ - মনটা ঠিকই প্রশ্ন তুলেছে বটে! ভাবেন কেদার-নাথ—যে মেয়ে-জামাই তাঁর সম্মান দিল না, এই নিবিড় ভালবাসার মূল্য দিল না, তারা আজ তাঁর কে? না—না—এ দুর্ব্বলতা তাঁর সাজে না!

সোফাটার উপর সশব্দে চেপে ব'সে প'ড়্‌লেন কেদারনাথ। না—সত্যই তিনি আজ বড় দুর্ব্বল হ'য়ে প'ড়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে হাঁক দিয়ে উঠ্‌লেন—ওরে কে আছিস্, এক ছিলিম তামাক সেজে দিয়ে যাতো!

বেয়ারা এসে তামাকের ক'ল্‌কেটা পাল্‌টে দিয়ে গেল। ভুড়ুক ভুড়ুক শব্দে ঘন ঘন নলে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়্‌তে লাগলেন আপন মনে। ঘরটা ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার হ'য়ে গেল, তবুও তৃপ্তি নেই! অন্যদিন সময়টা কখন কেমন ক'রে যে কেটে যেতো, তার হদিস পেতেন না খুঁজে। অঘোরনাথও আস্‌তেন তাড়াতাড়ি—আজ সবই যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। সময় কাটে না, অঘোরনাথও আসেন

না!·· হ্যাঁ, দুঃসময়ে সবই এমনিতর দীর্ঘসূত্রী হ'য়ে পড়ে বটে! গড়গড়ায় আরও একটু জোরে বারকয়েক টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়্তে সুরু ক'র্লেন ; ধোঁয়াগুলো কুণ্ডলী পাকিয়ে ভেসে বেড়াতে লাগ্লো ঘরের মধ্যে।

সহসা মনটা ব'লে উঠ্লো, দূর ছাই! ছেলেমেয়ের কাছে মান আবার অপমান! তারা ত এই দেহেরই রক্ত ও অস্থিমজ্জার ধারা-উপধারা। তাদের কোন পৃথক অস্তিত্ব আছে নাকি এ পৃথিবীতে? জীবনে প্রিয় তারা সকলের চেয়ে বেশী।

নিজের মনে নিজেই হেসে উঠলেন কেদারনাথ। কি ভুলই না ক'রে ব'সে আছেন তিনি! ছেলেমেয়ের প্রতি রাগ—না, না, তা কি করা যায় কোনদিন!—তারা যে দাম্পত্য জীবনের সুখ-প্রতিবিম্ব! মুখের দিকে তাকালেই ক্ষণিকের সেই সুখস্মৃতিটুকু সজাগ হ'য়ে ওঠে! না—না, জীবনের দুর্ব্বল মুহূর্ত্তের নিবিড়তম সুখের প্রতিচ্ছায়া তারা। তাই ত এত প্রিয়, এত আদরের বস্তু এ দুনিয়ায়। রাগ কি তাদের উপর করা সম্ভব কোনদিন?

অভিমান- তা একটু হয় বই কি! যাদের জন্য জীবনের প্রতিটি রক্তবিন্দু ক্ষয় করা যায়, তারা যদি মুখের দিকে ফিরে না তাকায়—মনটা ক্ষুব্ধ হয় বইকি!

কিন্তু একি? পরিচিত কার পায়ের লঘু শব্দ ভেসে আস্ছে যেন! হ্যাঁ···হ্যাঁ, এত সেই চির পরিচিত, চির আকাঙ্ক্ষিত—

বাবা! সেই মুহূর্ত্তেই ভেসে উঠ্লো মৃদু কণ্ঠস্বর। কোথায় তুমি বাবা? এত ধোঁয়া কেন? বাবা—কোথায় তুমি বাবা—!

কে? মাধুরী? ফিরে এসেছিস মা—ফিরে এসেছিস্? ব্যাকুল হৃদয়ে দরজার সাম্‌নে এগিয়ে এলেন কেদারনাথ। জড়তাভরা কণ্ঠে ব'লে উঠ্লেন – দাদু—আমার দাদু!

এই যে বাবা! স্মিতহাস্যে শিশু অজয়ের কণ্ঠে একাধিকবার চুমু খেয়ে মাধুরী কেদারনাথের কোলে তুলে দিল তাকে। ব'ল্‌লো, এইত তোমার দাদু!

আমার দাদু, আমার সোনা—আবেগে তাকে বুকে জড়িয়ে ধ'র্‌লেন কেদারনাথ। পরমুহূর্ত্তে সাদরে কচি চিবুকখানা দোলা দিয়ে ব'লে উঠ্‌লেন —দাদুকে আমার বহুক্ষণ দেখিনি! প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠেছিল এতক্ষণ!

মাধুরী তাঁর পাশেই দাঁড়িয়েছিল। উজ্জ্বল হাসি ভরপুর তার মুখের দিকে তাকিয়েই কেদারনাথ আবেগভরে মাথাখানা তার টেনে নিলেন একেবারে বুকের কাছে। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ব'লে উঠলেন—দাদুকে কোলে না পেলে বুকটা সত্যই হাল্‌কা হ'য়ে যায় মা! লোকে বলে, টাকার চেয়ে সুদের মূল্য বেশী। কথাটা মিছে নয় দেখ্‌ছি! সুদই সুখ, সুদই তৃপ্তি,—তাই ত মূল্য তার এত বেশী!

শিশু অজয় বোঝে না কিছু, তবুও সে হাসে।

হাসিমুখে ব'লে ওঠেন কেদারনাথ—দেখলে ত মা! দাদু আমার কচি হ'লে কি হবে, কথা ঠিক্ বোঝে। কিরে দাদু, হাসছিস্ যে? তুই কি জীবনের আমার সুদ?

শিশু তবুও হাসে। আবেগে গণ্ডে তার গভীর চুম্বন ক'রে কেদারনাথ নিজের মনে নিজেই ব'লে ওঠেন—তাইত তোকে কোলে পেয়ে এত তৃপ্তি, এত শান্তি, এত খুশী, এত আনন্দ। দেখ্‌ছিস না ঘরখানা আমার আলোয় আলো হ'য়ে গেছে! পুনরায় গণ্ডে তার একটি চুমু খেয়ে ব'ল্‌লেন—চলো মা, ভেতরে চলো। মা তোমার একা একা ব'সে কি ভাব্‌ছেন, কি ক'র্‌ছেন—কে জানে?

সুচারুদেবী ক্ষুব্ধ হ'য়েছিলেন মেয়ের ব্যবহারে। তিনি নিজে নারী। নারী-প্রকৃতি তাঁর কাছে অজ্ঞাত নয়—তবুও ব্যথা হৃদয়ে জাগে বইকি!

যাকে বুকের রক্ত দিয়ে মানুষ ক'র্লেন প্রতিটি পলে—যাকে স্নেহ, দয়া, মায়া ও মমতার নিবিড় আবেষ্টনে বেঁধে, লালন-পালন ক'রে এলেন এত-বছর, সে যদি স্বেচ্ছায় সে গভীর মায়া কাটিয়ে চলে যায় দূরে—অন্তরটা গুম্‌রে ওঠে বইকি! কিন্তু উপায় কি? প্রকৃতির রীতিই ত এই!

একদিন প্রকৃতির নিজস্ব প্রয়োজনের তাগিদে বসন্ত জেগেছিল জীবনে। তার ফলে-ফুলে জীবন-প্রাঙ্গন হ'য়েছিল মুখরিত। আবার যখন সময় এলো তখন ঝরেও গেল একে একে! কাউকেই ধরে রাখা গেল না শেষ পর্য্যন্ত। মনটা তাই শূন্যতার বেদনায় মুষড়ে পড়ে প্রতিটি মুহূর্ত্তে। রিক্ততার তিক্ত আস্বাদনে জীবনটা জীর্ণ ও শীর্ণ হয় প্রতিটি দিনের ব্যবধানে! নিজের মনে নিজেই ভাবেন সুচারুদেবী, হয়ত এরও প্রয়োজন আছে!

চিন্তার স্রোত রূপ পরিবর্ত্তন করে। অতীতের বিস্মৃতির দ্বার হাল্‌টে হাল্‌টে দেখেন, কোন্‌টা তাঁর ছিল একান্ত আপন। এই প্রাসাদ-সম অট্টালিকা—তার আয়োজন ও প্রয়োজনের বিলাস ব্যসন—একদিন – হ্যাঁ, ছিল এর প্রয়োজন। আজ এর কোন মূল্য নেই, কোন আকর্ষণ নেই—সবই যেন জীবনের বোঝা। যাদের জন্য—এ সবের চাহিদা—তারা চলে গেছে, দূরে গেছে চলে; শুধু যক্ষের মত বসে থাকা গভীর প্রতীক্ষায়—যদি কোনদিন আসে তারা ফিরে! বুক ভেদ ক'রে নেমে এলো একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস!

.. কিন্তু কেন তারা আস্‌বে? একদিন নিজ প্রয়োজনের তাগিদায় যাদের ডেকে এনেছিলেন এ জগতে,—তাদের জীবনেও যে আজ সেই প্রয়োজনের তাগিদ এসেছে একান্ত নিবিড়তর করে! তাই তারাও ভুলে গেল সব! একদিন তিনিও ভুলেছিলেন এমনিতর করে। না—না—দুঃখ তাঁর নেই! জীবনে তারা সুখী হোক্—শান্তি পাক্—এর বেশী কোন কামনাই তিনি আজ পোষণ করেন না জীবনে।

কিন্তু দাদু! চোখের পাতায় অহরহ ভাসে কচি সেই মুখ! কোমল তুলতুলে কচি দুটো হাত, টুকটুকে রাঙা ঠোঁটের কচি দুটো পাতা, পিটপিটে ছোট্ট দুটো চোখের সেই মিচকে দুষ্টু হাসি—কি যাদুই না মাখানো আছে ওর প্রতিটি শিরা-উপশিরায়! সেই ত মায়া, সেই ত আকর্ষণ! যেন জীবনের আশা ও ভাষার জীবন্ত প্রতীক, হৃদয়নীরের ফুটন্ত কমল! কি অপরূপ তার রূপ! সারা জীবন দেখেও নিবৃত্ত হয় না সেই দেখার পিপাসা। তাই কাঁদে হৃদয়—কাঁদে বারে বার।···

কে এসেছে দেখেছো? সহাস্যে কেদারনাথ পাশে এসে দাঁড়ালেন। আরে, কি ভাবছো? চেয়ে দেখো—

সচকিত হ'য়ে ফিরে তাকালেন সুচারুদেবী। দাদু! সেই মুহূর্তে আবেগে কেঁপে উঠলো ঠোঁটের দুটো পাতা। কোলে তাকে টেনে নিয়ে বুকের মধ্যে চেপে ধ'রলেন নিবিড়তরভাবে। আঃ—বুকের সমস্ত জ্বালা বিদূরিত হ'য়ে গেল সেই মুহূর্তেই। যেন পাপ-তাপ-হারী ভাগিরথীর স্নিগ্ধ স্বচ্ছ বারিধারা! পরশে তার দেহ-মন তৃপ্ত হ'ল—শান্ত হ'ল হৃদয়-ক্ষুধা।·· একান্তে—হ্যাঁ, এমনি নিবিড়তর ক'রেই নারী পেতে চায় বুকে। সেই আশার ক্ষুধায় নারীর-হৃদয় আমরণ কাঁদে! এটা তার প্রকৃতির ক্ষুধা—জীবনের তৃষা—এর হাত থেকে মুক্তি তার নেই—অব্যাহতি নেই কোনকালে।

* * *

মাধুরী স্বেচ্ছায় এই অপ্রীতিকর আবহাওয়া থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে, উভয় সংসারের অভিন্ন এই প্রীতির বাঁধনটাকে অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা ক'রলো আপ্রাণ। তবুও তুষ্ট সে ক'রতে পারলো না কাউকেও।

মনোরমা ছেলের বিয়ে দিতে ব্যস্ত হ'য়েছিলেন—কিন্তু মনে ছিল একটি গোপন আশঙ্কা—ছেলে তাঁর পর হ'য়ে যাবে! এ আশঙ্কাটা

অমূলক নয়—হ'য়ে যায়, হ'তেই হয়! এটা বাস্তব জীবনের সহজাত রূপ। যেখানে প্রাণ পায় প্রতিষ্ঠার অবকাশ, সেখানে মানুষ ছুটে যাবেই। যেখানে সে পায় আনন্দের সন্ধান সে বস্তুটা তার কাছে প্রিয়তর হবেই! এটা তিনি নিজেও জানেন—তবুও মাতৃ-হৃদয় কাঁদে। সে এমনই অবুঝ যে, বোধ মানানো তাকে যায় না কোনকালে।

মনোরমা ভাবেন—যাকে এতটুকু রক্তমাংসের সেই সচল পিণ্ড থেকে এতদিন মানুষ ক'রে এলেন, যার জন্য জীবনের প্রতিটি রক্তবিন্দু ক্ষয় ক'রলেন, তার কি কোন মূল্য নেই? শুধু এই লৌকিক সম্বন্ধ-টুকুর আশা ও আকাঙ্ক্ষায় জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্ত কি ক্ষয় ক'রে এলেন নীরবে? না, না—তা কি সম্ভব কোনদিন? তার দেহ ও মনের সঙ্গে যে তাঁর প্রতিটি রক্ত-কণিকার নিবিড়তর সম্বন্ধ—তার দাবী কি এত সহজে ত্যাগ করা যায়, না সম্ভব এ দুনিয়ায়! না—না—না—সে আমার—আমার—একান্ত আপনার। তাকে কে একজন নবাগত এসে এমনি ছিনিয়ে নিয়ে যাবে—আর নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বসে বসে নীরবে তিনি দেখ্বেন সে দৃশ্য ? রক্তমাংসে গড়া মানুষের পক্ষে তা কি সম্ভব কোনদিন?

অন্তরটা তাঁর অহরহ জ্বলেপুড়ে ছাই হ'য়ে যায়। অথচ প্রতিবাদের ভাষাও ফোটে না ঠোঁটের পাতায়। তাই নিশ্চিন্তে, নির্জ্জনে যখনই বসেন দু'দণ্ড, সেই মুহূর্ত্তেই ক্ষতের জ্বালাটা স্পষ্টতর হ'য়ে ওঠে, অকারণে বুক ভেদ ক'রে নেমে আসে সকরুণ একটা দীর্ণ দীর্ঘশ্বাস। অমঙ্গল আশঙ্কায় দুরু দুরু ক'রে কেঁপে ওঠে বুক, তবুও রুদ্ধ করা যায় না সেই গতিবেগ। সে নাম্বেই! দুর্দ্দমনীয় সে।

ক্রোধে, ক্ষোভে দেহের প্রতিটি শিরা-উপশিরা রি-রি ক'রে ওঠে। তীব্র প্রতিবাদের অসহিষ্ণু ভাষা জীর্ণ করে হৃদয়, কিন্তু আত্মপ্রকাশেরও ত অবসর একটা চাই। যার সে সুযোগ সদ্ব্যবহারের সুযোগলাভ ঘটে,

সেই ছলে-বলে, কলে-কৌশলে গায়ের জ্বালা মিটিয়ে নেয় সহজে। অথচ সে পথ যার চিররুদ্ধ, তার ওই'এক দীর্ঘশ্বাসই হয় পাথেয়। এ ছাড়া মুক্তির দ্বিতীয় পথই বা আজ খোলা তাঁর কোথায়? এটাও যে চিরন্তনী! যুগ যুগ ধরে যে সে কাঁদবেই!... .

মাধুরীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে মনোরমা মুগ্ধ হ'য়েছিলেন। ভেবেছিলেন —মেয়েটির শুধু মনভোলানো রূপ নেই, সকলের চিত্তজয়ের শক্তিও আছে যথেষ্ট। তারপর দীর্ঘ আঠারোটি মাস গেছে কেটে। যাওয়া-আসার মাঝে নিত্য নোতুন পরিচয়ও পেয়েছেন তিনি, ধীরে অতি ধীরে। আকর্ষণীয় ধীর ও নম্র ব্যবহারে খুশী তিনি একা হন্‌নি, হ'য়েছিল সকলেই। তাই একদিন নিজেই নিজের মনকে ধিক্কার দিয়েছিলেন—মিথ্যে আশঙ্কায় নিজেই জ্বলেপুড়ে মরেছেন এতদিন! এমন বৌ কি সহসা খুঁজে পাওয়া যাবে কোনকালে? ও যে নিজের পেটের মেয়েরও বাড়া!

কিন্তু যে মুহূর্ত্তে শুন্‌লেন, তারা পেতেছে নোতুন গৃহস্থালি, বেঁধেছে নোতুন আস্তানা, সেই মুহূর্ত্তেই জ্বলে উঠ্‌লো অন্তর তাঁর। এ্যাঁ— পেটে পেটে এত সয়তানী বুদ্ধি! আমি না হয় শ্বাশুড়ী, কিন্তু নিজের মা, বাবা—তারাও কি এ দুনিয়ায় কেউ আপনার নয়?

অথচ কয়েক ঘণ্টা পরে, হাসিমুখে সেই মাধুরীই যখন শিশু অজয়কে কোলে নিয়ে তাঁর সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো, নত হ'য়ে পায়ের ধূলো মাথায় তুলে নিল, সেই মুহূর্ত্তেই তাঁর ক্ষুব্ধ হৃদয় পুলকের শিহরণে উদ্বেলিত হ'য়ে উঠ্‌লো। তিনি ভুলে গেলেন সবকিছু। অন্তর খুলে আশীর্ব্বাদ ক'রে ব'ল্‌লেন—এয়োস্ত্রী হও মা! ভগবান তোমার মনের সকল বাসনা পূর্ণ করুন একে একে।

মাধুরী এইটুকুই আশা রাখে। এই আশার প'রেই নির্ভর ক'রে স্বেচ্ছায় ঐশ্বর্য্যের প্রাসাদ থেকে নেমে এসে নোতুন সংসার যে পেতেছে

ছোট এক ভাড়াটে বাড়ীতে। সেই বাসনার সফলতাই সে কামনা করে কায়মনোবাক্যে। তাই খুশীতে মনপ্রাণ তার দুলে ওঠে। উজ্জ্বল হাসিতে মুখখানা তার চকিতে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে। বলে—আপনাদের আশীর্ব্বাদই ত আমাদের জীবনের চলার পাথেয় মা!…

* * * *

কেদারনাথ আশা ক'রেছিলেন—ওটা ওদের দু'দিনের সখ। দু'দিন পরে ফিরে নিশ্চয়ই তারা আস্‌বে! যে আজীবন সুখের মধ্যে লালিত পালিত, সে কি স্বেচ্ছায় দুঃখের বোঝা বহন ক'র্‌তে পারে কোনদিন?

কিন্তু সে আশা তাঁর পূর্ণ হ'ল না। মাধুরী তার সেই ছোট সংসারের মধ্যেই দিনযাপন ক'র্‌তে লাগ্‌লো মনের আনন্দে। ক্ষুব্ধ হ'ল পিতৃহৃদয়! এ দুনিয়ায় স্নেহ-মমতার কোন মূল্য নেই! কেউ তারা আপনার নয়। স্বার্থে ভরপুর জগতে—স্বার্থটাই হ'ল বড়। যে দিন সে প্রয়োজন তার শেষ হ'য়ে যায়,—সে দিনই সে বেছে নেয় তার আপন চলার পথ। তাই গতি তার রুদ্ধ করা যায় না—শুধু কেঁদে মরে স্নেহকাতর এই দুর্ব্বল হৃদয়!

কেদারনাথ তাই হ'লেন একটু নির্ম্মম, একটু বেপরোয়া। এ জগতে যখন কেউ কারও নয়—আপন-পর সবাই যেখানে সমান, সেখানে তিনি একাই বা আপন আপন ক'রে কেঁদে মরেন কেন? যারা নিজের দুঃখকে দুঃখ ব'লে মনে করে না—যারা নিজেদের মতামতকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসিয়ে মনের আনন্দে আপনি থাকে মশ্‌গুল—তাদের সেই সুমধুর জীবনে কেনই বা তিনি অহেতুক সহানুভূতি প্রকাশে অশান্তির সৃষ্টি ক'র্‌তে যাবেন? কিন্তু এ দৃঢ়তা তাঁর কয়েক মিনিটের। পরমুহূর্ত্তে নিজেই বিচলিত হ'য়ে ওঠেন! ভাবেন, লোকসমাজে মাথা উঁচু ক'রে নির্ব্বিবাদে কাটিয়ে এলাম সারাটা জীবন, অথচ চিত্তবৃত্তি এমনই দুর্ব্বল যে আত্মবিক্রয় ছাড়া আজ আর সে আত্মতৃপ্তির সন্ধান

পায় না কোথাও খুঁজে। হয়ত বয়সের ধর্ম্ম এই! নইলে একদিন যে আত্মসম্মান জ্ঞান তাঁকে দিয়েছিল চলার পথের সন্ধান, আজ সে-ই—তার পূর্ব্বের দৃঢ়তা হারিয়ে নিজের অজ্ঞাতেই নিজেকে করে হেয়। শুধু তাই নয়—সেখানেই সে পায় সুখরূপী অমৃতের সন্ধান! এত সহজে, এত আয়াসে তাই নিজেকে বিকিয়ে দিতে অন্তর তার এমনিতর ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে!

তিনি নিজেও বিকিয়েছেন, তৃপ্তিবোধও যে করেননি, তাও নয়—কিন্তু কেন? দেহমন ত তাঁর এখনও রয়েছে সতেজ—তাঁর সেই আভিজাত্যের গৌরব—তার সংস্কার আজও ত হয়নি এতটুকু ম্লান, তবুও ত অবহেলে মাথা তিনি নত করেন বার বার!

ওই ত এতটুকু মেয়ে! সেদিনের সেই শিশু র'য়ে গেছে আজও। তবুও কি সে আজ তাঁর চেয়েও শক্তিশালী? তাঁর চেয়েও—না না—না—তা কি ক'রে সম্ভব? কই, আজও ত কেউ সম্মুখে তাঁর মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াতে সাহস করেনি? তাহ'লে—তাহ'লে—সে দাঁড়ালো কেমন করে? শুধু দাঁড়ালো না—পথ রোধ ক'রে দাঁড়িয়েছে একেবারে! অথচ হাসিমুখে তার সেই আধিপত্যকেও স্বীকার ক'রে নিতে বাধ্য হয়েছেন তিনি!

পরাজয়? তা পরাজয় বৈকি? কিন্তু আত্মগ্লানি ত হৃদয়ে জাগে না এতটুকু! সেই সন্ধানী সুতীক্ষ্ণ আত্মসম্মানজ্ঞানটাও বিষহারা ফণিনার মত মাথা নত ক'রে শুধু আত্মদান ক'রলো না—আত্মতৃপ্তিও বোধ ক'রলো, নিশ্চিন্ত নীরবে! হায়রে দুর্ব্বল স্নেহ! মানুষকে তুমি এমনি নিঃস্ব ও রিক্ত ক'রে দাও প্রতিটি মুহূর্ত্তে! তাই পরাজয়ই হয় তার বিজয়মাল্য; চির-রিক্ততার আসনই হয় বুভুক্ষু হৃদয়ের তৃপ্তির পাথেয়! তারই বোঝা সে ব'য়ে চলে যুগ যুগ ধরে। কিন্তু এত সহজে হার আমি স্বীকার ক'রে নেবো কেন?

মনটা বিদ্রোহ ঘোষণা ক'র্‌তে চাইলো। নিজের মনে নিজেই ব'লে উঠ্‌লেন কেদারনাথ—এখনও আমি সবল, এখনও আমি কর্ম্মঠ—জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা আমার এখনও হয়নি নিঃশেষ।…তবে?…তবে? না—না, নিজের খুশীমতই আমি চল্‌বো—খুশীমত খাবো—খুশীমত উড়িয়ে পুড়িয়ে বিলিয়ে দেবো দু'হাতে। তারপর—হ্যাঁ, তারপর—

কেদারনাথ হারিয়ে ফেলেন খেই। তারপর—হ্যাঁ, তারপর—কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ছুটে আস্‌বে মাধুরী। না—না—তখন পায়ে ধ'রে কাঁদ্‌লেও ক্ষমা আমি ক'র্‌বো না—ক'র্‌বো না।…আমি নিষ্ঠুর, আমি নির্দ্দয়! হৃদয় আমার তোমার জন্যে কেঁদে কেঁদে পাগল হ'য়ে গেছে; তবুও তুমি তাকাওনি মুখের দিকে ফিরে—আর আজ এসেছো দু'ফোঁটা চোখের জলে হৃদয়টাকে সিক্ত ক'রে দিতে? না—না, হবে না—যাও—যাও, সরে যাও—অত দুর্ব্বল মানুষ আমি নই! নিজের মনে নিজেই ব'লে উঠ্‌লেন, বুঝ্‌লে মাধুরী, তুমি আমার মেয়ে, কিন্তু আমি নিজে কেদারনাথ! জমিদার কেদারনাথ। আর তুমি—একটা কেরাণীর সতী-সাধ্বী স্ত্রী,—না—না—মন আমার ভিজ্‌বে না! নিজের চিন্তাধারার প্রাবল্যে নিজেই হেসে উঠ্‌লেন কেদারনাথ, হা—হা—হা।…কেমন ঠিক বলিনি? সেদিন তুমি বৃদ্ধ বাপ ব'লে, অবজ্ঞা ক'রেছিলে—আজ এসেছো কাঙালিনী সেজে তার বিষয়ের অধিকারিণী হওয়ার আশায়! হা—হা—হা,—কেমন মজা! দেবো না তোমায় দেবো না এতটুকুও! তবুও তুমি কাঁদ্‌বে?·এ্যাঁ—কাঁদ্‌ছো··কাঁদ্‌ছো—কিন্তু কেন? স্বার্থসিদ্ধির জন্য?—তবে? তবে? কি ব'ল্‌লে স্নেহভিক্ষা? কার? আমার—আমার? তা হ'লে তুমিও এ বুড়ো বাপকে ভালবাসো? বাসো—সত্য ব'ল্‌ছো?

না—না—না,—মিথ্যে কথা! মিথ্যে কথা! অভিনয়ে আমি ভুল্‌ছিনে—তোমরা এতটুকুও ভালবাস না। তা হ'লে, বুড়ো বাপের বুকে

এতবড় দাগা দিতে কি পার্‌তে কোনদিন? না—না,—কখনও তা পার্‌তে না! এটা ছলনা,—হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ—ছলনা! এত সহজে আর আমি ভুল্‌ছিনে,—হা–হা–হা—।

কিন্তু একি? তুমি কাঁদ্‌ছো? তবুও কাঁদ্‌ছো? কেন? কেন? কিসের জন্য? আমি ত তোমায় তোমার অধিকার থেকে বঞ্চিত করিনি। তোমার অধিকার, হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ,—ওটা তোমার চিরদিনের অধিকার! না—না,—আর কেঁদো না মা—আমার সবকিছু যে গুলিয়ে গেল—হারিয়ে গেল। এসো মা—আমার বুকে এসো—বুকটা এতদিন জ্ব'লে পুড়ে ছাই হ'য়ে গিয়েছিল—একটু হাত বুলিয়ে দাও—হাত বুলিয়ে দাও—

কিন্তু একি? শূন্যতার মাঝে কি তবে শুধু ক্রন্দনই হ'ল সার? ছায়া হ'য়ে মিলিয়ে গেল সে? মিলিয়ে গেল? এতবড় রক্তমাংসের পুতুল আমার—মিলিয়ে গেল? না—না,—এই ত পাশে আমার সে দাঁড়িয়েছিল। হ্যাঁ—হ্যাঁ,—স্পষ্টই ত দেখ্‌লাম,—নিজের চোখে দেখ্‌লাম,—সে কাঁদ্‌ছে,—মা আমার কাঁদ্‌ছে!—অভিমানে মুখখানা শুকিয়ে এতটুকু হ'য়ে গেছে। প্রাণটা জ্ব'লে উঠ্‌লো, অথচ যেই তাকে কাছে টেনে নিতে গেলাম—সে পালিয়ে গেল—হায়রে অভিমান!

নিজের মনে নিজেই ব'লে ওঠেন, এ দুনিয়ায় কোন্ বস্তুটা বড়? স্নেহ, মায়া, মমতা, না—ওই অভিমানের শূন্য ভাণ্ডটা?

একটু সচকিত হ'য়ে খাড়া হ'য়ে ব'স্‌লেন কেদারনাথ। ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখ্‌লেন ঘরের প্রতিটি বস্তু। তারপর নিজের মনে নিজেই গম্ভীর ক'রে কি যেন একটু ভেবে নিয়ে ব'লে উঠ্‌লেন—তা হ'লে কেউ আসেনি! এতক্ষণ কি তবে জেগে জেগে স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম আমি? হয়ত তাই হবে। একপাশে বাস্তব জগৎ, অন্য পাশে স্নেহান্ধ কাতর পিতৃহৃদয়। তারই দ্বন্দ্বে অন্তর-জগতে যে তুফানের খেলা চলে

ছায়াটা তার মাঝে মাঝে এমনি ভাবে চোখের তারায় স্পষ্টতর হ'য়ে, নিজেকেই ভুলিয়ে রাখে বারে বার। হায়রে কুহকিনী আশা! তোমারই খেলায় মানুষ কখনও হাসে, আবার কখনও সে কাঁদে! হাঁা, কাঁদে—ঠিক অসহায় শিশুর মতই সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে অনিবার!...

* * * * *

মাধুরী নিজের সংসার নিয়েই ব্যস্ত। তার বোঝা ব'য়ে যখন প্রাণটা তার হাঁপিয়ে ওঠে, তখনই সে উন্মুখ হ'য়ে ওঠে—একটু বিশ্রাম লাভের আশায়! কর্ত্তব্যজ্ঞানটাও সেই মুহূর্ত্তে সচেতন হ'য়ে ওঠে। ফিরে যায় সে কেদারনাথের কাছে।

সেখানের সেই নির্ম্মল ও শান্ত পরিবেশে মনটা স্বস্তিবোধ করে, কিন্তু তারই ফাঁকে অতীতের স্মৃতিগুলো ভীড় ক'রে ছেঁকে ধরে একে একে! সেই আবর্ত্তের ঘূর্ণিপাকে সে ভুলে যায় নিজেকে। তার পূর্ব্বের সেই বাল্য ও অনূঢ়া জীবন যেন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। সঙ্গে সঙ্গে সেও চঞ্চল হ'য়ে ওঠে সেই মুহূর্ত্তে। হাস্যে-লাস্যে মুখরিত হ'য়ে ওঠে সেই নিস্তব্ধ পাষাণপুরী!

কেদারনাথ ও সুচারুদেবী—হৃদয়ের সান্ত্বনা ফিরে পান! বুকজোড়া হাহাকারের তীব্র সেই দহন জ্বালা স্তিমিত হ'য়ে আসে নিজেরই অজ্ঞাতে। তাঁরা ফিরে আসেন তাঁদের সেই অতীত জীবনে! অন্তঃশীলা স্নেহধারা, ভাদরের ভরা যৌবনের মত উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে নিজস্ব গতি-বেগের আবর্ত্তে। ঝলকে পুলকে মনপ্রাণ দোলা খায় বার বার!

বেশ খানিকটা সময় কেটে যায় হৈ-চৈ-এর মধ্যে। অবসাদগ্রস্ত মন পুনরায় সেই অবসরে তাজা হ'য়ে ওঠে। তারপর সে ফিরে যেতে ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে নিজের আস্তানায়! প্রাণের প্রতিটি রক্তবিন্দু দিয়ে গ'ড়ে তোলা সেই মন্দির—জীবন অপেক্ষাও প্রিয় সেই বস্তু। তাই—শত ঐশ্বর্য্যের

বাঁধনও তাকে প্রলুব্ধ ক'র্‌তে পারে না। মাধুরী ফিরে যাওয়ার জন্ত ব্যস্ত হয় বার বার।

সুচারুদেবীর মন চকিতে বিমর্ষ হ'য়ে পড়ে। বলেন, দু'দণ্ড যদি স্থির হ'য়ে বসার অবসর না থাকে—তবে মিছে আসা কেন, মা?

মাধুরী হাসে। বলে, তোমাদের না দেখ্‌লে মনটা যে স্থির থাকে না মা!

সুচারুদেবীর ক্ষুব্ধ হৃদয় সেই মুহূর্ত্তেই আত্মবিস্মৃত হ'য়ে পড়ে। খুশি-ভরা হাসি হেসে ব'ল্‌লেন—তুই এলে—বাবা তোর—সত্যই খুব খুশী হয় মাধুরী!

উত্তরে মাধুরী পুনরায় মৃদু হাস্‌লো। ব'ল্‌লো, কার না মা-বাবার কাছে ফিরে আস্‌তে ইচ্ছা ক'রে মা? কিন্তু কি করি বলো—সংসারে যে আমি একা!

তা বটে! নিজের অজ্ঞাতেই সুচারুদেবীর বুক ভেদ ক'রে নেমে এলো চাপা গভীর একটা শ্বাস। সত্যই সংসার ফেলে একটি মুহূর্ত্তও স্থির থাক্‌তে পারে না কোন নারী! হয়ত তার জীবনের বহু সংস্কারের মধ্যে এটাও একটা প্রবলতম সংস্কার। তাই মায়া তার কাটানো সম্ভব নয় কোনদিন। সস্নেহে চিবুক তার পরশ ক'রে ব'ল্‌লেন, মাঝে মাঝে এসে, থাক্‌তেও ত পারিস্ দু' একটা দিন!

মাধুরী হাস্‌লো। ব'ল্‌লো—কেন মা? প্রতিদিনই ত আমি আসি!

সে কথা ঠিক। কিন্তু মনটা যে তাতে তৃপ্তি পায় না মা!...

* * * *

কেদারনাথের স্থির বিশ্বাস ছিল—মাধুরী দারিদ্র্যের বোঝা বইতে পারবে না বেশীদিন। ক্লান্ত হ'য়ে একদিন তাকে এই বুড়ো বাপের আশ্রয়ে ফিরে আস্‌তেই হবে! কিন্তু সেই সুদীর্ঘ প্রতীক্ষায় যখন পর পর ছটি বছর অতীত হ'য়ে গেল—তখন তিনি স্থির সিদ্ধান্তে

পৌঁছলেন—বিয়ে দিলে মেয়ে পরই হ'য়ে যায়। ধ'রে তাকে রাখা যায় না কোনদিন।

তবুও হৃদয়ে জাগে ক্ষীণ আশার আলো। সেই আশাকে কেন্দ্র ক'রেই সৃষ্টি হয় নানা উৎসবের আয়োজন। মাধুরীও ফিরে আসে সেই উপলক্ষ্যে!

কেদারনাথের শূন্য পিতৃ-হৃদয় ক্ষণিক স্বস্তি ফিরে পায়। কিন্তু নিবিড়তর শান্তির সন্ধান মিলে না কিছুতেই। লেনদেনের মাঝে আত্ম-বিস্মৃতির এই যে ক্ষণিক অবকাশ—এটা অতৃপ্ত হৃদয়ের বুভুক্ষা মিটিয়ে নেওয়ার শেষ প্রচেষ্টা মাত্র! এইটুকুই রিক্ত পিতৃ-হৃদয়ের শেষ অবলম্বন। একে কেন্দ্র ক'রেই তাঁকে কাটিয়ে দিতে হবে জীবনের বাকী ক'টা দিন।

অঘোরনাথ বন্ধুর রক্তহীন আশাহত মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যথা অনুভব ক'র্‌লেন। ছেলে তার কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা ক'রেনি এটুকুই যা সান্ত্বনা। তবুও দারিদ্র্যের চাপে জরাজীর্ণ মনটা তাঁর মাঝে মাঝে বিদ্রোহী হ'য়ে ওঠে। জীবনে কোন্ বস্তুটা শ্রেয়ঃ? স্নেহ? মমতা? না—স্বকীয় স্বার্থসিদ্ধির প্রচেষ্টা?

অঘোরনাথ তলিয়ে দেখেন—কোন্‌টা বড়? জীবনে মূল্য কার কত বেশী!

স্নেহ? মিলিয়ে দেখেন অঘোরনাথ—এ এমনই একটি বস্তু—যা ব্যতীরেকে জীবন স্বস্তি ফিরে পেতে পারে না কোনকালে। এর ক্ষয় চাই—এর অধিকার প্রতিষ্ঠার অবকাশ চাই,—নইলে জীবনটা রিক্ততার বোঝায় পরিপূর্ণ হ'য়ে ওঠে। তাই, হ্যাঁ—হ্যাঁ, তাই, নিবিড় ক'রে মানুষ এর কেন্দ্রাধারকে আপন রূপে পেতে ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে। আপন মনে মৃদু হেসে ওঠেন অঘোরনাথ। হ্যাঁ, সত্যই চাই—নিবিড়তর ক'রে চাই, নইলে বুকের ক্ষুধা ও অতৃপ্তির বোঝায় জীবনটা দীর্ঘ

হয় প্রতিটি পলে মরুভূমির রিক্ততার মত হাহাকারের বেদনায় নিজেই জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়—প্রতিটি মুহূর্ত্তে। হয়ত এটা মোহ—কিন্তু এর মাদকতা নইলেও জীবন ফলে-ফুলে রাঙা হ'য়ে ওঠে না! তাই এর এত প্রয়োজন।

...কিন্তু...মমতা? এটাও জীবনের বাঁধন! আশা আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের যোগসূত্র! এরই ছলনায়—মানুষ, ভুল-ভ্রান্তি, ভাল-মন্দ বিচার বিবেচনার পায় না অবকাশ। এটা জীবন উদ্যানের চিরন্তনী সবুজের মেলা। এরই পরশে জীবন হয় মধুময়। এরই ছায়ায় ব'সে মানুষ ফেলে তৃপ্তির শ্বাস। এরই নিবিড় সুখ-পরশে—জীবনের যাবতীয় গুরুভার লঘু হ'য়ে আসে। চলার পথে এ বস্তুটিরও আছে প্রয়োজন!

আর ..স্বার্থ? এটাও জীবনের প্রাণকেন্দ্র। এরই আশায়-ভরসায় মানুষ বাঁধে বাসা। মানুষ থাকে বেঁচে। জীবনে তাই সকল কিছুর চেয়েও প্রিয়তর বস্তু হ'ল—এই স্বার্থ! একে কেন্দ্র ক'রেই সূচিত হয় জীবনের জয়যাত্রা।

...তা'হলে প্রয়োজন আছে সকলেরই! এক ছাড়া গতি নেই অপরের। তবুও ত অকারণে নামে দীর্ঘশ্বাস! নিজ স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে অপরের প্রতি করে দোষারোপ—

হয়ত জীবনের ধর্ম্মই এই! তার সুখই হোক্, দুঃখই হোক্, উপলক্ষ্য একটা চাই-ই চাই।

নিজের মনে নিজেই হাস্‌লেন অঘোরনাথ। সত্যই বিচিত্র এই সংসার। প্রতিটি মুহূর্ত্তে অবিচার ক'রেও বিচারকের আসনে বসে—হয়ত, না—না—তা কেন, নিজেকে ভুলে থাকার প্রয়োজনে নিজেই নিজেকে ভুলে বারে বার।

কিন্তু...পরমুহূর্ত্তে চোখের পাতায় ভেসে ওঠে তাঁর জরাজীর্ণ সংসারের শীর্ণ ছায়াখানা। স্পষ্টতর হয় সেই তীব্র কষাঘাত! নেই, নেই—

সেই চির-বঞ্চিতের রিক্ত হাহাকার। আকাশ বাতাস মথিত ক'রে এগিয়ে চ'লেছে সে দিনের পর দিন—শুধু নেই—নেই—নেই! অহরহ ক্রন্দন তার জীবনকে পিষ্ট ক'রে চ'লেছে প্রতিটি মুহূর্ত্তে! তাই—হ্যাঁ, হ্যাঁ—বুকে তাই, এত ক্ষোভ—এত অভিমান। হায়! ভাবেন অঘোরনাথ, নিজের সুখ-শান্তির আশায়, মানুষ বাঁধে সংসার! সুখী সে হোক্—পিতৃ-হৃদয় চায়ও তাই। তবুও ত আশা রাখে এতটুকু! প্রতিদান ছাড়া সংসারে বসবাস করা চলে কি কোনকালে?

হয়ত কর্ত্তব্য কর্ম্মে ত্রুটি সে রাখেনি। সাধ্যমত সাহায্যও ক'রে চ'লেছে মাসের পর মাস, কিন্তু প্রয়োজন—সে তুলনায় ঢের বেশী র'য়ে গেছে আজও! তাই, তুষ্ট হ'তে পারে না হৃদয়—অকারণে নামে দীর্ঘশ্বাস—

এটা নাম্‌বেই। এর পথরোধ করা সম্ভব নয় কোনদিন। এরই নাম আশা, এরই নাম স্বার্থ—এরই দ্বন্দ্ব জীবনে চলে বারোমাস।

* * *

মাধুরীর হ'ল একটি মেয়ে। কি নাম তার রাখা যায়—সেটাই দাঁড়ালো একটা চরম সমস্যা। সে যে বড় সাধের, বড আদরের! বিনয় বহুবার ব'লেছে, মেয়ে একটা না হ'লে, হৃদয় কি তৃপ্তি পায় কোনকালে?

মাধুরী উত্তরে হেসেছিল শুধু। স্বামীর সাধ তার পূর্ণ হ'য়েছে আজ, কিন্তু মনটা তার অকারণে গিয়েছে একটু দমে। মেয়ে? মেয়েই হ'ল শেষ পর্য্যন্ত! সত্যই কায়মনোবাক্যে চায়নি সে তা—কারণ, নিজেই যে সে মেয়ে! জানে, জীবনের তার দৈন্যতা কোথায়!

কিন্তু হাসিভরা কচি সেই মুখের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে ভুলে গেল সে হৃদয়ের যাবতীয় ক্ষোভ। আদরে বুকে তুলে নিয়ে হাসিমুখে ভাব্‌লো—সত্যই মেয়েরও একটা ছিল প্রয়োজন!

বিনয় তার খুশিভরা মুখের দিকে তাকিয়ে নিজেও হাস্‌লো একটু। গম্ভীর কণ্ঠে ব'ল্‌লো—তাই ত—মেয়ের আমার এখন কি নাম রাখা যাব বল দেখি?

উত্তরে মৃদু হাস্‌লো মাধুরী। ব'ল্‌লো—সীতা, কুন্তী, তারা, দ্রৌপদী—

থামো, থামো। বাধা দিয়ে উঠ্‌লো বিনয়। বিরক্তিভরা কণ্ঠে ব'ল্‌লো—ওগুলো সেকালের—পুরানো হ'য়ে গেছে একেবারে! নোতুন একটা চাই—যা কেউ শোনেনি, কেউ জানেনি—

একটু থেমেই—পরমুহূর্ত্তে উৎসাহিত কণ্ঠে ব'লে উঠ্‌লো—মনে প'ড়েছে—মনে প'ড়েছে, এই ধরো মণিকুন্তলা—শকুন্তলা—

ছাই! গর্জ্জে উঠ্‌লো মাধুরী—ওগুলোও সেকেলে, একালের হ'ল কই?

তা বটে! মাথাটা একটু চুল্‌কে নিয়ে ব'ল্‌লো বিনয়—ওগুলোও চেনাশোনা বটে! তাহলে—কবিতা, কবরী, বন্দনা, শবরী—

না, না, তাও না!

তাহ'লে···প্রণতি, মিনতি—

না, না, হ'ল না—হ'ল না।

তবে? সুচেতা, সুলেখা, সুমিতা—একটার পর একটা নাম ব'লে যায় বিনয়।

হ্যাঁ—হ্যাঁ, সুমিতা নামটা তবু খানিকটা পছন্দসই! মাঝপথে ব'লে উঠ্‌লো মাধুরী, মেয়ের আমার চেহারার সঙ্গে খাপও খাবে ভাল!

সেই ভাল! মৃদু হাস্‌লো বিনয়। মার যখন পছন্দ, তখন বাপেরও আপত্তি থাকা উচিত নয়—

কেন? নামটা বুঝি পছন্দ হ'ল না?

কি যে বলো! পুনরায় মৃদু হাস্‌লো বিনয়। ব'ল্‌লো—ব্যঙ্গ নয় মাধু, ওটা অন্তরের কথা—একেবারে সত্যি! গৃহকর্ত্রী খুশী হ'লে গৃহকর্ত্তা

স্বর্গ হাতে পায় - বুঝলে! যখন পছন্দ তোমার হ'য়েছে, আমার অপছন্দের কারণ কিছু কি থাকতে পারে, না সম্ভব কোনদিন? দাও, সুমিতামাকে আমার কোলে একটিবার দাও, একটু আদর ক'রে চুমো একটা খেয়ে নিই!

হাসিমুখে বিনয় কোলে তুলে নিল সুমিতাকে। আবেগে গণ্ডে তার চুমো খেয়ে ব'ল্‌লো—দেখো, দেখ্‌তে ঠিক তোমার মত হ'য়েছে। তেমনি চোখ, তেমনি হাসি, তেমনি হাতের পাতাগুলো।

মাধুরী তৃপ্তিভরা হাসি হাস্‌লো। ব'ল্‌লো—নাকটা, চিবুকটা, কাণের পাতাদুটো, পায়ের আঙ্গুলগুলো কিন্তু সব তোমার মত। এখনও তুল্‌তুলে—একটু বড় না হ'লে বলা যাবে না ঠিক হ'ল কার মত! তবে, পিতৃমুখী মেয়ে হওয়াই বাঞ্ছনীয়—সুখী হবে ভবিষ্যতে!

হেসে উঠ্‌লো বিনয়—এখন থেকেই ভবিষ্যতের ভাব্‌না?

তা একটু ভাব্‌তে হবে বইকি! মেয়ে যখন আমার হ'য়েছে, তখন ভবিষ্যৎ ব'লে একটা বস্তুও ত তার আছে! স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে হাস্‌লো মাধুরী।

বিনয় উত্তরের ভাষা খুঁজে পেল না। প্রত্যুত্তরে সেও হাস্‌লো একটু।

*　　　*　　　*

বয়স যত বাড়ে, মনটা ততই নির্ভরশীল একটা অবলম্বনের আশায় ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে। কেদারনাথও প্রকৃতির সেই আকর্ষণকে এড়িয়ে চ'ল্‌তে পার্‌লেন না। মাধুরী কাছে থাক্‌লে, তার সংসারকে কেন্দ্র ক'রে হয়ত তিনি পাকা সংসারীর জীবন যাপন ক'র্‌তেন আমরণ! ভোগ-উপভোগে জীবনের যে আশা-আকাঙ্ক্ষাটুকু চরিতার্থ লাভ ক'রেছে, বয়সের পড়ন্তবেলায় সেই উপভোগের শক্তিটা ক্ষীণতর হ'লেও স্পর্শানুভূতিটা হ'য়েছে তীব্রতর। নাড়া চাড়া ক'রে তাই অতৃপ্ত সেই জীবন-পিপাসাকে পরিতৃপ্ত ক'রে

নেওয়ার আশায় উন্মুখ হ'য়ে বসে থাকে মানুষ জীবনের শেষ মুহূর্তটি পর্য্যন্ত।

যেখানে সেই কামনা র'য়ে যায় অপূর্ণ, সেখানেই অন্তরটা হাহাকারের আবর্ত্তে ঘুরপাক্ খেয়ে জীর্ণ হ'তে থাকে প্রতিটি পলে! ফলে, মানুষ হ'য়ে ওঠে আত্মকেন্দ্রী। হৃদয়ের অতৃপ্ত সেই কামনাকে নির্লিপ্তভাবে, গভীর উপভোগের আশায় 'ধর্ম্ম'ই হয় সেদিন তার জীবনের শেষের পাথেয়।

একদিন যার আত্মপ্রকাশে সমাজ ও সংসার ফলে-ফুলে রাঙা হ'য়ে উঠেছিল—ভোগ-উপভোগের নেশায়, অন্তরে জাগিয়েছিল সৃষ্টির প্রেরণা, সেই প্রকৃতির প্রয়োজনেই সেদিন সে ছিল বহির্মুখী—অথচ যেদিন তার সেই শক্তি হ'ল শিথিল, তার হৃদয়ের ক্ষুধা পেল না তৃপ্তির পাথেয় —সেদিনই প্রকৃতির সেই চিরন্তনী কামনা হ'ল অন্তর্মুখী। এটাই কামজ-জীবনের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি! তাই জীবনের দ্বারে, সেদিনের সেই ফেলে আসা দিনের মত, বর্ত্তমানের আত্মকেন্দ্রীভূত জীবনটাও হ'য়ে উঠ্‌লো ঠিক তেমনিতর প্রিয়। কেদারনাথ অতীতের মায়া এবং মমতাকে অতিক্রম ক'রে, আত্মতৃপ্তির উগ্র বাসনায়, সাধন-ভজনকেই ক'র্‌লেন জীবনের প্রিয়তর সাথী।

ভয় পেলেন সুচারুদেবী! ভয় পেল মাধুরী। দুর্ভাবনায় প'ড়্‌লো বিনয়। একি হ'ল? যে মানুষ, জীবনে শুধু ভোগ-উপভোগ ছাড়া অন্য কিছু কামনা করেননি, তিনি কি তবে এই ধর্ম্মের উন্মাদনায় সব কিছুই দেবেন বিকিয়ে?

জগতে কোন কিছুর ওপর নির্ভর আস্থা স্থাপন করা চলে না—সকল কিছুই পরিবর্ত্তনশীল। ভীত হ'ল মাধুরী। যদি মায়া-মমতায় বশীভূত হয়, সেই আশায় অজয়কে স'পে দিল সে কেদারনাথের কাছে।

আশা তার ব্যর্থ হ'ল না। কেদারনাথের উগ্র সেই ধর্ম্ম প্রেরণায় নাম্‌লো ভাটা—কঠোর সেই রুক্ষ মূর্ত্তির মাঝে নাম্‌লো কমনীয়তার ছায়া। পুনরায় ঠোঁটের পাতায় ফুটলো হাসির ছটা—কিন্তু অতীতের পূর্ব্বাবস্থায় আর এলেন না সহজে ফিরে।

একদিন যে শক্তি ক্ষয়ে, ক্ষণিক তৃপ্তি পেয়েছিলেন জীবনে, যার প্রেরণায় দেহমন ছিল গতিশীল, যে ভোগ-উপভোগের তৃষায় দেহের প্রতিটি শিরা উপশিরা ছিল কাতর ও উন্মুখ, হৃদয়ের প্রতিটি তন্ত্রী, যে গভীর উত্তেজনায় চরিতার্থ ক'রেছিল জীবন-ক্ষুধা, সেই দেহমন আজ অন্তর্মুখী হৃদয়ের আত্ম-কামজ-সুধায়, যে তৃপ্তি ও নিবৃত্তির পথের সন্ধান পেল, তা কি ভুল্‌তে পারেন তিনি এত সহজে? বৈষয়িক কেদারনাথ আত্মভোলা বৈরাগীর পর্য্যায়ে একেবারে নাম্‌তে না পার্‌লেও, জীবনের এই পড়ন্ত বেলায় শিথিল ও গতিহীন দেহের বোঝাটাকে ব'য়ে নিয়ে যাওয়ার এই যে শেষের পাথেয়—এ বস্তুটার আকর্ষণকে উপেক্ষায় উড়িয়ে দিতে পার্‌লেন না সহসা।

অতীতের যত কিছু প্রিয়, সব হাতছানি দিয়ে ডাক্‌লো—আয়, ফিরে আয়,—কিন্তু মন যেখানে পেয়েছে স্বস্তি, পেয়েছে শান্তি, সে বস্তুই তার কাছে প্রিয়তর বস্তুতে হ'ল রূপায়িত। হয়ত এটা নোতুনের মোহ! তবু ত প্রাণ তাঁর পেয়েছে নিজেকে প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ অবসর! তারই ক্ষুধায় তিনি ছুটেন নিরন্তর।

কেদারনাথ গৃহত্যাগী হ'লেন না, তীর্থযাত্রাও ক'র্‌লেন না। শুধু প্রাণের তৃষা মেটাবার আশায় সুরু ক'র্‌লেন হরিনাম সংকীর্ত্তন।

কিন্তু এ কাজটাকে রীতিমত সন্দেহের চোখে দেখ্‌তে সুরু ক'র্‌লেন আত্মীয়স্বজন। ব'ল্‌লেন—আহা, কি পরিবর্ত্তন! প্রতিবেশীরা কিন্তু প্রকাশ্যেই ঘোষণা ক'র্‌লেন—'আজীবন যিনি শুধু শাসন ও শোষণ ক'রে

এলেন, সহসা তাঁর পরিবর্ত্তন? আরে ছ্যাঃ! ভেক্, সব ভেক্! শুধু লোক-ঠকানোর ফন্দি—এ ছাড়া আর কি হ'তে পারে বলো? সাবধান—সব সাবধান!...

বাস্তবে কিন্তু কোন আশঙ্কাই হ'ল না পূর্ণ। জমিদার বংশের প্রতাপটা রইলো ঠিক্ তেম্‌নি—আয়-ব্যয়ের হিসাবটাও চ'ল্‌লো ন্যায়-নীতিমত। স্বার্থহানী হ'ল না কারও, স্বার্থসিদ্ধির সুযোগও এলো না সহসা। জমিদারের সেই পাকা বুনিয়াদী চাল চ'ল্‌লো তেমনি গড়িয়ে—তবে গতিটা হ'ল শুধু মন্থর।

ব্যয়ের মাত্রাটা আয়কে গেল ছাপিয়ে। পৈত্রিক সঞ্চিত অর্থ-ভাণ্ড হ'ল নিঃশেষিত—দু' একটা বিষয় সম্পত্তির ওপরও প'ড়্‌লো টান্।

সচকিত হ'লেন কেদারনাথ। জীবনের মেয়াদের স্থিরতা নেই যেখানে, সেখানে বেপরোয়া হয় তারাই—যারা হয় নির্ব্বোধ, নয় মূর্খ! সব কিছুর মধ্যে তাই দেখা গেল একটা সংযত থম্‌থমে ভাব।

খুশী হ'লেন সুচারুদেবী—খুশী হ'ল মাধুরী। আর কিছু না হোক্ জুড়ানো পোড়ানো স্বভাবটার ত হ'য়েছে পরিবর্ত্তন!...

* * * * *

চাকুরী-জীবনের প্রতি বিনয়ের নেমেছে ঘৃণা। আত্ম-বিক্রয়ের মোহমাদকতা হ'য়েছে স্তিমিত। প্রাণ এখন চায় মুক্তি। কিন্তু সে পথের দ্বার তার রুদ্ধ। সংসারের গুরু দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যের বোঝায় মেরুদণ্ড গিয়েছে বেঁকে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার অবসর তাই আজ আর তার নেই।

ছেলে, অজয়ের বয়স হ'ল প্রায় দশ। কেদারনাথের কাছে যথারীতি স্নেহ ও যত্নে লালিত পালিত হ'লেও কর্ত্তব্য তার র'য়ে গেছে সেই মত। শিক্ষার প্রতি তাকে রাখ্‌তে হ'য়েছে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি।...মনের মধ্যে দোলা খায় ক্ষীণ একটু আশা! যা এ জীবনে হয়নি পাওয়া

—তার পরিপূর্ণ রূপ দিতে হবে এই শিশুর জীবনে। যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও অর্থনৈতিক চাপে, এই জাতির মেরুদণ্ড দিনের পর দিন প'ড়্‌ছে বেঁকে, তাকে খাড়া ক'রে তুল্‌তে হ'লে—যারা জীবন-যুদ্ধে আজও নবাগত, তাদের এমন শিক্ষা ও দীক্ষায় দীক্ষিত করা চাই—যারা শুধু নিজের জীবনে নয়, জাতির জীবনের দুঃখ ও দুর্দ্দশা—মোচন ক'র্‌তে পার্‌বে অনায়াসে।···হ্যাঁ, হ্যাঁ···সেই শিক্ষাই ছেলেকে দিতে চায় সে। যদিও দেশের স্বার্থ ও ব্যক্তিগত স্বার্থের পার্থক্য অনেকখানি, তবুও ত কল্পনার চোখে মানুষ তাদের এক না ভেবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ ক'র্‌তে পারে না কোনদিন !

তার জন্যই চাই রীতিমত শিক্ষা—চাই অভিজ্ঞ শিক্ষক—চাই মাতা-পিতার সজাগ দৃষ্টি। কোন অভাবই আজ রাখ্‌তে চায় না বিনয় ! প্রতিটি বিষয়ে সুশিক্ষার আশায় তাই সে নিয়োগ ক'র্‌লো বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক।

মেয়ে, সুমিতার বয়সও হ'ল প্রায় বছর চার পাঁচ। এবার তার শিক্ষা-দীক্ষার প্রতিও লক্ষ্য রাখ্‌তে হবে। হ'লই বা সে মেয়ে ! জীবনের দায়িত্ব তারও ত কম কিছু নয় ! অন্তর-জগত তারাই ত রাখে রাঙিয়ে ! বিশেষ ক'রে মেয়ে তার পিতৃ-সোহাগী। জীবনের মূল্য তার কারও চেয়ে একবিন্দু কম কি হ'তে পারে কোনদিন ? বরং অপেক্ষাকৃত একটু বেশী ব'লেই মনে হয় বারে বার। একদিন সেই ত হবে মা ! সেই ত গ'ড়্‌বে পৃথিবীর বুকে নোতুন সংসার !

কেদারনাথের পূজা-পাঠের বাতিকটা একটু সংযত হ'লেও একেবারে সে অভ্যাসটুকু ত্যাগ আজও হ'য়ে ওঠেনি ! সকালে প্রাতঃভ্রমণ, দুপুরে দিবানিদ্রা, সন্ধ্যায় তামাকের মজ্‌লিশ—অঘোরনাথের সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথা—অবসর সময়ে অজয়নাথ ! জীবনের সাধ-আহ্লাদ

মিটিয়ে নেওয়ার পার্শ্বচর হিসাবে শোভা বর্দ্ধন ক'রে চ'লেছে সে অহোরাত্র!

কেদারনাথ এইটুকুই চান! এর বেশী আকাঙ্ক্ষা যে হৃদয়ে তাঁর নেই তা নয়, কিন্তু শিথিল তনু, অবসাদগ্রস্ত মন, ও বার্দ্ধক্যের ক্ষয়িষ্ণু শক্তি, সমস্ত কিছুকেই জীবনের দ্বারে অপ্রয়োজনীয় বস্তুতে ক'রেছে রূপায়িত। আসক্তির পরিবর্ত্তে তাই বাসা বাঁধ্‌লো জীবন্ত বৈরাগ্য।

দিন যত যায়, দেহমনও হ'য়ে পড়ে ততই দুর্ব্বল। রক্তের উষ্ণতায় নামে শীতল-হিমের পরশ। হৃদয়ে জাগে শঙ্কা,—পারের খেয়ায় ঢলে প'ড়েছে সূর্য্য। তীর দেখা যায়, কিন্তু অস্পষ্ট অন্ধকার। সেখানে, হ্যাঁ সেখানে—মাঝি একজন আছে বইকি! এটাই ত জীবনের সংস্কার! কিন্তু সেখানে জবাবদিহি দেবেন কি?

তাইতো? বসে বসে ভাবেন কেদারনাথ। পারের কড়ি ত কিছু চাই। তাই সঞ্চয়ে দিয়েছেন মন। তৃপ্তি না পেলেও অনুষ্ঠানের প্রতীক ত একটা চাই!

হাসি, ঠাট্টা, গল্প, সারাজীবন ধ'রে চ'লে এলো অনাদি অনন্তের মত, তবুও যেন শেষ ওর নেই কোনদিন। তাই নেশা তার বন্ধনহীন অসীমের মত জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অঙ্গাঙ্গিভাবে। তাই ত ও বস্তুগুলো জীবনের কাছে এত প্রিয়—এত লোভনীয়!

অজয় বলে, দাদু একটা গল্প বলো না!

গল্প? হ্যাঁ, গল্পই—বটে! জীবনের অতীত দিনগুলো গল্পের মতই সাজানো র'য়েছে থরে থরে, সুন্দর ক'রে নিপুণ শিল্পীর হাতের আঁকা চিত্র-বিচিত্র ছবিগুলোর মত। তারই ছড়া গেঁথে চলেন কেদারনাথ। ভাষার রসে ছুবিয়ে নিয়ে সতেজ ও পুষ্ট ক'রে গ'ড়ে তোলেন সেই স্মৃতি-ভ্রষ্ট অস্পষ্ট কাহিনীগুলো—দিনের পর দিন, রাতের পর রাত।

শ্রোতা অজয় শোনে গভীর মনোযোগ দিয়ে। কেদারনাথ খুশী হন মনে মনে। এমনি নিবিড় ক'রে শোনার লোকই ত মন চায় যুগ যুগ ধরে। এটাই ত পুরুষ-জীবনের নেশা।...

* * *

সুচারুদেবীর বয়সেও নেমেছে অপরাহ্নের ছায়া। গাম্ভীর্যে ভরপূর জীবনের মান। কিন্তু অম্লান নারী-প্রকৃতির সহজাত সেই ক্ষুধা। আজও ভুল্‌তে পারেননি, নিজের হাতে গড়া এই সংসারের মায়া, সেই ছোট শিশুর হাসিকান্না—আর তার চির-চঞ্চল-প্রকৃতির অফুরন্ত দুরন্তপনা—সঙ্গে তার পাল্লা দিয়ে চলা, শিশু হ'য়ে তারই সঙ্গে আপন মনে খেলা—কচি মুখের হাসির ফাঁকে আপন-মনে-কওয়া দু'টো কথা, আর বুকের মাঝে নিবিড় ক'রে আপনরূপে পাওয়া—না, না—এ তৃষা কি নারী জীবনে ভুল্‌তে পারে কোনদিন? এ রূপ নিজের চোখে না দেখ্‌লে—তার সঙ্গে গভীর ক'রে পরিচিত না হ'লে মেটে কি কভু জীবন-তৃষা?

না—না—না, এর শেষ নেই। এও অনাদি অনন্তের মতই চির সবুজ, চির প্রবাহমানা। এরই তৃষায় নারীর জন্ম, এরই ভাষার রূপই হয় তার জীবন-সাধনা। তাই ত আদরে, আহ্লাদে, স্নেহে, যত্নে, মমতায়, উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠেন তিনি প্রতিটি মুহূর্ত্তে।

মাধুরী চলে গেছে। তাঁর জীবনপ্রান্ত থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেছে দূরে, তার নিজেরই প্রয়োজনে। এ প্রয়োজন প্রতিটি মানুষের দ্বারে আসে, সেটা আস্‌বেই। এটাই ত প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য! কিন্তু ফিরিয়ে দিয়েছে সে তার অন্তরের নিধি, তার জীবনের প্রতিবিম্ব। তাই ক্ষণিকের সেই ক্ষুব্ধ হৃদয়, নোতুন ক'রে পেয়েছে নিজেকে প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ অবসর। তারই গানে, তারই পুলকে

সুচারুদেবীর হৃদয় হ'য়েছে ভরপুর। তিনি ভুলেছেন নিজেকে। কুড়িয়ে ফিরে পেয়েছেন তাঁর সেই অতীত জীবন। ঠিক তেমনি হাসি-তামাসায় মুখর হ'য়ে উঠেছে তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত।

অজয় অবোধ বালক। তার চঞ্চল প্রকৃতির সঙ্গে সমান তালে পাল্লা দিয়ে চলেন সুচারুদেবী। কখনও শাসন করেন, কখনও বা আদরে বুকের কাছে টেনে নিয়ে তারই সুরে সুর মিলিয়ে আপন মনে খেলেন ছেলে-খেলা। কখনও হাসেন, কখনও বা কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করেন, আবার কখনও বা ভালমন্দ বোঝানোর চেষ্টা করেন—ছিঃ, এটা ক'র্‌তে নেই ভাই!

বালক কিন্তু দুর্জ্জেয় দুর্ব্বার। হার তাঁকে স্বীকার ক'র্‌তেই হয় প্রতিবার। তাতেই কিন্তু হৃদয় পায় স্বস্তি, মন খুঁজে পায় তৃপ্তির অবকাশ। হয়ত প্রকৃতির সহজাত রূপই এই। তাই তার সঙ্গে ঘুরেফিরে দিনটা যে তাঁর কেমন করে কেটে যায়, সে দিকে দৃষ্টি ফেরানোর অবসর তিনি খুঁজে পান না কোনদিন।...

* * *

ছোট বেলায় মাছ ধরার সখ ছিল বিনয়ের। মাঝে তা স্তিমিত হ'য়েছিল। আবার নোতুন করে সেই সখের বোঝাটা চাপিয়ে দিয়েছে বন্ধু-বান্ধবের দল। এখন আর নিস্তার নেই। ছুটি হ'লেই মাল-মশ্‌লা আর হুইল কাঁধে নিয়ে ছুটে কোন এক পাশাপাশি গ্রামে। প্রতীক্ষায় কেটে যায় সারাদিন। কখনও ভাগ্যে জুটে দু একটা রুই কিংবা মিরগেল—আধসের, নয় তিন পোয়া, কোনদিন বা তাও জুটে না। তবু ও এ নেশা তার ছুটে না।

মাধুরী কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ ক'র্‌লো। ব'ল্‌লো, পূর্ব্বে এ রোগ ত তোমার ছিল না!

বিনয় হাস্‌লো। বলে, ওটা কিছু নয়! ছুদিনের সখ—ছুদিন পরেই—

কথার মাঝে ঝঁপিয়ে প'ড়্‌লো মাধুরী, প্রতি সপ্তাহেই ত বলো শুধু এই সপ্তাহটা! সত্যি ক'রে বলতো এই নেশা-ভূত ঘাড় থেকে তোমার নাম্‌ছে কবে? খরচার কথাটা না হয় ছেড়েই দিলাম কিন্তু ধৈর্য্যও ত তোমার কম নয়! রোদ নেই, বৃষ্টি নেই, ঝড় নেই, ঝঞ্ঝা নেই—যেতেই হ'বে! ঠাট্টা নয়, সত্যি ব'ল্‌ছি—এ নেশা হয় ছাড়ো, না হয়—

আচ্ছা, আচ্ছা—তোমার কথাই থাক্‌বে। আজ ত একটিবার ঘুরে আস্‌তে দাও—পরের কথা না হয় পরেই ভাবা যাবে!

মাধুরী উত্তর দিল না। গম্ভীর মুখে কাজের অছিলায় পাশের ঘরে গেল চলে।

বিনয় ব'ল্‌লো, যাওয়ার সময় রুখে দাঁড়ালে চ'ল্‌বে কেন? তোড়-জোড় যখন ক'র্‌লাম, তখন ত ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে দেখ্‌লে আর মিচ্‌কি মিচ্‌কি হাস্‌লে—

ক্রোধে জ্ব'লে উঠ্‌লো মাধুরী। পাশের ঘর থেকেই উত্তর দিল, হেসেছি, বেশ ক'রেছি। যাওয়া তোমার হবে না!

হবে না ব'ল্‌লেই হ'ল! ওপাশে ওরা এসে বসে থাক্‌বে সারাদিন। ভেবে দেখো, নিজেই একটু স্থিরচিত্তে ভেবে দেখো—কাল অফিসে গেলে, আমার অবস্থাটা কিরূপ দাঁড়াবে? সুস্থির হ'য়ে বসে কাজ ক'র্‌তে দেবে এক মিনিট?

না দেয়, না দেবে। আমি ক'র্‌বো কি? যাওয়া আজ হ'বে না, না, না—ব'লে রাখ্‌ছি আমি।

নিঃশব্দে খাওয়া শেষ হ'ল, নীরবে কেটেও গেল কয়েক মিনিট, অবশেষে পালঙ্কে আশ্রয় নিল মাধুরী। বিনয় কিন্তু অচল অটল। বসে বসে সিগারেট টানে আর ধোঁয়া ছাড়ে। কুণ্ডলী পাকিয়ে

ধোঁয়াগুলো শূন্যে যায় মিলিয়ে। ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে দেখে সেই দৃশ্য। মাঝে মাঝে চিত্ত চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। এপাশ ওপাশ ঘুরে ফিরে দেখে আর বিরক্তিবোধ ক'রে মনে-প্রাণে!

মাধুরী তার অসহায় অবস্থা লক্ষ্য ক'রে মিচ্কি মিচ্কি হাসে, আর কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের আবরণে নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা ক'রে চলে।

ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বেজে গেল। আর স্থির থাকতে পারলো না বিনয়। উঠে দাঁড়ালো নিরুপায়ে। জানালার সাম্নে এগিয়ে গিয়ে, কয়েক মিনিট স্থির হ'য়ে দেখ্লো মেঘের খেলা। তারপর সেই অস্থিরতা। না—হার তাকে স্বীকার ক'র্তেই হ'ল! পিছন ফিরে মাধুরীর মুখের দিকে তাকিয়ে ব'ল্লো, একটিবার ঘুরে আসি না মাধু!

মাধুরী নীরব।

পুনরায় বিনয় ব'ল্লো, অত টাকার মাল-মশ্লা কিন্লাম, সব নষ্ট হ'য়ে যাবে! তা না হয় যাক্ কিন্তু তাদের যে, যাবো ব'লে কথা দিয়েছিলাম—সেটার মূল্যও ত রাখা উচিত!

তথাপি মাধুরী নীরব।

সাহস ভরে একটু কাছে এগিয়ে কাতরকণ্ঠে ব'ল্লো, ঘুমিয়ে প'ড়্লে না কি?

কৃত্রিম ক্রোধে উঠে ব'স্লো মাধুরী। ব'ল্লো, ভাগ্যে থাক্লে ত হবে!

আহা রাগ করো কেন? ব'লছিলাম, ঘুরেই আসি না একটু!

আমি কি বাধা দিয়েছি? উঠে দাঁড়ালো মাধুরী। ঝাঁঝালো সুরে ব'ল্লো—কথার দাম সবারই এক, বুঝ্লে! যাই একবার দেখি মেয়েটা আবার গেল কোথায়? একটু সুস্থির হ'য়ে যে বিশ্রাম নেবো, সে সৌভাগ্য ত ক'রে আসিনি—হায়রে পোড়াকপাল!

মাধুরী হন্তদন্ত হ'য়েই বেরিয়ে গেল। উগ্র কণ্ঠের ঝঙ্কার ভেসে উঠ্‌লো পর মুহূর্ত্তে, সুমি, এই সুমি—কোথায় গেলি পড়ারমুখী মেয়ে! সারা দুপুর শুধু হৈ-হৈ-রৈ-রৈ আর সন্ধ্যা হ'লেই ঘুম!—না আর পারি না এই লক্ষীছাড়া মেয়েটাকে নিয়ে—

এই ত খেল্‌ছি মা! কোমল কণ্ঠস্বর ভেসে উঠ্‌লো তার ফাঁকে।

কেবল খেলা আর খেলা—চল্ একটু ঘুমিয়ে নিবি চল্! প্রায় হিড়্ হিড়্ ক'রে টেনে নিয়ে ঘরে ফিরে এলো মাধুরী। পিঠে তার সবলে দু'টো কিল্ বসিয়ে পালঙ্কের উপর টেনে তুলে ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌লো, হাড় মাস্ আমার জ্বালিয়ে খেলে! নে চুপ ক'রে শো।

নিরপরাধা সুমিতা বোঝে না তার অপরাধ কোথায়! ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

মাধুরী তেমনি গম্ভীর কণ্ঠে বলে, ফের যদি ফোঁস্ ফোঁস্ ক'রেছিস্ ত এমন মার দেবো যে সাতদিন বিছানায় শুয়ে থাকৃতে হবে! ভালোয় ভালোয় চুপ করে ঘুমো ব'ল্‌ছি এখনও! বয়স যত বাড়্‌ছে, মেয়ের ধিঙ্গীপনাও বাড়্‌ছে সেই সঙ্গে। যতসব হতচ্ছাড়া কাণ্ড—দুচোখের বিষ! একটু থেমে ব'ল্‌লো, নে চুপ ক'রে ঘুমো। পর মুহূর্ত্তেই সস্নেহে আঁচলে চোখের পাতাগুলো মুছে দিয়ে নিজেও শুয়ে প'ড়্‌লো তার পাশে।

বিনয় নির্ব্বাক দর্শকের মত চেয়ে চেয়ে শুধু দেখ্‌লো। বলার কিছুই তার নেই। বিচিত্র এই সংসার—আরও বিচিত্র তার জীবনযাত্রা প্রণালী। হাসি-কান্নার তাই স্থিরতা নেই কোনদিন! বিচারের আড়ম্বর থাকৃলেও বিবেকের ঠাঁই নেই কোনকালে!...

স্বামীর উপর অভিমান ক'রেই মাধুরী সুমিতাকে অকারণ শাসন ক'র্‌লো—নির্ম্মম হৃদয়হীনের মত, কিন্তু মনে সে স্বস্তি ফিরে পেল না

এতটুকু। একটা জ্বালা বিদূরণের আশায়, আর একটা অন্যায়কে মানুষ এমনি প্রশ্রয় দিয়ে ক্ষণিক নিজেকে ভুলে থাকার অবসর পায় সত্য, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সেই অন্যায়টা বিবেকের দ্বারে, অন্যায় রূপে হয় প্রতিভাত, সেই মুহূর্ত্তেই অন্তরটা তার হ'য়ে ওঠে ব্যাকুল।

মাধুরী জানে, স্বামীকে তার ঘরে রুদ্ধ ক'রে রাখা যাবে না—তাই—শিশুকে অকারণ নির্য্যাতন ক'রে মনের ক্ষোভ সে মেটাতে চেয়েছিল, কিন্তু তার সেই অসহায় কচি মুখের দিকে তাকিয়ে হৃদয়খানা তার পরমুহূর্ত্তেই মমতায় ভরপূর হ'য়ে উঠ্‌লো। তাই, বুকের মধ্যে তাকে চেপে হৃদয়ের সেই রিক্ততার হাহাকারটাকে স্নেহরসে সিক্ত ক'রে নেওয়ার আশায় সে ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌লো। আদরে গণ্ডে তার চুমো খেয়ে, কপালে উড়ে আসা চুলগুলো ঠিক মত বিন্যস্ত ক'র্‌তে ক'র্‌তে ব'ল্‌লো, কেন দুষ্টুমি ক'রিস্ বল্‌তো ? চুপ ক'রে এখন একটু ঘুমিয়ে নে, বিকেলে বড় একটা পুতুল কিনে দেবো !

সুমিতা তবুও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

মাধুরী আদরে মেয়েকে কণ্ঠলগ্ন ক'রে মৃদু কণ্ঠে বলে—ছিঃ, কাঁদ্‌তে নেই ! বিকেলে তোর দাদা আস্‌বে, তার সঙ্গে কত খেল্‌বি—কত পুতুল নিয়ে আস্‌বে তোর জন্যে !

সুমিতা উত্তর দেয় না। কচি দুই বাহুর আবেষ্টনে মার গলদেশ আকর্ষণ ক'রে শুয়ে থাকে নীরবে।

* * *

বেলা প্রায় একটা। বিনয় মাধুরীকে ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে তুল্‌লো। ব'ল্‌লো—সময় যে কাটে না, একটু ঘুরে আসি না !

মাধুরী তার ম্লান মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাস্‌লো। ব'ল্‌লো—বাধা ত আমি দিইনি।

বিপদ ত সেইখানেই ! কিছু ব'ল্‌লে না হয় উপহাস্তে উড়িয়ে দিতাম, কিন্তু কিছু যে বলো না—ভয় ত সেখানেই !

তাই নাকি ? পুনরায় মৃদু হাস্‌লো মাধুরী।

সত্যি ব'ল্‌ছি !—যাবো ?

এখন যেয়ে তাড়াতাড়ি ফির্‌তে পার্‌বে কি ? অজয়ের আসার কথা আছে। তা'ছাড়া মা ওবাড়ীতে ডেকে পাঠিয়েছিলেন—যাবে না একটিবার ?

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বিনয় ব'ল্‌লো—এখন আর সখ মেটাতে যাওয়ার সময় নেই। তবুও যাই একবার অভয়বাবুর ওখানে ! ব'লে, আসি, নইলে—একটু থেমে সহাস্যে বিনয় ব'ল্‌লো—দোষটা সম্পূর্ণ তোমার ঘাড়েই চাপ্‌বে। একটু গম্ভীর হ'য়ে ওঠার ব্যর্থ চেষ্টা ক'র্‌লো কিন্তু হাসি চাপা গেল না। সহাস্যে ব'ল্‌লো—অবশ্য কথাটা মিথ্যে নয়—অথচ পাঁচজনের কাছে ত তোমাকে ছোট ক'র্‌তে পারি না ! তাতে একটু লাগে বইকি !

তবু ভাল ! মাধুরীও মৃদু হাস্‌লো। ব'ল্‌লো—তাড়াতাড়ি ফিরে এসো কিন্তু—বুঝ্‌লে !

বিনয় মাথাটা দুলিয়ে বেরিয়ে গেল হন্ হন্ ক'রে।

তন্দ্রা টুটে গেছে কিন্তু আমেজ তখনও কাটেনি সম্পূর্ণ। নিদ্রামগ্ন সুমিতার কপালে জমে উঠেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। সযত্নে আঁচল দিয়ে সেটুকু মুছে চোখের পাতা পুনরায় বোজালো মাধুরী।

কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই কড়া নাড়ানোর তীব্র খট্ খট্ শব্দে শয্যার মায়া ত্যাগ ক'রে নীচে নেমে এলো মাধুরী। অজয়কে দেখেই খুশীতে মনটা তার ভরে উঠ্‌লো। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই হৃদয়ে একটা শঙ্কা উঁকি দিয়ে গেল। জিজ্ঞাসা ক'র্‌লো—কিরে, তুই যে একা ! দাদু এলো না ?

দাদুর শরীরটা তেমন ভাল নেই তাই বেহারীর সঙ্গে এলাম। দাদু তোমায় একবার যেতে ব'লেছে মা—হাসিমুখে উত্তর দিল অজয়!

সভয়ে বেহারীর মুখের দিকে তাকাতেই সে ব'লে উঠ্‌লো—ভয়ের কিছু নেই দিদিমণি! বয়স হ'য়েছে, তাই মাঝে মাঝে শরীর একটু খারাপ হয় আর কি! কাল ত ছোটবাবুর ইস্কুলের ছুটি—এখানে আজ থাক্‌বে, না আস্‌বো আবার রাত্রে?

তোমায় আর কষ্ট ক'র্‌তে হবে না বেহারী। বাবু এলে, আমি ত একবার বাবাকে দেখ্‌তে যাবোই! যদি থাকে আর যাবে না—নইলে আমাদের সঙ্গেই ও ফিরে যাবে! অজয়কে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লো—কি বলিস্‌রে? তুই থাক্‌বি না যাবি?

অজয় ব'ল্‌লো—আমার কাল, পরশু, তরশু তিনদিন ছুটি আছে। দাদিকে তুমি বরং ব'লেই দাও না—দুদিন পরে আমি ফিরে যাবো।

বেশ ত! আদরে কোলের কাছে অজয়কে টেনে নিয়ে মাধুরী ব'ল্‌লো—তোমায় কিছু ব'ল্‌তে হবে না বেহারী। আমি ত সন্ধ্যায় যাচ্ছি, তখন যা বলার তাই ব'লে আস্‌বো। তা—তুমি একটু ব'স্‌বে না বেহারী? এতখানি পথ এলে, এখুনিই চলে যাবে?

বেহারী খৈনী টিপ্‌তে টিপ্‌তে ব'ল্‌লো—এইটুকু ত পথ—এর আর কষ্ট কি দিদিমণি? আমি বরং এখন যাই। বাবুর কখন কি দরকার হয় কে জানে?

বাবুর বুঝি শরীর খুব খারাপ বেহারী? বাইরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ভেতরে এসে বসো।

খারাপ আর কি দিদিমণি! টুলটার ওপর চেপে ব'সে বেহারী ব'ল্‌লো—বাবুর ত মনের ঠিক নেই। এই বলেই এই ভুলে যান! ছোটবাবু এই ত এখানে এলো—এর পর কতবার যে খোঁজ্‌ প'ড়্‌বে কে জানে? ইস্কুল গেল, বাবু বসে বসে নিজের চোখেই দেখ্‌লেন—তবুও বার

বার জিজ্ঞাসা ক'র্বেন—তোমার ছোটবাবু কোথায় বেহারী? যত বলি—বাবু, তিনি ত ইস্কুলে গেছে। ততবারই বলেন, ভুলে যাই বার বার। কেন এমন হয় বল্‌তো বেহারী? কিছুতেই কোন কথা আর মনে থাকে না। একটু থেমে ব'ল্‌লো—এই ত এখানে এসেছি, এরই মধ্যে হয়ত মাজীকে জিজ্ঞাসা সুরু ক'রে দিয়েছেন—হাঁগা, বেহারী কোথায় গেল বলতো? হয়ত ধম্‌কাচ্ছেন, বেটাচ্ছেলে আজকাল বড় ফাঁকিবাজ হ'য়েছে। তামাক সেজে দেওয়ার ভয়ে নিশ্চয় কোথাও পালিয়েছে। মৃদু একটু হেসে ব'ল্‌লো, কোথাও কি এতটুকু স্থির হ'য়ে বসে, দুটো কথা কইবার সময় আমার আছে দিনিমণি? উঠে দাঁড়ালো বেহারী। ব'ল্‌লো—তাহ'লে এখন আমি যাচ্ছি।

মাধুরী উত্তর দিল না, মাথা দোলালো শুধু।··

* * *

বেহারী চলে গেল কিন্তু মাধুরীর দুর্ভাবনার শেষ রইলো না। তা হ'লে বাবার শরীরটা সত্যই খুব খারাপ হ'য়েছে, নইলে স্মৃতিশক্তিই বা এত ক্ষীণ হ'য়ে এলো কেন? অথচ ওরা একথা কিছুতেই স্বীকার ক'র্বে না।·না! তারও আর স্থির হ'য়ে ব'সে থাকা উচিত হবে না। কিন্তু এই সংসার ছেড়েই বা সে যায় কেমন ক'রে? কোথাও কি সুস্থ চিত্তে পা বাড়ানোর উপায় তার আছে?

অজয়কে কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লো—হাঁারে, দাদুকে কেমন দেখে এলি?

কেন? ভালই ত! বসে বসে তামাক খাচ্ছেন দেখে এলাম। সহজ কণ্ঠে উত্তর দিল অজয়।

কোন জ্বর জ্বালা হয়নি ত? পুনরায় জিজ্ঞাসা ক'র্‌লো মাধুরী।

বারে ! জ্বর হ'লে বুঝি কেউ ভাত খায় ? একসঙ্গে বসেই ত আমরা খেলাম। দাদি আমার পাতে মাছের মুড়ো দেয়নি ব'লে দাদু কি ঝগ্‌ড়াই না ক'র্‌লেন। অজয়ের চোখ-মুখ বন্য আনন্দে মুখর হ'য়ে উঠ্‌লো। ব'ল্‌লো – দাদু আমায় খুব ভালবাসে কিনা !

আর দাদি ? সহজ হাস্যে প্রশ্ন তোলে মাধুরী।

দাদিও বাসে—খুবই ভালবাসে। কিন্তু দাদু আর আমি পাশা-পাশি খেতে ব'স্‌লেই দাদি দাদুকে একটু বেশী ক'রে দেন ! খুশীতে অজয়ের মুখখানা লাল হ'য়ে উঠ্‌লো। ব'ল্‌লে—ফলে আমারই লাভ হয় ষোল আনা। দাদু সব তুলে দেন আমার পাতে। বলেন, এইত খাওয়ার বয়স—বসে বসে খা ভাই ! কিন্তু অত কি খাওয়া যায় ? বলি—আর পার্‌ছিনে দাদু ! দাদু কি বলেন জানো ? বলেন—কি রকম ছেলেরে তুই ? খেতে পারিস্‌নে ? তোদের মত বয়সে আমরা খেতাম হাঁসের মত। না খেলে কি শরীর ফুলে ? না খেয়ে খেয়েই ত তোর চেহারাটা এমন রোগা ডিগ ডিগে হ'য়ে গেছে ! আচ্ছা মা, তুমিই বলো ত—আমি কি রোগা ডিগ্‌ডিগে ?

মাধুরী হাসে। বলে—না এরই মধ্যে তুই পালোয়ান সিং হ'য়ে উঠেছিস !

মনঃক্ষুণ্ণ হ'য়ে প'ড়্‌লো অজয়। ব'ল্‌লো, তোমাদের সকলের মুখে সেই এক কথা। কিন্তু জানো মা, আমাদের স্কুলে কেউ আমার সঙ্গে পারে না। শুধু দুটো ঘুষি—ব্যাস্ সব কুপোকাৎ ! দেখ্‌লে, সবাই ভয়ে পালায়। হেডমাষ্টারম'শায় কি বলেন, জানো ? বলেন—কালে, এটা একটা ছেলের মত ছেলে হবে বটে !

মাধুরীর হৃদয় খুশীতে ভরপুর হ'য়ে ওঠে। আদরে ছেলেকে কোলের কাছে টেনে নেয়। বলে, মুখটা শুকিয়ে এতটুকু হ'য়ে গেছে ! চল কিছু মুখে দিয়ে নিবি ততক্ষণ !...

সন্ধ্যা প্রায় হয় হয়, অজয় ও সুমিতা দুই ভাই-বোনে মিলে খেল্‌ছে চোর চোর। এমন সময় বিনয় সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো। সঙ্গে তাঁর একটি বছর আট ন'য়েকের ছেলে। চুলগুলো জটপাকানো রুক্ষ, গায়ে ছেঁড়া একটা জামা। ময়লার ছোপ্‌ লেগে আছে সারা অঙ্গে। কাপড়টা শতছিন্ন ও তালি দেওয়া। মুখ্‌টা শুকিয়ে এতটুকু হ'য়ে গেছে। বোধ হয় সারাদিন আহার জোটেনি তার ভাগ্যে।

অজয় বিনয়কে দেখে মুখর হ'য়ে উঠ্‌লো—এতক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে বাবা? কিন্তু পরমুহূর্ত্তে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা ক'রে উঠ্‌লো, সঙ্গে তোমার ও আবার কে?

বিনয় একটু মৃদু হাস্‌লো। ব'ল্‌লো—যদি বলি, তোমাদের খেলার একজন সাথী!

উৎসাহ ভরপূর অজয়ের মুখখানা চকিতে ম্লান হ'য়ে গেল। অবজ্ঞাভরে মাথাটা দুলিয়ে ব'ল্‌লো, অমন সাথী আমরা চাই না! সুমিতাকে উপলক্ষ্য ক'রে আরও একটু জোর দিয়ে ব'লে উঠ্‌লো—ভিখারী-ছেলের সঙ্গে মানুষ বুঝি খেলে? আমরা কি ভিখারী? কি কিরে সুমি? তুই ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ ক'রে তাকিয়ে দেখ্‌ছিস্‌ কি? আয়—আয়, এবার আমি চোর—তুই লুকোবি, বুঝ্‌লি!

সুমিতার কিন্তু খেলায় মন বসে না। বাবার কাছে এগিয়ে গিয়ে জানু দুটো জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লো, কে বাবা?

একটি অসহায় ছেলে মা! রাস্তায় কুড়িয়ে পেলাম!

বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল মাধুরী। কথা ক'টা কানে যেতেই হেসে উঠ্‌লো নিজের মনে। অবশ্য একটু পূর্ব্বেও ক্রোধে, অভিমানে সারা শরীরটা তার রি-রি ক'র্‌ছিল—কিন্তু যে লোক শিশু-প্রকৃতির, তার সঙ্গে কলহ করা বা না করা একই কথা—কোন মূল্য তার নেই। দুটো কড়া কথা শোনালেও সে হাস্‌বে, আবার অভিযোগ ক'র্‌লেও সহজ

কণ্ঠে নিজের ত্রুটি স্বীকার ক'রে নেবে—এই একটু দেরী হ'য়ে গেল! সুতরাং গম্ভীর হ'য়ে থাকা ছাড়া অন্য উপায়ও তার নেই! কিন্তু বাপ-মেয়ের কথা শুনে নীরব থাকা তার পক্ষে সম্ভব হ'ল না। ব'লে উঠ্‌লো—যেমন বাপ্‌ তেম্‌নি মেয়ে। উভয়েই সমান অভিজ্ঞ, সমান মনোজ্ঞ! কিন্তু কি ব'লে গিয়েছিলে স্মরণ আছে কি?

স্মরণ যদি না থাক্‌বে ত এতখানি পথ হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটেই বা এলাম কেন?

মাধুরী মৃদু হাস্‌লো। ব'ল্‌লো—অধীনের প্রতি তা'হলে করুণা দেখ্‌ছি তোমার অনেকখানি! কিন্তু সঙ্গে ওটি আবার কে?

হাঁপ্‌ ছেড়ে বাঁচ্‌লো বিনয়। ব'লে উঠ্‌লো—একটিবার নেমে এসেই দেখনা!

অজয় ব'লে উঠ্‌লো—কোথা থেকে একটা ভিখিরীকে ধ'রে নিয়ে এসেছে মা।

ভিখিরী? কুতূহল বাড়ে মাধুরীর। নীচে নেমে এসে, সুইচটা অন্ করে দিয়ে সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো। জিজ্ঞাসা ক'র্‌লো, একে আবার কোথায় পেলে?

বিনয় ব'ল্‌লো, রাস্তায় কুড়িয়ে পেলাম! বড় গরীব—সারাদিন কিছু খায়নি। মুখ্‌খানা দেখে মনটা কেঁদে উঠ্‌লো। ভাব্‌লাম, বাড়ীতে তোমরা ত একা থাকো—একটা লোকেরও ত দরকার হয় মাঝে মাঝে! তা ছাড়া একটু টেনে ব'ল্‌লো বিনয়—সত্যকার ভিখারী হয়ত ও নয়। অভয়বাবুর সঙ্গে দেখা ক'রে ফির্‌ছি, সহসা ছেলেটা পথ রোধ ক'রে দাঁড়ালো। ব'ল্‌লো—আমায় একটা কাজ দেবেন বাবু! ওইটুকু ছেলে—বয়সে হয়ত অজয়ের চেয়ে দু'এক বছরের বড় কিংবা ছোটও হ'তে পারে। এ সময়ে ছেলেরা খেলা-ধূলা ক'রেই বেড়ায়—অথচ এ ছেলেটা চায় কি না কাজ! বিস্ময়বোধ হ'ল। পকেট থেকে দুটো পয়সা

বার ক'রে ওর হাতে গুঁজে দিলাম। ব'ল্লাম—নে পথ ছাড়্। ছেলেটা কেঁদে ফেল্লো। ব'ল্লো, ভিক্ষে ত চাইনি বাবু!

মনে মনে বিরক্তি বোধ ক'র্লাম—বড় ডেফো ছেলে ত! ব'ল্লাম, এ ছাড়া—তুই কি কাজ ক'র্তে পার্বি শুনি?

ব'ল্লো—যা দেবেন!

জিজ্ঞাসা ক'র্লাম—ঘর ঝাঁট্ দিতে কিংবা বাসন মাজ্তে পার্বি?

ছল ছল চোখে মুখ তুলে তাকালো। মাথা তুলিয়ে ব'ল্লো—পার্বো! তু'টো খেতে দেবেন ত?

অন্তরাত্মাটা আমার ছ্যাঁৎ ক'রে উঠ্লো। ক্ষুধার তাড়নায় মানুষ কি না করে? কি না পারে? বয়স হয়ত খুবই কচি, কিন্তু রূঢ় বাস্তব জগতের সঙ্গে যার ঘটেছে গভীর পরিচয়, সেই বোঝে গুরুত্ব জীবনে কার কত বেশী! হয়ত সে অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ ক'রেছে জীবনে। তাই চোখে ওর জল। তবুও জিজ্ঞাসা ক'র্লাম—পার্বি সব কাজ ক'র্তে?

মাথা তুলিয়ে ধীর কণ্ঠে জবাব দিল—পার্বো। এতদিন সব কাজই ত ক'রে এলাম।

সব কাজ?

ও নির্লিপ্ত কণ্ঠে ব'লে গেল—হ্যাঁ বাবু! সব কাজই আমি জানি। বাবা আমার খুব ছোট বয়সে মারা গিয়েছিলেন। সংসারে আমরা ছিলাম তুটিমাত্র প্রাণী। মা আর আমি। বছর তুই হ'ল, তিনিও চ'লে গেছেন।

একটু থেমে সজল কণ্ঠে ব'ল্লো, হঠাৎ মা জ্বরে প'ড়ে গেলেন—উত্থানশক্তি একেবারে রহিত। তখন ত আমি ছিলাম আরও অনেক ছোট। সব কাজ কিন্তু ক'রেছি একা। ঘর ঝেড়েছি, মুছেছি,

স্নাতা দিয়েছি, আবার মার সাবু-বার্লিও ক'রে দিয়েছি। তারপর—বেচারা নিজেকে আর ধ'রে রাখ্‌তে পার্‌লো না—কান্নায় ফেটে প'ড়্‌লো একেবারে। ব'ল্‌লো—তবুও মা আমার বাঁচ্‌লো না বাবু! মামা এসে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলেন তাঁর বাসায়। এতদিন সেখানেই ত ছিলাম!

তবে পালিয়ে এলি কেন? সহানুভূতিপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লাম।

গরু দেখা, গাছে জল দেওয়া, মামাতো ভাইবোনেদের নিয়ে ঘুরে বেড়ানো, আরও কত কাজ আমায় ক'র্‌তে হ'তো, তবুও মামীমা—কথাটা অসমাপ্ত রেখে থম্‌কে দাঁড়ালো।

বিস্ময় বাড়্‌লো। জিজ্ঞাসা ক'র্‌লাম—মামীমা ক'র্‌লেন কি?

বড় বেশী মারেন। এই দেখুন না, পিঠে কত দাগ প'ড়ে আছে! মামা অবশ্য ভালবাসেন, কিন্তু তিনি ত সব সময় ঘরে থাকেন না! শুধু কি মার—খাওয়াও বন্ধ ক'রে দেন। আজ দুদিন—

থেমে গেল মাঝপথে। হয়ত সে কোন কথাই ব'ল্‌তো না কারও কাছে। সহানুভূতির পরশে ব্যথাহত ক্ষুব্ধ মনের দ্বার তার মুক্ত হ'য়ে গেছে। তবুও মুখফুটে সে ব'ল্‌তে পার্‌লো না—মামীমা তাকে খেতে দেয়নি দু'দিন! মনটা সমবেদনায় পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌লো। তাই নিয়ে এলাম সঙ্গে করে। কিছু থাকে ত দাও না দুমুঠো ওকে খেতে!

মাধুরীর হৃদয় সমবেদনায় বিচলিত হ'য়ে উঠেছিল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ব'ল্‌লো - হ্যাঁ দিই! কিন্তু আশ্চর্য্য হই, নিজে মা হ'য়ে মাতৃহারা ছেলের প্রতি এমন অমানুষ ব্যবহার মেয়েরা করে কেমন ক'রে?

বিনয় উত্তরে মৃদু হাস্‌লো। ব'ল্‌লো—মানুষে মানুষে পার্থক্য ত এখানেই।..

মাধুরী ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে উপরে উঠে গেল। সুমিতা বাবার

হাতখানা আকর্ষণ ক'রে ব'লে উঠ্‌লো—ওরা বড় দুঃখী, না বাবা ?

আদরে মেয়েকে কোলে তুলে নিয়ে বিনয় ব'ল্‌লো—হ্যাঁ, মা !

অজয়ের কিন্তু ছেলেটিকে ভাল লাগে না এতটুকুও। অকারণ ঈর্ষায় হৃদয়খানা তার উদ্বেলিত হ'য়ে উঠ্‌লো। ব'ল্‌লো, দুঃখী না ছাই ! রাস্তায় অমন কত ছেলে ঘুরেফিরে বেড়ায়—তারা কি তবে সবাই দুঃখী ?

সুমিতা বলে—দুঃখী ব'লেই ত রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায় ! না বাবা ?

আদরে চিবুকে তার দোলা দিয়ে বিনয় বলে—হ্যাঁ মা ! তারা আমাদের চেয়েও দুঃখী ! তাই ত ঘুরে ফিরে বেড়ায়—ভিক্ষে চায় ! কেউ দেয়, আবার কেউ দেয় না।

অজয় ব'ল্‌লো—দুঃখী না ছাই ! দু' ফোঁটা চোখের জল ফেল্‌লেই ত সহজে পয়সা পাওয়া যায় ! দেখোনি বাবা—কত ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে, পথেঘাটে ভিক্ষে চায়—আর সেই পয়সায় বিড়ি সিগারেট কিনে খায়। দাদু বলেন—ওদের দয়া দেখানো মহাপাপ ! ভিক্ষে দেওয়া উচিত নয় একেবারে। আমি কিন্তু ওদের দেখ্‌লেই মাথায় জোরে একটা ক'রে গাঁট্টা বসিয়ে দিই। কেউ চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠে, আবার কেউ বা ভয়ে পালায় সে পথ থেকে ! কি মজা—কি মজা—আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠি সকলে।

সুমিতা ব'লে উঠলো সেই মুহূর্ত্তে, দেখ্‌ছো বাবা—দাদা কি দুষ্টু ছেলে !

বিনয় উত্তরে গম্ভীর হ'য়ে উঠ্‌লো। ব'ল্‌লো, ছিঃ এমন কাজ আর কখনও ক'রো না অজয় ! ওরা দুঃখী ব'লেই ত ঘর ছেড়ে পথে নেমেছে। উচিত ওদের প্রতি সহানুভূতি দেখানো। যদি না পারো ক্ষতি নেই, কিন্তু ওদের উপহাস বা নির্য্যাতন করা অনুচিত, বুঝ্‌লে !

অজয়ের মুখখানা ভার হ'য়ে উঠ্‌লো। উত্তর সে দিল না, শুধু আড়্‌চোখে একবার দেখে নিল সুমিতার মুখখানা। সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ওই নবাগত ছেলেটির প্রতি তার সমস্ত ক্রোধ কেন্দ্রীভূত হ'য়ে উঠ্‌লো। তার জন্তই ত অকারণে বাবার কাছে ধমক খেল সে! এর প্রতিশোধ একদিন সে নেবেই। নাম তার অজয়! দাঁতে দাঁত ঘসে, ঠোঁটের পাতাদু'টো বিকৃত ক'রে উঠে গেল ওপরে।

সুমিতা কিন্তু মুখর হ'য়ে উঠ্‌লো। সে নিজের মনে নিজেই ব'লে চ'ল্‌লো—আচ্ছা বাবা, ও খুব গরীব না? দেখেছো গায়ের জামাটা যেমন ময়লা—তেমনি ছেঁড়া! কাপড়টাও তেমনি। তুমি ওকে একটা ভাল কাপড়-জামা কিনে দিলে না কেন, বাবা?

বিনয় উত্তরে মৃদু হাস্‌লো। ব'ল্‌লো, দেবো মা, দেবো। তুমি এখন দেখে এসো ত, মা তোমার কি ক'র্‌ছে?…

কয়েক মিনিট পরে বিনয়ের বসার ঘরে ফিরে এলো সুমিতা। ব'ল্‌লো, চল বাবা—মা তোমায় ডাক্‌ছে।

কেন? সহাস্তে টেবিলের উপর হাতের বইখানা রেখে উঠে দাঁড়ালো বিনয়।

কি জানি! তুমি চলো না—হাতখানা ধ'রে টান্‌ দিল সুমিতা।

যাই! ব'লেই সুইচ্‌টা অফ্‌ ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, দু'জনে।

পাশের ঘরে গম্ভীর মুখে ব'সেছিল অজয়। হাসিমুখে তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো বিনয়। ব'ল্‌লো—মুখ ভার ক'রে ব'সে কেন? রাগ বুঝি পড়েনি এখনও। কই মা—তোমার মা কোথায়?

ব'সো না—ডেকে আন্‌ছি। ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সুমিতা। পরমুহূর্ত্তে পুনরায় ছুটে এসে কানের কাছে মুখ রেখে ফিস্‌ ফিস্‌ ক'রে

ব'ল্লো —জানো বাবা, তুমি যাকে আন্‌লে না—ওর নাম, বিজয়কান্তি মজুমদার।...

একটু থেমে পুনরায় মুখর হ'য়ে উঠ্‌লো সুস্মিতা। দাদার নাম অজয়, ওর নাম বিজয়,—বেশ মিলেছে না, বাবা!

বিনয় মৃদু হাস্‌লো। জিজ্ঞাসা ক'র্‌লো, তুমি জান্‌লে কি ক'রে মা?

মা যে ব'ল্‌লো! ওই দেখো না—আস্‌ছে দু'জনে। মা আর বিজয়! ওকে মা ভাল কাপড় জামা প'রিয়ে দিয়েছে—দেখ্‌ছো না আর ওকে চেনাই যায় না!

বিনয় উত্তরে হাস্‌লো। ব'ল্‌লো, তা না হয় হ'ল মা, কিন্তু তুমি ওর নাম ধ'রে ডেকো না, মা! বয়সে ও তোমার চেয়ে অনেক বড়—বুঝ্‌লে!

কি ব'লে ডাক্‌বো? সুস্মিতা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে সেই মুহূর্ত্তে!

উত্তর খুঁজে পায় না—বিনয়। কি ব'লেই বা ডাক্‌বে সে! অনেকক্ষণ চিন্তা ক'রে শেষে ব'ল্‌লো—যা তোমার খুশী।

বিজয়দা ব'ল্‌বো?

আদরে চিবুকে দোলা দিয়ে বিনয় ব'ল্‌লো, তাই ডেকো মা! ..

* * * *

বিজয় বালক। অজ্ঞাতকুলশীল। তাই পাশের টেবিলে তাকে খাবার দেওয়া হ'ল। অন্য টেবিলে সকলে ব'স্‌লো একসঙ্গে।

খাবার মুখে দিয়ে মাধুরীই প্রথম কথা ব'ল্‌লো—ছেলেটি বেশ! খুব সাদাসিধে। চেহারা দেখে মনে হ'ল—ভদ্র ঘরের ছেলে। বাড়ীও ওদের এখান থেকে খুব বেশী দূর নয় ব'ল্‌ছিল!

কোথায়? প্রশ্ন তুল্‌লো বিনয়।

এ পাশের কোন এক হতিমপুরে। মামার নাম যদুলাল সরকার। নামটা শুনেছি শুনেছি ব'লে যেন মনে হ'চ্ছে! মামীমার অবহেলা আর

অকারণ অত্যাচার সহ্য ক'র্‌তে না পেরে পালিয়ে এসেছে বেচারা। এখন ত আমরা ও-বাড়ী যাচ্ছি—বাবাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেই সঠিক খবর পাওয়া যাবে!

তাই হবে! সংক্ষেপে উত্তর দিল বিনয়। তবে—একটু টেনে ব'ল্‌লো, ছেলেটার মুখটা দেখে ত মনে হয়, খুব নিরীহ—চোর, ছঁ্যাচোড়্‌ বোধ হয় নয়—

কি যে বলো? মৃদু হাস্‌লো মাধুরী! তা ছাড়া চুরিই বা ও ক'র্‌বে কি? ঘরে অজয়, আর সুমিতা রইলো—আমরাও ঘুরে আস্‌বো তাড়াতাড়ি! বাইরে থেকে গেটে তালা দিয়ে গেলেই চ'ল্‌বে।

গাড়ী চ'লেছে ধীরে ধীরে। বিনয় হাঁক্‌ দিয়ে উঠ্‌লো, একটু জোরে গাড়োয়ান, একটু জোরে চালাও ভাই! বক্‌শীশ না হয় দু' চার আনা নিয়ো—গরুর গাড়ীর মত চালালে রাত যে কাবার হ'য়ে যাবে!

বাতিটা ঠিক ক'রে নিচ্ছি বাবুজী! এবার গাড়ী জোরেই ছুটবে—ওপর থেকে উত্তর দিল গাড়োয়ান। পরমুহূর্ত্তে তার হাতের চাবুকখানা ছিপ্‌ ছিপ্‌ ক'রে উঠ্‌লো। গাড়ীটাও একটু জোরে চ'ল্‌তে সুরু ক'র্‌লো।

বিনয় জিজ্ঞাসা ক'র্‌লো—গম্ভীর হ'য়ে কি ভাব্‌ছো মাধু?

ভাব্‌ছি! মৃদু হাস্‌লো মাধুরী। ব'ল্‌লো, ছেলেটা বড় মায়াবী। এরই মধ্যে চিত্ত জয় ক'রে বসেছে। ওপরে উঠ্‌তে উঠ্‌তে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লাম—তোমার নাম কি খোকা? ব'ল্‌লো, বিজয়কান্তি মজুমদার! জিজ্ঞাসা ক'র্‌লাম, বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছো কেন? ব'ল্‌লো—অনেক সহ্য ক'রেছি কাকীমা—আর পারি না ব'লেই, কাউকে কিছু না ব'লে পালিয়ে এসেছি, একা। চোখের পাতা দু'টো ওর ছল্‌ ছল্‌ ক'রে

উঠ্‌লো। সঙ্গে সঙ্গে মাধুরীর বুক ভেদ ক'রেও নেমে এলো গভীর একটা নিঃশ্বাস। ব'ল্‌লো, আহা মা-মরা ছেলে—বড় অভিমানী! মামীমা হয়ত ব'কেছে—তাই পালিয়ে এসেছে। তাই ভাব্‌ছি, মা ব'লে এই যে পাশে এসে দাঁড়ালো—শেষ পর্য্যন্ত এর বাঁধনটা কি এমনি দৃঢ় থাক্‌বে, না নিজেকেই আজীবন চোখের জল ফেল্‌তে হ'বে, কে জানে?

বিনয় একটু উপেক্ষার সুরে ব'লে উঠ্‌লো, এর জন্যে তোমার এত ভাব্‌না? আরে ছ্যাঃ! তুমিও যেমন। ওরা উড়ো পাখী, দু'দিন পরে উড়ে যাবেই। একটু মৃদু হেসে ব'ল্‌লো—আর আমরাও ঠিক তেমনি শিকারী। প্রয়োজনের তাগিদে নিত্য নোতুন ধ'র্‌বো—আর খাঁচায় পুর্‌বো। যে চালাক হ'বে সে শিকল কেটে পালাবে, আর যে বোকা হ'বে, সেই আজীবন রুদ্ধ হ'য়ে থাক্‌বে। মৃদু হেসে ব'ল্‌লো, তাই নাম হ'য়েছে সংসার নয়, মায়া-কানন! যে থাকে সেই মরে—যে পালায় সেই বাঁচে। একটু থেমে ব'ল্‌লো, এটাও সেই তোমার ছোট বেলার ধুলা খেলার সংসার! এখানেও তেমনি ভাঙ্গা গড়া চলে অনিবার—বুঝ্‌লে! বেশী ভেবে লাভ নেই। ভেসে চলাই হ'ল এ জগতের নীতি! যে তলিয়ে দেখ্‌তে চায়—সেই যায় তলিয়ে। আর যে ভেসে ভেসে বেড়ায়—সেই বেঁচে থাকে এ সংসারে। পরমুহূর্ত্তে বাইরের গেটের দিকে তাকিয়ে হাঁক দিয়ে উঠ্‌লো—আরে, এই রোখো, গাড়োয়ান—রোখো! গেটের সাম্‌নে রোখো। বাইরে বেরিয়ে এসে ব'ল্‌লো—এখানে অপেক্ষা ক'রো—আমরা মিনিট দশ কি পনেরো পরেই ফিরে আস্‌ছি। চলে যেয়ো না যেন—বুঝ্‌লে!...

কেদারনাথ কথাটা শুনেই প্রায় ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠ্‌লেন, তোমরা দুটোতে এখনও ছেলেমানুষ র'য়ে গেছো বিনয়! মানুষকে এত বিশ্বাস করা উচিত নয়। তা ছাড়া সে একেবারে নোতুন—না—না কাজটা তোমাদের

মোটেই ভাল হয়নি! অপেক্ষার কোন প্রয়োজন নেই—আমি ভালই আছি। একটু থেমে ব'ল্‌লেন, বুদ্ধিকে তোমাদের বলিহারী! দুটো ছোট ছেলেমেয়েকে একটা নাম-গোত্র-হীন ছেলের কাছে রেখে, নিশ্চিন্ত মনে চলে এলে! না—না—আর রাত ক'রোনা—ফিরে যাও এখুনি।

মাধুরী ব'ল্‌লো, এত ব্যস্ত হ'চ্ছো কেন বাবা? ছেলেটা অজয়ের বয়সী—নেহাৎ গোবেচারা—

কেদারনাথ কথার মাঝে ঝাঁপিয়ে প'ড়্‌লেন,—জানি তোমাদের মেয়েজাতটার মন, এমনি কাদার ঢেলা! একটু দুঃখ দেখ্‌লেই, আহা—আহা ক'রে উঠ্‌বে! কিন্তু এ বাস্তব জগতের রূপ ত দেখোনি। কত ঠগ্‌ জোয়াচ্চোর এমনি ভেক্‌ নিয়ে পথেঘাটে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে শীকারের সন্ধানে। সুযোগ পেয়েছে কি, অমনি হিংস্র জন্তুর মত লাফিয়ে প'ড়্‌বে ঘাড়ে। না—না—আর ব'সে থেকো না তোমরা—ফিরে যাও—বুঝ্‌লে! ঘরে দুটো ছেলেমেয়ে আছে—তাদের জীবনের মূল্য এ দুনিয়ায় সব কিছুর চেয়ে বেশী। অন্য একদিন বরং তোমরা এসো। আর অজয়কে বরং কালই পাঠিয়ে দিয়ো। ও না থাক্‌লে ঘরটা বড় ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়। মনটা হু হু করে সকল সময়। তাছাড়া তোমার মায়েরও বেশ কষ্ট হয়! মুখে তিনি যতই কথার ফোয়ারা ছোটান্‌ না কেন, চোখ তুলে চাইলেই মনের ভাব্‌টা ধরা পড়ে যায়। আর কেউ না বুঝুক্‌ আমি ত বুঝি! না—না - শুন্‌ছো ওগো—ওদের আর বেশী রাত পর্য্যন্ত ধরে রেখো না—আজ যাক্‌, কাল্‌ কি পরশু বরং একটু সকাল ক'রেই আস্‌বে ওরা দু'জনে!··

* * *

অঘোরনাথও কথাটা শুনে ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌লেন। ব'ল্‌লেন, ঘরে দুটো ছেলেমেয়েকে রেখে, এত রাত্রে আসার এমন কি প্রয়োজন ছিল?

বয়স হ'লে শরীর একটু আধটু খারাপ হ'বেই। মিছিমিছি এখানে ব'সে আর রাত ক'রো না—বরং একটু তাড়াতাড়ি ফিরে যাওয়াই তোমাদের উচিত!

বিনয় ব'ল্‌লো, মিছে ব্যস্ত হ'চ্ছো, বাবা! কোন ভয় নেই। তা-ছাড়া, মাকে দেখ্‌তে এলাম, দু'দণ্ড কাছে না ব'স্‌লে তিনিই বা কি মনে ক'র্‌বেন বলতো?

মনে কি ক'র্‌বে শুনি? বয়স তাঁরও ত হ'য়েছে! সংসারের ভালমন্দ চেনেন এবং বুঝেন ভাল ক'রেই। বৌমা কোথায় গেল? না, মেয়েদের স্বভাবই এই! কোথাও গেলে যে তাড়াতাড়ি একটু বেরুবে, সে বোধশক্তি কিছুতেই ওদের আর হবে না! আচ্ছা, তোমার মার আক্কেলই বা কি? বুড়ো হ'য়ে মাথার চুল পাকালো, এখনও হিতাহিতবোধ একটু হ'ল না!

বিনয় উত্তরে মৃদু হাস্‌লো। ব'ল্‌লো—এসে, দু' মিনিট না ব'স্‌লে, লোকে কি ভাব্‌বে বলতো? তোমরা না হয় মা-বাবা—কিন্তু সংসারে আরও পাঁচজন ত আছে!

বিপদ-আপদ কিছু ঘট্‌লে, তাঁরা কি তখন মাথা দিয়ে ঠেকা দেবে? একটু অসহিষ্ণুভাবেই উত্তর দিলেন অঘোরনাথ।

বিনয় কথার মোড় ফেরাবার চেষ্টায় ব'ল্‌লো—তোমার ত হতিম-পুরের সরকারদের বাড়ীর সঙ্গে জানাশোনা ছিল—ওখানে যদুলাল সরকার ব'লে কেউ থাকেন নাকি?

যদুলাল? খুব চিনি। লোকটার বেশ পয়সাকড়ি আছে। তবে খুব সমঝদার। মানে, একটু বুঝেসুঝে চলে। তোমাদের ইংরেজীতে যাকে বলে ইকোনমিক, আমাদের চল্‌তি ভাষায় তাকেই বলে কৃপণ। কিন্তু আচার-ব্যবহারে খুব ভদ্র। বয়সও খুব বেশী নয়—এই তোমাদের চেয়ে পাঁচ-ছ' বছরের বড় হ'তে পারে। এখনও দেখা হ'লে পায়ের

ধূলো মাথায় নেয়। হাসিমুখে কথা বলে। সকলের কুশলাদির খোঁজ-খবরও নেয়। লোকে যে যাই বলুক বাপু—আমার ত ছেলেটিকে খুব ভালই লাগে।

আচ্ছা—তাঁর কোন বিধবা বোন, বা তাঁর কোন শিশুসন্তান ছিল কি ?

কেন বলতো ? বছর পাঁচ-ছয় আগে যখন পথে একবার দেখা হ'য়েছিল, তখন এরূপ ধরণের একটা শোক সংবাদ দিয়েছিল বটে ! ভগ্নিপতিটি ছিল বড় গরীব—বোনটির বয়সও ছিল খুব কম। ব'ল্‌লে—"বড় মনকষ্টে আছি কাকাবাবু ! ছেলেটি গরীব কিন্তু বড় ভালমানুষ ! ভেবেছিলাম—দুঃখের ভাত দু'জনে সুখেই খাবে, সুখেই থাক্‌বে, তা ভাগ্যে তার সহ্য হ'ল না। হতভাগা মেয়েটাকে ব'ল্‌লাম—আমার কাছেই না হয় এসে থাক্‌ ! ব'ল্‌লো—তাকি হয় দাদা ? স্বামীর ভিটে ছেড়ে কি আসা যায় ? কষ্ট হয়ত খুবই হবে, কিন্তু সব ভুলে থাক্‌বো ছেলেটা যদি আমার বেঁচে বর্ত্তে থাকে। তোমরা সেই আশীর্ব্বাদই করো দাদা !" বেশ মনে প'ড়্‌ছে, যদুলাল কেঁদে ফেলেছিল। ব'ল্‌লে—কাকাবাবু আপনারা সেই আশীর্ব্বাদই করুন—মনে সেই শান্তিটুকুই যেন সে পায় ! আহা—দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে অঘোরনাথ ব'ল্‌লেন—যদুলালের কথাগুলো শুনে সেদিন আমিও চোখের জল ধরে রাখ্‌তে পারিনি—কিন্তু এসব খবরের তোমার প্রয়োজন কি বিনয় ?

বিনয় গভীর মনোযোগ দিয়ে সমস্ত কথাগুলো যেন গিল্‌ছিল। অঘোরনাথের প্রশ্নে কতকটা হতবাক হ'য়েই সে ব'সে রইলো কয়েক সেকেণ্ড। তারপর ব'ল্‌লো—তাহ'লে ছেলেটা এতটুকুও বাড়িয়ে ব'লেনি দেখ্‌ছি।

কে ছেলেটি ? সবিস্ময়ে প্রশ্ন ক'র্‌লেন অঘোরনাথ।

সেই কথাই ত ব'ল্‌ছি তোমায় বাবা ! আজ সন্ধ্যায় একটি ছেলে

কুড়িয়ে—হ্যাঁ কুড়িয়েই পেয়েছি ব'লতে পারা যায়! সে ব'লছিল, যতুলাল সরকার নাকি তার মামা! বাবা খুব ছোট বয়সে মারা গিয়েছে—মাও মারা গেছে—বয়স বোধ হয় সাত কি আট হবে। লেখাপড়া বোধ হয় কিছু শেখেনি—জিজ্ঞাসাও করা অবশ্য হয়নি, তবে অফিসের কাজে প্রায়ই ত পিওনের দরকার হয়, তাই ভাবছি ঘরে যদি থাকে, ফায়ফর্মাসটাও খাটবে আর অফিসের কাজে লাগিয়ে দিলে মাইনেও দু'চার টাকা পাবে সে হাতে!

তবে কি ছেলেটাকে যতুলাল, দেখেনি?

না, তা নয়। শুনলাম্ ত যতুলাল ছেলেটাকে খুবই ভালবাসেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রীর নির্য্যাতন সহ্য ক'রতে না পেরে ছেলেটা বোধ হয় পালিয়ে এসেছে। বেচারা দুদিন অনাহারে ছিল!

বলো কি? তা ওর স্ত্রীর সম্বন্ধে এ রকম দু'একটা কথাও আমার কানে এসেছিল বটে! তবে যে ব'ললে—একটা নোতুন বয় পেয়েছি! ওই ছেলেটাই কি তোমার সেই বয়?

হ্যাঁ!

একটু স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ ক'রে অঘোরনাথ ব'ললেন—ভদ্রঘরের ছেলেকে একটু আস্তানা দিয়ে ভালই ক'রেছো! কিন্তু দেখো, তার আত্মসম্মানে যেন আঘাত না লাগে!

সবিস্ময়ে বিনয় অঘোরনাথের মুখের দিকে তাকালো।

উত্তরে মৃদু হাসলেন অঘোরনাথ। ব'ললেন—প্রকৃতির এমনই রীতি যে, দৃষ্টি মানুষের সকল সময়েই ঊর্দ্ধগামী—নিম্নগামী সহসা হ'তেও সে চায় না! বুঝলে—আতঙ্কের জন্ম হ'ল সেখানেই,—একটু টেনে হাসলেন অঘোরনাথ। ব'ললেন—মানুষ যখনই নিজের সীমানা অতিক্রম করে, তখন সে আর পিছন ফিরে তাকায় না! তার অতীত জীবনের সমস্ত কথা যে শুধু সে ভুলে যায় তা নয়—সে-স্মৃতি স্মরণ ক'রতেও সে আতঙ্কে

অভিভূত হ'য়ে পড়ে নিজেরই অজ্ঞাতে। তাই, সেই সকল বস্তুকে একটু হেয় প্রতিপন্ন ক'র্‌তে সে ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে। তুমি সন্তান। একটু থেমে ব'ল্‌লেন—আমাদের অপূর্ণ জীবনের আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতিবিম্ব তুমি! তোমার মঙ্গল কামনাই আমাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। সেই কথাগুলো ভেবেই তোমায় বলি—বিনয়, বুড়ো বাপের কথা ভবিষ্যতে স্মরণ রেখে পথ চলো! তাতে তোমাদের মঙ্গল হবে, জীবনে শান্তির পথ প্রশস্ত হবে, তার বেশী—একটু ম্লান হাস্‌লেন অঘোরনাথ। ব'ল্‌লেন—জীবনে কামনার শেষ নেই—তবুও এর বেশী আমরা আর চাই না! কিন্তু রাত অনেক হ'য়ে গেল, তোমরা আর দেরী ক'রো না। যাও—এবার যাও, ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলোর কষ্ট হ'চ্ছে নিশ্চয়, যাও তোমরা যাও!···

* * *

বাড়ীতে পা দিতেই সুমিতা চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো—বাবা, দাদা বিজয়দার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে।

শঙ্কিত কণ্ঠে মাধুরী জিজ্ঞাসা ক'র্‌লো—কেন? কি হ'ল।

সুমিতা উত্তর দিল, তোমরা যেই চলে গেলে, দাদা ব'ল্‌লে—চল্‌ আমরা ওপরের বারান্দায় গিয়ে খেল্‌বো। বিজয়দাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে—এই ছোঁড়া, তুই খেল্‌তে জানিস্? ও মাথা দুলিয়ে ব'ল্‌লে—না। ব্যাটটা দুলিয়ে দাদা ব'ল্‌লে—আমি ছুঁড়্‌বো তুই এমনি ক'রে মার্‌বি, আর তুই ছুঁড়্‌বি আমি মার্‌বো—যে পার্‌বে না সে এক পয়েণ্ট হেরে যাবে—বুঝ্‌লি এর নাম ব্যাট্‌-মিণ্টন।

একটু থেমে সুমিতা ব'ল্‌লো—জানো মা—খেলা আরম্ভ হ'ল। আমি জানি, দাদা চুরি ক'র্‌বে, প্রতিবাদ ক'র্‌লেই চুল ধ'রে টান্‌বে, তাই খেল্‌তে রাজী হইনি। প্রথমবারে দাদা জিতে গেল, দ্বিতীয়বারে যেই

ফেরে গেল, অমনি ব্যাট্‌টা সজোরে ছুঁড়ে মার্‌লো। কপালটা কেটে কি রক্তই না প'ড়েছে। দেখ্‌বে চলো না—এখনও কত রক্ত পড়ে আছে বারান্দায়।

তারপর? শঙ্কিত কণ্ঠে পুনরায় জিজ্ঞাসা ক'র্‌লো মাধুরী—বিজয় কোথা গেল?

যাবে কোথায়? মাথাটা চেপে বসে প'ড়্‌লো বারান্দায়। দাদা হাসিমুখে ব্যাট্‌টা দোলাতে দোলাতে ফিরে গেল বাবার পড়ার ঘরে। ব'ল্‌লে—শালা গেঁয়ো শালিক, এসেছে আমার সঙ্গে চালাকী ক'র্‌তে। একটু থেমে ব'ল্‌লে—সে রক্ত দেখে আমার যা ভয় ক'র্‌তে লাগলো তোমায় কি ব'ল্‌বো। তখনই ছুটে ঘটি ঘটি জল ঢালি—তবুও কি রক্ত বন্ধ হয়? তোমার রুমালে খানিকটা চূণ দিয়ে শেষে বেঁধে দিয়েছি সে-জায়গাটা। বেচারী একটি কথাও বলেনি মা। শুধু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌ছিল বসে বসে।

বিনয় গম্ভীর হ'য়ে এতক্ষণ শুন্‌ছিল সব। প্রথম কথা ব'ল্‌লো, এখন সে কোথায়?

ওই বারান্দার কোণে চুপ ক'রে শুয়ে আছে। আমি একটা কম্বল পেতে দিয়েছি, বাবা!

বেশ ক'রেছো মা! আদরে বিনয় সুমিতার চিবুকে মৃদু দোলা দিয়ে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লো—তোমার চোখের পাতাগুলো ফোলা ফোলা দেখাচ্ছে কেন মা? তুমিও বুঝি কেঁদেছিলে?

লজ্জায় ম্লান হ'য়ে গেল সুমিতার কচি মুখখানা। ব'ল্‌লো—বারে! মানুষের চোখে জল দেখে বুঝি চুপ ক'রে থাকা যায়?

বিনয় আবেগে তাকে কোলে তুলে নিয়ে গণ্ডে একটি চুমো খেয়ে ব'ল্‌লো—এতে লজ্জার কি আছে মা? সবাই কি মানুষের দুঃখে চোখের জল ফেল্‌তে পারে?

বারান্দা থেকে ঘুরে ফিরে এসে ব'ল্লো মাধুরী—অকাতরে ঘুমোচ্ছে ছেলেটা। এখন কি ক'র্বে? একটু ওষুধ দিলে হ'ত না?

বিনয় ব'ল্লো—ঘুমোচ্ছে ঘুমোক্, কাল যা হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে! কিন্তু তুমি ওর শোয়ার ব্যবস্থা ক'রে দাও আগে। রক্ত বেশী যদি পড়ে থাকে, জ্বরও হয়ত আস্বে একটু। মাঝে মাঝে উঠে দেখ্তে হবে আর কি। কিন্তু আমাদের বাবু গেলেন কোথায়? তিনিও কি তবে লাইব্রেরী রুমে নাক ডাকিয়ে ঘুম দিচ্ছেন? দেখতো একবার—

কেন? শঙ্কিত কণ্ঠে প্রশ্ন ক'রে উঠ্লো মাধুরী, এতরাত্রে তুমি আবার শাসন সুরু ক'র্বে নাকি?

করা উচিত নয় কি? যদি অস্থানে কুস্থানে লেগে একটা অঘটন ঘটে যেতো, তখন—

মাধুরী বাধা দিয়ে উঠ্লো—না—না, তুমি কিছু ব'লো না! যা ব'ল্বার তা আমি নিজেই ব'ল্বো কাল সকালে। বুঝিয়ে দেবো, এটা শুধু অন্যায় নয়—রীতিমত অপরাধও বলা চ'লে!

বেশ—তাই হবে! ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে বিনয় ফিরে গেল নিজের শোবার ঘরে। ব'ল্লো—বুঝি, এটা মজ্জাগত ঈর্ষা—কিন্তু তাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হবে না মাধু, তাতে ছেলের ইহকাল পরকাল উভয়ই নষ্ট হ'য়ে যাবে!

এত রাত্রে ঘুমন্ত ছেলেকে জাগিয়ে শাসন করাটা কি তবে পৌরষত্বের পরিচয়? ক্ষুণ্ণ মনে উত্তর দিল মাধুরী।

বিনয় কয়েক মিনিট নীরব থেকে ব'ল্লো—ভাল কি মন্দ, সঠিক উত্তর দেওয়া সত্যই কঠিন মাধু, তবে মনে রেখো শাসনটাও শিক্ষার অঙ্গীভূত একটা বস্তু। ভালমন্দ বোঝার জ্ঞান যার হয়নি, সহজ কথায় যা বোঝানো সম্ভব নয়—সেক্ষেত্রে স্নেহ, সোহাগ ও উৎসাহের মূল্য যতখানি—শাসনের মূল্যও ঠিক ততখানি! যা ভাল, তার জন্য চাই

উৎসাহ। কিন্তু যা মন্দ, তার জন্যও চাই কঠোর শাসন—নইলে শিশু কিংবা বালকের ভালমন্দ বোঝার শক্তিটা সবল হ'য়ে উঠ্‌তে পারে না!

গায়ে হাত দিলেই বুঝ্‌বে, নইলে বুঝ্‌বে না—এ কথার উপর আস্থা আমি রাখিনে! একটু জোর দিয়েই উত্তর দিল মাধুরী।

বিনয় বুঝ্‌লো মাধুরীর দুর্ব্বলতা কোথায়! সে মা, সন্তানের প্রতি মমতা বোধটা তার একটু উগ্রতর হওয়াই স্বাভাবিক—এখানে যুক্তি নিরর্থক। কারণ, দুর্ব্বলতম স্থানে সামান্য একটু আঘাতেই মানুষ ক্ষিপ্ত হ'য়ে ওঠে। তাই উত্তরে শুধু মৃদু হাস্‌লো। ব'ল্‌লো—শাসন মানে পাশবিক বলপ্রয়োগ নয় মাধু, শাসন মানে জীবনের উচ্ছ্বসিত ভাবধারা ও চঞ্চল আচরণকে সংযত করা। সন্তানকে মা-বাবা একটু গভীর স্নেহের চোখে দেখে, তাই তার জীবনের ত্রুটি-বিচ্যুতি সহসা চোখের পাতায় ভাসে না। তার জন্য নিজেদের একটু সচেতন হওয়া উচিত নয় কি?

মাধুরী উত্তর দিল না। মুখখানা তার গম্ভীর হ'য়ে উঠ্‌লো।

বিনয় হেসে ফেল্‌লো তার এই অদ্ভুত আচরণে। বুঝলো, এটা তার মাতৃত্বের সহজ অভিমান। তাই সহজ কণ্ঠে ব'ল্‌লো—বেশ ত, তুমিই শাসন ক'রো, কোন কথা ব'ল্‌বো না আমি! তা হ'লেই ত তুমি খুশী!

পরদিন সকালে সহজ কণ্ঠে মাধুরী জিজ্ঞাসা ক'র্‌লো—হ্যাঁরে অজয়, তুই কাল বিজয়কে মেরেছিলি কেন?

কেন ও হাস্‌লে! একটু উগ্রকণ্ঠেই জবাব দিল অজয়।

খেলায় হার-জিত ত আছেই! হাসিমুখে অজয়কে বোঝাতে চেষ্টা ক'র্‌লো মাধুরী।

সুমিতা দাঁড়িয়েছিল পাশে। ব'লে উঠলো—বারে! ও হেরে যেতে

তুমি হাস্‌লে, তার মাথায় দুটো গাঁট্টাও বসিয়ে দিলে! অথচ উত্তরে সে শুধু ব'লেছিল—এবার কিন্তু শোধ-বোধ!

তাই বা ব'ল্‌বে কেন! চাকর চাকরের মত থাক্‌তে পারে না? মারমুখো হ'য়ে উঠ্‌লো অজয়।

চুপ্, চুপ্! বাধা দিয়ে উঠ্‌লো মাধুরী। ব'ল্‌লো—ছিঃ, ওকথা কি মুখে আন্‌তে আছে? এখুনি উনি শুন্‌লে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে ব'স্‌বেন। তাছাড়া ও ত ঠিক চাকর নয়। ভদ্রঘরের ছেলে, মা-বাবা কেউ নেই—তাই লোকের বাড়ীতে কাজ ক'র্‌তে এসেছে! তাই বলে কি সে ছোট, না তাকে উপহাস করা উচিত?

চাকরকে চাকর বলা বুঝি উপহাস করা? আর তা যদি হয়—আমি আবার ব'ল্‌বো—চাকর—চাকর—

মাধুরী নিরুপায়ে মুখখানা তার চেপে ধ'র্‌লো। ব'ল্‌লো—হতভাগা ছেলে, উনি যে পাশের ঘরে আছেন! শুন্‌তে পেলে রক্ষা কি আর থাক্‌বে? দোহাই চুপ্ কর্ বাবা একটু! নোতুন ব্যাট কেনার টাকা দিচ্ছি, ওখানে গিয়ে নোতুন একটা কিনে নিস্ বরং!

শান্ত হ'য়ে প'ড়্‌লো অজয়। খুশীতে মুখখানা তার উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌লো। ব'ল্‌লো—আমিও ত তোমাকে সেই কথা ব'ল্‌বো ভেবে রেখেছিলাম। কাল বারান্দায় প'ড়ে গিয়ে ব্যাট্‌টায় কেমন সব দাগ হ'য়ে গেছে—দেখ্‌বে!

আদরে আঁচলের খুঁটে অজয়ের মুখখানা মুছে দিতে দিতে মাধুরী ব'ল্‌লো—থাক্ থাক্, দেখাতে আর হবে না। দাদুর সঙ্গে বাজারে গিয়ে ভাল দেখে ব্যাট্ একটা কিনে নিস্ বরং! কিন্তু এখানে আর দুরন্তপনা করিস্‌নে। বই নিয়ে খানিকটা এখন পড়ে ফেল্ দেখি!

খুশী মনে উঠে গেল অজয়। নীরবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব কিছুই শুন্‌লো ও দেখ্‌লো সুমিতা। চোখেমুখে ভাসে তার অনন্ত বিস্ময়।

যে করে অত্যাচার, সেই পায় পুরস্কার, আর যে সহ্য করে নীরবে, সেই ক্ষতচিহ্ন ব'য়ে মরে আজীবন! হয়ত এটাই এ দুনিয়ার নিয়ম!

*   *   *

বিজয় সত্যই কাজের ছেলে। সবকিছুই জানে, পরিশ্রমও ক'র্‌তে পারে সেইমত। খুশী হ'ল মাধুরী। প্রশংসা-মুখর হ'য়ে উঠ্‌লো—চমৎকার ছেলে!

বিনয় ব'ল্‌লো—ভাব্‌ছি, অফিসের পিওনের কাজে ওকে লাগিয়ে দেবো কিনা! তুমি কি বলো?

অকারণেই বুক ভেদ ক'রে নেমে এলো একটা গভীর নিঃশ্বাস। ব'ল্‌লো মাধুরী—আহা, মা-বাপ মরা ছেলে! ভবিষ্যতে যাতে সুখী হ'তে পারে, সে চেষ্টা আমাদের করা উচিত বইকি! বিশেষ ক'রে সে যখন আমাদের আশ্রয়েই আস্তানা নিয়েছে শেষ পর্য্যন্ত!

ঠিক এই কথাই ভাব্‌ছিলাম আমি। এখানে যেমন আছে থাক্‌—একটা নিরাপদ আশ্রয়েও থাকা হবে, আর অফিসে কাজ ক'র্‌লো, দুটো পয়সার মুখও দেখ্‌বে অনায়াসে। বিশেষ ক'রে, ও যেরূপ চালাক চতুর, সাহেবের চোখে যদি পড়ে যায় একবার, ওকে আর পায় কে! সশঙ্কে উঠে দাঁড়ালো বিনয়। কিন্তু—ওখানে গণ্ডগোল কিসের? দেখতো একটু এগিয়ে, অজয় নিশ্চয় নোতুন কিছু হাম্‌লা সুরু ক'রে থাক্‌বে! না—ওকে নিয়ে আর পারা গেল না! দেখ্‌ছি, বোর্ডিংএ পাঠানোর ব্যবস্থাই ক'র্‌তে হবে শেষ পর্য্যন্ত।

বিনয়ের কথা শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই সুমিতা হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে দাঁড়ালো। ব'ল্‌লো—দেখ'না বাবা, দাদা নিজেই গায়ে প'ড়ে ঝগ্‌ড়া ক'রে, মার্‌ছে বিজয়দাকে!

দেখ্‌লে ত! যা ভেবেছি ঠিক তাই—দেখো, একটু দেখো! না—দুটোকে কোনমতেই এক জায়গায় রাখা সম্ভব হবে না দেখ্‌ছি!

মাধুরীকে দেখেই অজয় ছুটে পালালো। ধরা প'ড়্লো বিজয়। তার ক্ষতস্থানটা দিয়ে পুনরায় রক্ত প'ড়্তে সুরু হ'য়েছে। মাধুরী চীৎকার ক'রে উঠ্লো— এই সুমি, ছুটে একটু তূলো আর বেঞ্জিনের শিশিটা নিয়ে আয়! তাড়াতাড়ি আয়—

সুমিতা ছুট্লো। বিনয়ও এগিয়ে গেল। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষ হ'লে পর বিনয় জিজ্ঞাসা ক'র্লো—কি হ'য়েছিল, সত্য কথা বলো?

বিজয় উত্তর দেয় না। মাথা নীচু ক'রে থাকে দাঁড়িয়ে।

সুমিতা ব'ল্লো—ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লাট্টু ঘোরাচ্ছিল। দাদা এসে ব'ল্লে—দে, আমাকে একবার দে! ও ব'ল্লে—হাতেরটা ঘুরিয়ে নিয়ে দিচ্ছি, একটু দাঁড়াও। দাদা সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে প'ড়্লো—দে ব'ল্ছি! ও দেবে না, দাদাও ছাড়্বে না কিছুতেই। নিরুপায়ে দাদা ওর মাথার চুলগুলো ধ'রে নাড়া দিতে লাগ্লো খুব জোরে। তাতেও যখন ছাড়্লো না, তখন চড়্, কিল, ঘুষি মার্তে সুরু ক'র্লো। মাথা দিয়ে রক্ত ঝরে প'ড়্ছে দেখেই ত তোমাকে ডাক্তে ছুটে গেলাম আমি।

বিনয় গম্ভীর হ'য়ে উঠ্লো। বিজয়কে জিজ্ঞাসা ক'র্লো—সুমিতার কথাগুলো কি সত্যি?

বিজয় মাথা দোলালো—হ্যাঁ!

সক্রোধে বিনয় হাঁক্ দিল—অজয়?

কোথায় অজয়? সে পালিয়েছে গেটের ফাঁক দিয়ে। তাই উত্তর পাওয়া গেল না। শুধ্ বিনয়ের গুরুগম্ভীর স্বরটা প্রতিধ্বনিত হ'য়ে ঘুরে বেড়াতে লাগ্লো সারা বাড়ীটার মধ্যে। কেটে গেল কয়েকটা মিনিট। বিনয় গর্জ্জাতে লাগ্লো, ধ'রে নিয়ে এসো একবার দেখি কতবড় দুষ্ট হয়েছে সে! মাধুরী নীরবে ছুট্লো অজয়ের খোঁজে। কিন্তু কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না তার।

অফিসের বেলা হ'য়ে গিয়েছিল। বিনয় বেরিয়ে গেল। মাধুরী

অজয়ের প্রতীক্ষায় বসে রইলো। কিন্তু দুপুর অতীত হ'য়ে অপরাহ্ণ দেখা দিল, তবুও খোঁজ তার পাওয়া গেল না! চিন্তিত হ'য়ে প'ড়্‌লো মাধুরী—গেল সে কোথায়?

ইতিমধ্যে সুমিতা বিজয়কে সঙ্গে নিয়ে পরিচিত পাশের বাড়ীতে খোঁজ নিল বার বার। তবুও সন্ধান পাওয়া গেল না। মাধুরী মুষ্‌ড়ে প'ড়্‌লো—তাইত কি হবে? কোথায় গেল ছেলেটা?

সুমিতা ব'ল্‌লো—দাদা, দাদুর কাছে পালিয়ে যায়নি ত?

মাধুরী দ্বিধামিশ্রিত কণ্ঠে উত্তর দিল—তা কি ক'রে সম্ভব? গাড়ী ছাড়া সে ত একা পথ-ঘাট মাড়ায়নি বড় একটা! তাছাড়া গাড়ী ঘোড়ার ভিড়, যদি অঘটন ঘ'টে কিছু বসে?

নানা বিভীষিকার ছবি সে আঁক্‌লো প্রতিটি মুহূর্ত্তে। অবশেষে সেবাড়ী থেকে একবার ঘুরে আসাই স্থির ক'রে নিল মাধুরী।

সুমিতার কথাই ঠিক। অজয় ভয়ে সোজা দাদুর কাছে এসে আত্মগোপন ক'রেছিল।

কেদারনাথ সবে দিবানিদ্রা ত্যাগ ক'রে বৈঠকখানায় ফরাসের উপর তাকিয়া হেলান দিয়ে আরামে গড়্‌গড়ায় টান্ দিতে সুরু ক'রেছেন—শুষ্ক মুখে, বিমর্ষ চিত্তে মাধুরী তাঁর সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। তিনি প্রশ্ন করার পূর্ব্বেই মাধুরী শুষ্ককণ্ঠে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লো—অজয় এখানে এসেছে নাকি, বাবা?

কেন? সেকি তবে ব'লে আসেনি? তখনই যেন কেমন একটা সন্দেহ হ'য়েছিল। তোমার মা কিন্তু আমায় ব'ল্‌লেন—ছেলে বড় হ'য়েছে, বিনয় হয়ত অফিস যাওয়ার পথে ওকে এখানে ছেড়ে দিয়ে, সোজা অফিস চলে গিয়ে থাক্‌বে! তবুও ব'ল্‌লাম—তাহ'লেও মা কি কখনও এমন অসময়ে ছেলেকে না খাইয়ে পাঠাতে পারে? উত্তরে

তোমার মা কিন্তু ব'ল্‌লেন—জেদি ছেলে ত! না খেয়েই হয়ত চ'লে এসেছে! বিনয় জানে না, সঙ্গে ক'রে ছেড়ে দিয়ে গেছে। যাই বলুক্ না, মনটা কিন্তু তখন ও-কথায় সায় দেয়নি। তাই স্থির ক'রেছিলাম বেলা আরও একটু প'ড়্‌লে, ও-বাড়ী থেকে ঘুরে আস্‌বো একবার। তা ভালই ক'রেছো মা, ঘরে যাও, বিশ্রাম নাও গে। কিন্তু কার সঙ্গে এলে মা?

এদের সঙ্গে নিয়ে। মাধুরী ম্লান হাস্‌লো একটু।

এ ছেলেটিকে ত পূর্ব্বে দেখিনি কোনদিন?

ওর কথাই ত ব'লে গেলাম সেদিন। ওরই ত মাথা ফাটিয়ে দিয়ে পালিয়ে এসেছে হতভাগা ছেলে!

বলো কি? এত দুষ্টু হ'য়েছে? না দাদু আমার সে প্রকৃতির ছেলে ত নয়! নিশ্চয় ও কোন দোষ ক'রে থাক্‌বে!

মাধুরী হাস্‌লো। ব'ল্‌লো—না বাবা! দাদু তোমার বড় দুষ্টু হ'য়েছে। ও ত রাগে গর্ গর্ ক'র্‌তে ক'র্‌তে অফিস বেরিয়ে গেছে, ফিরে এসে আবার না কুরুক্ষেত্র বাধায়!

না, কাজ্‌টা সত্যই ভাল করেনি! আচ্ছা, এখন তুমি ভেতরে যাও মা, পরের কথা পরেই চিন্তা করা যাবে। নলটা মুখে তুলে নিয়ে পরমুহূর্ত্তেই টান দিতে সুরু ক'র্‌লেন তিনি। নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে ভুড়ুক ভুড়ুক শব্দ সেই মুহূর্ত্তেই উঠ্‌লো ভেসে।

একগাল ধোঁয়া ছেড়ে কেদারনাথ ইঙ্গিতে বিজয়কে একটু দূরে বসার নির্দ্দেশ দিয়ে পিছন ফিরে তাকালেন। দেখ্‌লেন, বিস্ময়-বিহ্বল-চিত্তে সুমিতা তাঁর মুখের দিকে আছে তাকিয়ে। সহাস্যে ব'ল্‌লেন, এখানে দাঁড়িয়ে কেন দিদি? যাও, ভেতরে যাও মার তোমার সঙ্গে!

সুমিতা উত্তর দিল না। চপল লঘু পদবিক্ষেপে ফিরে গেল সে অন্দরমহলে।

বেলা গড়িয়ে এলো। ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌লো মাধুরী। এবার ফিরে যেতে হবে তাকে। স্বামী অফিস থেকে ফিরে আসার সময় হ'য়ে এলো—আর কি নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বসে থাক্‌তে পারে সে নীরবে?

সুচারুদেবী ব'ল্‌লেন—এলি যখন, দু'দণ্ড বসে যা মাধুরী! সংসারের ভার ত আজীবন ব'য়ে ম'র্‌তেই হবে। মাঝে মাঝে একটু বিশ্রাম না নিলে শরীর টিক্‌বে কেমন ক'রে?

মাধুরী উত্তরে সহাস্যে ব'ল্‌লো—ওর যে ফিরে আসার সময় হ'য়ে এলো মা!

সুচারুদেবী তবুও ব'ল্‌লেন, সেজন্যে ভাবনা কিছু নেই। চাবিটা পাঠানোর ব্যবস্থা ক'রে এসেছি বহুক্ষণ। বেহারীকে সঙ্গে দিয়ে ছেলেটাকে পাঠিয়ে দিতে ব'লেছি কর্ত্তাকে! হয়ত এতক্ষণ চলেও গেছে তারা। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'লে পর উনি নিজেই তোকে পৌছে দিয়ে আস্‌বে'খন!

মাধুরী উত্তর দিল না। সুচারুদেবী ব'ল্‌লেন—এলি, দু'দণ্ড না ব'স্‌লে মার মন কি সান্ত্বনা ফিরে পায় কোনদিন? বোস, দুটো ভালমন্দ জিনিষ নিজের হাতে তৈরী ক'রে খাওয়াই। কতদিন খাস্‌নি বল্‌তো?

মাধুরী উত্তর খুঁজে পেল না। মার মনের সান্ত্বনাই ত এই! কিন্তু মনটা যে তার প'ড়ে আছে নিজ সৃষ্ট সেই সংসারের ক্ষুদ্র আবেষ্টনীর মাঝে। কত কাজ এখনও তার বাকী! যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সেগুলো গুছিয়ে তোলা যায়, ততক্ষণ কি শান্তি ফিরে পেতে পারে সে মনে-প্রাণে? তাই ত তার এত চঞ্চলতা, এত ব্যাকুলতা! তবুও জোর ক'রে মৃদু হাসি একটু হাস্‌লো মাধুরী। আন্‌মনে ব'ল্‌লো—ছেলেটা নোতুন, কিছুই জানে না! তাছাড়া অফিস থেকে সারাদিনের পর ফির্‌ছে, ঠিকমত খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাই বা ক'র্‌বে কে? দ্বিতীয় ব্যক্তি ত আর নেই!

সুচারুদেবী ব'ল্লেন—বেহারী যখন যাচ্ছে, তোর ভাবনার কোন প্রয়োজন নেই। ও সব গুছিয়ে রাখ্‌বে !···

সন্ধ্যার একটু পরেই কেদারনাথ মাধুরীকে পৌঁছে দিয়ে সান্ধ্য ভ্রমণে বেরিয়ে গেলেন।

মাধুরীর অন্তদিকে খেয়াল ছিল না। পাশ দিয়ে সুমিতা উপরে উঠে গেল। গেটের সাম্‌নে বিজয়কে দাঁড়িয়ে থাকৃতে দেখে মাধুরী ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লো—বাবু অফিস থেকে এখনও ফেরেননি, বিজয় ?

বিজয় মাথা ঢুলিয়ে উত্তর দিল—হ্যাঁ, উপরে আছেন তিনি !

খেয়েছেন কিছু ?

হ্যাঁ, ষ্টোভ জ্বেলে চা-খাবার তৈরী ক'রে দিয়েছি !

বেহারী ?

সে ত কয়েক মিনিট পরেই চলে গেছে !

বাবু এখন কি ক'র্‌ছেন ? সহাস্যে প্রশ্ন ক'রলো মাধুরী।

জানিনে ত !

তুই এখানে দাঁড়িয়ে কেন ? ঘরের সব কাজ সেরে ফেলেছিস্‌, না প'ড়ে আছে এখনও ?

বিজয় মৃদুহাস্যে উত্তর দিল—বাকী কিছু নেই, কাকীমা !

বলিস্‌ কি ? সহাস্যে মাধুরী পিছন ফিরে তাকিয়েই সচকিত হ'য়ে উঠ্‌লো। পাশে নেই সুমিতা। শঙ্কিত কণ্ঠে ব'ল্‌লো—দেখ্‌তো বিজয়, সুমিতা বোধ হয় এখনও হাঁ ক'রে রাস্তায় দাঁড়িয়ে র'য়েছে !

বিজয়ও তাকে লক্ষ্য করেনি। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেল সে। সেখানে দাঁড়িয়ে মাধুরী গর্জ্জাতে লাগ্‌লো—এমন বেয়াদপ্‌ মেয়ে জীবনে দেখিনি কোনদিন ! গায়ে এক গা গয়না—ব'ল্‌লুম, তাড়াতাড়ি আয়,

না এখনও দাঁড়িয়ে গিন্নী আমার রাস্তার শোভা দেখ্ছেন! এলে একবার হয়—পিঠের ছাল-চামড়া এক ক'রে দিচ্ছি! হতভাগা মেয়ে কোথাকার—

কি হ'ল আবার? সহাস্যে সাম্নে এসে দাঁড়ালো বিনয়।

হবে আর কি? মেয়ের তোমার গুণের কথাই ব'ল্ছি!

কোথায় সে?

কে জানে! হয়ত রাস্তায়—

একটু জোর দিয়ে হেসে উঠ্লো বিনয়। তাহ'লে মেয়ের উপযুক্ত মা হ'য়েছোও বটে!

তার মানে?

মানে কোন খোঁজ খবরই রাখোনি! বহুক্ষণ পূর্ব্বে যে ওপরে উঠে গেছে! একটু থেমে ব'ল্লো, তোমায় না দেখেই ত নীচে নেমে এলাম! কিন্তু খাসা চা ক'র্তে পারে তোমার বিজয়! এখানে দাঁড়িয়েছিল, না? কোথায় গেল আবার?

তাকে আমি সুমিতার খোঁজে পাঠিয়েছি! একটু গম্ভীর স্বরে উত্তর দিল মাধুরী।

ভাল! পুনরায় মৃদু হাস্লে বিনয়। ব'ল্লো—তুমি ওপরে যাও, ততক্ষণ আমি নিজেই দরোয়ানের কাজ করি।...

কয়েক মিনিট পরে ফিরে এলো বিজয়। ব'ললো—সুমিতাকে ত খুঁজে পেলাম না কাকামণি!

সংক্ষেপে উত্তর দিল বিনয়—খোঁজের আর প্রয়োজন নেই। বৈকালের মত চট্‌ক'রে দু'কাপ তাজা চা তৈরী ক'রে ফেলতো দেখি!

বিজয় ফিরে গেল। ওপরে উঠে গেল বিনয়। মাধুরী ব'লে উঠ লো—ঘরে ব'সেছিলে এতক্ষণ, হাতটা বাড়িয়ে বাতিটা জ্বালানোর অবসর ও বুঝি পাওনি!

হাস্‌লো বিনয়। ব'ল্‌লো—পাইনি ঠিক তা নয়, তবে কি জানো—ঘরের ও মনের আলো ত আমার পাশে ছিল না,—তাই দেখ্‌লাম, বাতিটা জ্বালাও যা—নিভিয়ে রাখাও ঠিক তাই।

হেসে ফেল্‌লো মাধুরী। ব'ল্‌লো, তবু ভাল!

ঠাট্টা ক'র্‌লে যে? প্রতিটি সংসারীর মনের কথাই ত এই! গৃহিণী ঘরের আলো—সংসারজীবনের শ্রী! এ যার নেই—তার ঘরে শ্রীও নেই—শান্তিও নেই। সেই জ্বলে-পুড়ে মরে অহরহ!

পুলকের উজ্জ্বল আভায় মাধুরীর মুখখানা লাল হ'য়ে উঠ্‌লো। ব'ল্‌লো—এত বাড়িয়ে ব'ল্‌তেও তোমরা পারো!

হতাশার সুরে একটা গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রে বিনয় ব'ল্‌লো, হায়রে দুর্ভাগ্য! পুরুষের মনের কথাকে ত বিশ্বাস তোমরা ক'র্‌বে না! অথচ যা রূপক, যা অভিনয়, তার মূল্য দিতেই তোমরা ব্যস্ত হ'য়ে ওঠো। তাই হতভাগ্য স্বামীকে অবশেষে বৈরাগ্যের ঝুলি কাঁধে বইতে হয়!

হেসে উঠ্‌লো মাধুরী। ব'ল্‌লো, পার্‌বে বইতে?

বলা যায় না—বইতেও ত হ'তে পারে!

মাধুরী কি যেন উত্তর দিতে যাচ্ছিল, বাধা দিল সুমিতা। পাশের ঘর থেকে ছুটে এসে ব'ল্‌লো—দেখেছো বাবা—দাদি কেমন একটা পুতুল কিনে দিয়েছেন আমাকে? বেশ সুন্দর দেখ্‌তে, না?

বিনয় পুতুলটাকে হাতে তুলে নিয়ে বিজ্ঞের মত গম্ভীর স্বরে ব'ল্‌লো, চমৎকার! কিন্তু আমাদের রাজপুত্তুর কোথায়?

রাজপুত্তুর? বিস্ময়ে ফেটে প'ড়্‌লো সুমিতা। কুতূহলী কণ্ঠে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লো, কে বাবা?

তোমার দাদা!

দাদু তাকে বেড়াতে নিয়ে গেছেন। বুঝ্‌লে বাবা,—দাদা

ব'ল্লে ও বাড়ীতে সহজে আর পা দিচ্ছিনে ! বিজয় যেদিন দূর হ'বে, সে দিনই আমি যাবো—তার পূর্ব্বে নয় ! আচ্ছা বাবা—

বাধা দিয়ে উঠ্লো মাধুরী—ও সব বাজে কথা বলার সময় এখন নয় ! যাও, পাশের ঘরে ব'সে পড়াশুনা কর্‌গে।

মা'র কাছে ধমক খেয়ে ফিরে গেল সুমিতা। বিজয় চা নিয়ে ঘরের ভিতর এসে ঢুক্‌লো। উৎসাহিত কণ্ঠে ব'ল্‌লো, এবারে একটু খেয়ে দেখুন ত কাকামণি !

বিনয় আগ্রহভরে কাপটা তুলে নিয়ে চুমুক দিয়ে ব'লে উঠ্লো—চমৎকার ! কালই অফিসে তোমার একটা পাকা চাক্‌রীর ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি ! আরে ! মুখের দিকে তাকিয়ে র'য়েছো যে ? খেয়ে দেখো—একটি বার ! আদা দিয়ে চা—ভারী চমৎকার ! এমন মুখরোচক্, এর পূর্ব্বে কে জান্‌তো বল্‌তো ?

বিজয় দাঁড়ালো না। লজ্জায় পালোলো ঘর থেকে। মাধুরী ব'লে উঠ্লো—ব্যাপার কি বলতো ? নেশা-টেশা ক'রে ফিরেছো নাকি ?

বিনয় উত্তরে মৃদু হাস্‌লো। বল্‌লো—ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সাহসে কুলালো না। তা হ'লে ঘরে ঢুক্‌তে দিতে কি কোনদিন ?

তবে, এত উচ্ছ্বাস কিসের ?

অফিসে গেলাম ত রাগ ক'রে, কিন্তু চেয়ারে ব'স্‌তে না ব'স্‌তেই, খবর এসে গেল—প্রমোশন পেয়েছি একটা ভাল জায়গায়। আর কিছু না হোক্, মাসে প্রায় শ'-খানেক টাকার আয় ত এখন বাড়্‌লো !—না ছেলেটার পয় আছে দেখ্‌ছি ! ওর একটা ব্যবস্থা আমায় ক'রে দিতেই হবে। হাজার হোক্ ভদ্রঘরের ছেলে ত ! তাকে দিয়ে চাকরের কাজ করানোটা যুক্তিযুক্ত মনে হ'চ্ছে না।

মাধুরী উত্তর দিল না, উঠে গেল নিজের কাজে !···

*　　*　　*　　*

সুমিতা ঘুমিয়ে প'ড়েছে। কেদারনাথ একাই এসেছিলেন। ফিরে যেতে তাঁর রীতিমত একটু রাতও হ'য়ে গেল। অবশ্য তার কারণও একটা ছিল। ফেরার পথে অজয়কে বাড়ীতে পৌছে দিয়ে এসেছিলেন তিনি—বিনয়ের সঙ্গে একটা শলাপরামর্শ ক'রার উদ্দেশ্যে। কিন্তু উকিলের সঙ্গে যুক্তি না ক'রে, মনের কথা খুলে ব'লতে সাহসী হ'লেননা। কথায় কথায় তাই শুধু মাধুরীকে জানালেন—ক'দিন থেকে শরীরটা বড় খারাপ যাচ্ছে! বৈকালের দিকে প্রতিদিনই মাথা ধরে। দু'চার বার বেশী ওঠা-নামা ক'র্‌লে—বুকটাও ধড়্‌পড়্‌ করে। ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম। তিনিত ব'ল্‌লেন হাই ব্লাড্‌প্রেশার! তাঁরই নির্দ্দেশমত খাওয়ার আয়োজনটাকে এখন রীতিমত সংযত ক'র্‌তে হ'য়েছে। বিশেষ ক'রে মাংস। ওটাই ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য! একটু থেমে সখেদে ব'ল্‌লেন—সেটুকুও ছাড়্‌তে হ'লে শেষ পর্য্যন্ত।

মাধুরী জিজ্ঞাসা ক'র্‌লো, দু'এক টুকরোও কি খেতে বারণ ক'রেছেন ডাক্তারকাকাবাবু?

কেদারনাথ ব'ল্‌লেন, ওদের কথা ছেড়ে দাও মা! রোগী দেখ্‌লেই ছুরি চালাবেন—খাবারের বিধিব্যবস্থা ক'র্‌তে ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌লেন অথচ নিজেদের ওসবের কোন বালাই নই। তোমার মা টিক্‌টিক্‌ করেন। তাই—একটু সংযত হ'য়ে চলি মাত্র! তবে দু'চার টুক্‌রো যে মাঝে মাঝে একেবারে খাইনে—ঠিক্ তাও বলা চলে না!

মাধুরী ব'ল্‌লো—তা' হ'লে, এখানে একটু খেয়ে যাও না বাবা! ভেবেছিলাম তুমি এলেই ব'ল্‌বো। তারপর যে কথা তুমি ব'ল্‌লে—তা'তে আর ওকথা ব'ল্‌তে সাহস হ'চ্ছে না।

তা যখন ব'ল্‌ছো, দু'এক টুক্‌রো খেয়েই যাই! অজয়টাকে সঙ্গে নিয়ে এলেই হ'তো। আমি ইচ্ছা ক'রেই নিয়ে এলাম না। দেখ্‌তে এলাম, বিনয়ের মেজাজটা এখন কেমন! তারপর তোমার ওই

ছোঁড়া চাকরটা কেমন আছে! জ্বরটর হয়নি ত? হ্যাঁ—আর একটা কথা, অঘোরনাথের শরীরটা খুব ভেঙে প'ড়েছে শুন্‌লাম, ইতিমধ্যে তোমরা ও-বাড়ীতে আর গিয়েছিলে নাকি? আমার যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কি করি বলো? নিজের শরীরটা নিয়ে নিজেই যে একেবারে মুষ্‌ড়ে প'ড়েছি!

মাধুরী আসন পেতে আহারের ব্যবস্থা ক'র্‌তে ক'র্‌তে উত্তর দিল, আমার আর যাওয়া হ'য়ে ওঠেনি। ও গিয়েছিল—মেয়েটাও দাদুর খুব প্রিয়। ওরই তাগিদে আমাদের ছুটতেই হয় মাঝে মাঝে। বিজয়—মাঝ্‌পথে হাঁক্ দিয়ে উঠ্‌লো মাধুরী, তোর দাদুর হাতমুখ ধোয়ার জল দিয়ে গেলি না!

দাদু? বিস্ময়বোধ ক'র্‌লেন কেদারনাথ।

মাধুরী তাঁর মুখের দিকে চেয়ে হাস্‌লো। ব'ল্‌লো—হ্যাঁ, ও যে আমায় কাকীমা ব'লে ডাকে। আমার বাবা, ওর দাদু হবে না!

কেদারনাথ গম্ভীর হ'য়ে উঠ্‌লেন। ব'ল্‌লেন, কথাটা খুবই ভাল কিন্তু চাকরকে বেশী প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়—বুঝ্‌লে!

ও ভদ্রঘরের ছেলে! মা-বাবা কেউ নেই তাই রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তা ছাড়া ছেলেটা সত্যই খুব ভাল—

মুখ ধুয়ে আহারে ব'স্‌লেন কেদারনাথ। ব'ল্‌লেন—জানো ত একটা প্রবাদ আছে, কুকুরকে নাই দিলে মাথায় ওঠে। সহানুভূতি অবশ্য দেখানো খুবই উচিত, কিন্তু আচরণে সংযতও হ'তে হবে সেইসঙ্গে!···

* * *

কেদারনাথ বিজয়কে খুব ভাল চোখে দেখ্‌তে পার্‌লেন না। কারণ, অবশ্য কিছু ছিল না—তবুও অকারণে একজন একজনের প্রতি একরূপ

অশিষ্ট আচরণ ক'রে থাকেন। কেদারনাথও সেই প্রকৃতির মানুষ। তাই প্রথম দিন থেকেই তাকে সন্দেহের চোখে দেখ্‌তে সুরু ক'র্‌ছেন!

মাধুরী লজ্জা পেল বাপের আচরণে। বিশেষ ক'রে তারই সাম্‌নে কয়েকটা রূঢ় কথা শোনালেন তিনি অকারণে। যদিও সে শিশু,—হয়ত এ সবের বোঝে না কিছুই, তবুও তার সরল মনে যদি কোন অশ্রদ্ধার ছাপ একবার আঁকা হ'য়ে যায়,—সে কি কখনও আর তাঁকে শ্রদ্ধা ক'র্‌তে পার্‌বে কোনদিন? মানুষ ত অবস্থার দাস! একদিন সেও পাঁচজনের মত তার মা-বাপের আদরের বস্তু ছিল,—আজ এ জগতে তার কেউ নেই ব'লেই কি, সত্যই সে এত অশ্রদ্ধার পাত্র? মনটা একটা অজানা মমতায় দুলে উঠ্‌লো মাধুরীর। কাছে ডেকে, পাশে বসিয়ে, মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে মাধুরী ব'ল্‌লো—তুই দাদুর কথায় কিছু মনে করিস্‌নে বিজয়। হয়ত উনি তোকে একটু ভুল বুঝে থাক্‌বেন।

যে জীবনে সর্ব্বহারা,—স্নেহের বাঁধন যার চির-জীবনের মত হ'য়ে গেছে ছিন্ন, তার কাছে এ বস্তুটি যে কত অমূল্য সম্পদ, মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করে একা সেই। তাই তুচ্ছ এতটুকু স্নেহ পরশে—হৃদয়টা তার উদ্বেলিত হ'য়ে উঠ্‌লো। চোখের পাতাগুলো ঝাপ্‌সা হ'য়ে এলো অকারণে।

সে দৃশ্য দেখে মাধুরীর চোখের পাতাগুলোও অশ্রুসিক্ত হ'য়ে উঠ্‌লো। আবেগমিশ্রিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লো, তুই কাঁদছিস্‌ বিজয়?

উত্তর দিল না বিজয়। চোখের কোল বেয়ে শুধু গড়িয়ে প'ড়্‌লো ফোঁটা কয়েক জল।

সযত্নে আঁচলের খুঁটে চোখের পাতাগুলো তার মুছে দিয়ে মাধুরী ব'ল্‌লো—ছিঃ, কাঁদতে নেই!

জড়তাভরা কণ্ঠে বিজয় উত্তর দিল, আমি ত কাঁদিনে, এমনি গড়িয়ে প'ড়লো যে কাকীমা!

মাধুরী ভুলে গেল নিজেকে। তার মাতৃহৃদয় সেই মুহূর্ত্তে উদ্বেলিত হ'য়ে উঠ্‌লো। স্থান-কাল-পাত্রভেদ ভুলে মাথাটা কোলের কাছে টেনে নিয়ে ধীরে ধীরে হাত বুলোতে লাগ্‌লো।

বিনয় একটা সিগারেট ধরিয়ে আরাম কেদারায় দেহটা এলিয়ে দিয়ে আপন মনে একটু মৌজ ক'র্‌ছিল। মাধুরী ঘরে এসে দাঁড়ালো। চোখের পাতাগুলো তখনও তার সিক্ত। বিস্মিত হ'ল বিনয়। জিজ্ঞাসা ক'র্‌লো, চোখে তোমার জল কেন, মাধু?

জল? সচকিত হ'য়ে উঠ্‌লো মাধুরী। মনে পড়ে গেল সেই দুর্ব্বল মুহূর্ত্তের কথা। লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠ্‌লো চকিতে। তাড়াতাড়ি চোখের পাতাগুলো মুছে নিয়ে মৃদু একটু হাস্‌লো। ব'ল্‌লো, ও কিছু নয়!

উঁহু! মাথা দোলালো বিনয়। ব'ল্‌লো, কিছু যেন লুকোনোর চেষ্টা ক'র্‌ছো তুমি!

কৃত্রিম কোপে দুলে উঠলো মাধুরী, বেশ ক'রেছি!

ঠিক্ ঠিক্ একটু-আধ্‌টু লুকিয়ে রাখা ভালো, নইলে কুতূহল জাগবে কেন ছাই—গম্ভীর স্বরে উত্তর দিল বিনয়।

কিন্তু রাখ্‌তে দিয়েছো কি? হাসিমুখে মাধুরী একেবারে সামনে এসে দাঁড়ালো।

উত্তরে বিনয়ও হেসে ফেল্‌লো। ব'ল্‌লো, হয়ত বাহ্যিক আবরণ সবই উন্মুক্ত ক'রেছি, কিন্তু মনের দুয়ার আজও খুল্‌তে পারিনি মাধু—ওটা সম্পূর্ণ তোমার! স্বেচ্ছায় খুলে যদি না দাও—এ জগতে কারও সাধ্য নেই ওর ভেতরে প্রবেশ করে কোনদিন!

মাধুরী মুখ টিপে হাস্‌লো। ব'ল্‌লো, ওসব ভণিতা থামাও ত বাপু! রাত হ'য়েছে অনেক, চলো, ওঠো—

বসো না একটু! হাতখানা চেপে ধ'র্‌লো মাধুরীর। মাধুরী কৃত্রিম

বিরক্তি প্রকাশ ক'র্লো, রঙ্গরস আর ভাল লাগে না বাপু। একে সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি—

একটু বসো না! অনুনয়ভরা কণ্ঠে উত্তর দিল বিনয়।

মাধুরী মুখখানা ফিরিয়ে মৃদু একটু হেসে বসে প'ড়্লো পাশের চেয়ারটায়। ব'ল্লো, কি ব'ল্বে, বলো! নিজেকে গম্ভীর ক'রে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা ক'র্লো মাধুরী।

বিনয় ব'ল্লো, মুখের ভাষা সব শেষ হ'য়ে গেছে—আজ শুধু বসে বসে তোমায় দেখ্‌বো! বড় ভাল লাগ্‌ছে আমার—

কথাটা শুনে, মনে কেমন যেন একটা আতঙ্ক জাগে মাধুরীর। শিউরে ওঠে তার অন্তর। নীরবে কাছ ঘেঁসে ব'স্লোও কয়েকমিনিট। মৌনতা ভেঙে প্রথম কথা কইলো—একটা কথা বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বল কেন গো? শরীরটা খুব খারাপ বুঝি? সোহাগভরে বিনয়ের কপালের চুলগুলো ঠিকভাবে বিন্যস্ত ক'র্তে ক'র্তে ব'ল্লো, অমন ক'রে মুখের দিকে তাকিয়ে কি দেখ্‌ছো বলতো?

দেখ্‌ছি—বিনয় টেনে একটু মৃদু হাস্লো। ব'ল্লো, তোমাকে শুধু তোমাকে—

মাধুরীর হৃদয় ও মন আনন্দে উদ্বেলিত হ'য়ে উঠ্‌লো। উত্তর দিল না, পুলকের রোমঞ্চনে শুধু কাঁপ্‌লো ঠোঁটের পাতাদুটো।

বিনয় ব'ল্লো, বিস্ময় বোধ ক'র্ছো? কিন্তু সত্যই তোমায় আজ ভাল লাগ্‌ছে—বড় ভাল লাগ্‌ছে, মাধু! মনটা কেমন অজানা একটা আনন্দে ভরপুর হ'য়ে উঠেছে! বোধ হয়, সব কিছুই তাই এত সুন্দর, এত মধুর—এত রমণীয়।

মাধুরী উত্তর দিল না। স্বামীর মাথার চুলগুলো নিয়ে খেলা ক'র্তে লাগ্‌লো আপন মনে। বিনয় অপলক দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো বহুক্ষণ। অজানা একটা লজ্জার শিহরণে শিহরিত হ'য়ে উঠ্‌লো

মাধুরীর দেহমন। এই গভীর নিস্তব্ধতা আর একটি মুহূর্ত্তও তার ভাল লেগেছে না! মুখর হ'য়ে উঠ্‌লো, তুমি যা ব'লেছিলে তার কতকটা সত্যই বলা চলে!

সহসা কথাটা বুঝে উঠ্‌তে পার্‌লো না বিনয়। বিস্ময় বিমূঢ়তায় চোখের পাতাগুলো তার ঝাপসা হ'য়ে এলো। ব'ল্‌লো, কি কথা, মাধু?

কেন? তুমি যে ব'ল্‌লে—একটু মৃদু হাস্‌লো মাধুরী, ছেলেটার পয় আছে!

মনে হ'য়েছিল, ব'লেছিলাম, কিন্তু তুমিও কি কোন কিছুর সন্ধান পেলে নাকি?

মাধুরী হাস্‌লো। ব'ললো, হ্যাঁ। বাবা আজ ব'লে গেলেন, দেখ মা, শরীরটা ভাল যাচ্ছে না, ডাক্তাররা ব'ল্‌ছেন প্রেসারটা আবার নাকি বেড়েছে পূর্ব্বের মত। বুকটাও কাঁপে মাঝে মাঝে। কখন কি হ'বে ঠিক ত বলা যায় না! তাই ভাবছি সময় থাক্‌তে থাক্‌তে একটা উইল করিয়ে রাখা উচিত! তুমি বরং—একটু থেমে ব'ল্‌লো, নামটা ত আর ধ'র্‌তে পারিনে! এই—তোমাকে একটু জানিয়ে রাখ্‌তে ব'লে গেলেন, কখন কি দরকার হবে, কে জানে? আর তোমাকেও বলি, বিনয়ের চিবুকটা তুলে ধ'রে মাধুরী ব'ল্‌লো, এ সময়ে নিশ্চিন্তে আর বসে থাকা উচিত হবে না। একজন ভাল ডাক্তার দেখানোর ব্যবস্থা করো—বুঝ্‌লো!

বিনয় একটু গম্ভীরস্বরে উত্তর দিল, ইচ্ছা ত সকল সময়েই থাকে বা থাকাও উচিত, কিন্তু সঙ্গতি কোথায়? তাই ত মন দোলা দিলেও নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বসে থাক্‌তে হয়, মানুষকে! তাছাড়া আর উপায় কি বলো! একটু বিরক্তিভরেই বিনয় উঠে দাঁড়ালো। ভাব্‌লো মনে মনে—না, দু'মিনিট যে নিশ্চিন্তে এই ঘাত প্রতিঘাতপূর্ণ রূঢ় জগতটাকে ভুলে থাক্‌বো, সে উপায়টুকুও নেই! হায়রে বাস্তবমুখী জীবনের ধর্ম্ম!

* * *

কয়েকদিন পরে বিনয় সবেমাত্র অফিস থেকে ফিরে, পোষাক ব'দ্‌লে আরাম কেদারায় দেহটা এলিয়ে দিয়েছে, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন কেদারনাথ। হাতে তাঁর ড্র্যাফ্‌ট্ উইল।

ব্যস্ত হ'য়ে উঠে দাঁড়ালো বিনয়। অনুযোগভরা কণ্ঠে ব'ল্‌লো, আপনি এতখানি পথ ছুটে এলেন কেন? আমি নিজেই অবশ্য যেতাম! কিন্তু অফিসের কাজের প্রেসার এত বেড়েছে যে, সময় আর ক'রে উঠ্‌তে পারিনে। তাই যাই যাই ক'রেও যাওয়া আর হ'য়ে ওঠেনি। বসুন, বসুন! হাতে ওসব কাগজপত্র আবার কিসের?

চেয়ারের উপর চেপে বসে উত্তর দিলেন কেদারনাথ, এটা ড্র্যাফ্‌ট্ উইল। একটু দেখে শুনে রেখো। আর শোন, তোমাকেই সোল এক্‌জিকিউটর ক'রে গেলাম। যদি মরে যাই, তোমার শ্বাশুড়ীঠাকুরাণী থাক্‌বেন তোমার কাছে। আশা করি, তাঁর ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্যও তুমি রাখ্‌বে!

বিনয় লজ্জায় ম্লান হ'য়ে প'ড়্‌লো। ব'ল্‌লো, এসব কি আপনি ব'ল্‌ছেন? আমার ব'ল্‌তে যাবতীয় কিছু, সবই ত আপনার দয়ায়! নির্দ্দেশ দেবেন শুধু—যতটুকু সাধ্য, পালন ক'রে চল্‌বো যথানিয়মে।

তা আমি জানি। অন্ততঃ তোমাকে ত আমি ভাল ক'রেই চিনি, বিনয়! কিন্তু—শোন, নগদ কিছু রেখে যাওয়ার সাধ্য আমার রইলো না, যা কিছু রইলো, তা ওই বুড়ির গায়ের গয়না। জমিজমা যা ছিল কতকটা খেয়ালে প'ড়ে উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়েছি, সে ত তোমরা সকলেই জানো! একটু টেনে ব'ল্‌লেন, অবশ্য তার জন্য তোমরাও দায়ী অনেকখানি! যদি চলে না আস্‌তে, সবই থাক্‌তো তোমাদের, ইচ্ছাও ছিল তাই। একটু থেমে ব'ল্‌লেন, একটি মাত্র মেয়ে! ও সুখে স্বচ্ছন্দে থাক্‌বে, এই আশাটুকুই পোষণ ক'রতাম সকল সময়ে, কিন্তু বিধির নির্দ্দেশ যখন তা নয়, তখন আক্ষেপ করা বৃথা! তবে, পতিত জমি হিসাবে

প'ড়ে রইলো বনগ্রামটা। সহর যে ভাবে গ'ড়ে উঠ্‌ছে, ভবিষ্যতে ওটা কাজে লেগেও যেতে পারে! তাই, উইল থেকে ওটা বাদ দিয়ে মাধুমার নামে দানপত্র লিখে দিয়ে গেলাম। মৃদু হাস্যে ব'ল্‌লেন, ওরও নিজস্ব ব'লে একটা কিছু থাকা উচিত! মানুষের জীবনের কথা, কিছুই ত বলা যায়! ভগবানের আশীর্ব্বাদে তোমার এখন আয়ও ত বাড়্‌ছে কিছু কিছু! তিনিই তোমাদের সুখে রাখুন—এটুকুই জীবনের আমার শেষ কামনা!

মাধুরী হাসিমুখে সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো। ব'ল্‌লো—চল বাবা, তোমাদের দু'জনের খাবার দিয়েছি।

খাবার? এইত খেয়ে বেরিয়েছি মা! স্নিগ্ধ হাস্যে উত্তর দিলেন কেদারনাথ!

মাধুরী ব'ল্‌লো, মেয়ের বাড়ীতে এসে অমনি ফিরে যেতে আছে কি কোনদিন? তাতে যে আমাদের অকল্যাণ হবে বাবা!

অকল্যাণ?—হেসে উঠ্‌লেন কেদারনাথ। ব'ল্‌লেন, সন্তানের অকল্যাণ কোন মা-বাবা কি চিন্তা ক'র্‌তেও পারে কোনদিন? তবে লৌকিকতারও একটা মূল্য আছে! ডাক্তারের কড়া হুকুম—খাওয়া দাওয়ার বিষয়ে সংযত হ'য়ে চ'ল্‌তে হবে। তোমার মা আবার তার উপর দিয়ে চলেন। পান থেকে চূণ খসার উপায়টুকুও পর্য্যন্ত নেই?

একটু থেমে ব'ল্‌লেন, সেদিন ত লুকিয়ে খেয়ে গেলাম—মুখ দেখেই ধ'রে ফেল্‌লেন তখুনি। ঘরে পা দিতেই জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, মেয়ের বাড়ীতে কি খেয়ে এলে গো? মাধু, জানে তোমার অসুখের কথা? চুপ ক'রে রইলাম! বুড়োবয়সে, বুড়োর জীবনে—বুড়ীই ত একমাত্র পেয়াদা!—আবার পেয়াদা নইলেও দিন আর কাটে না! নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠে ব'ল্‌লেন, চলো—যখন ব'ল্‌ছো—

খাওয়া সম্বন্ধে অরুচি কোনদিন ছিল না কেদারনাথের। আজও নেই। তবে সংযত হ'তে হ'য়েছে একান্ত বাধ্য হ'য়ে—সে জন্য মনেপ্রাণে আক্ষেপও তাঁর কম ছিল না। আহারে বসেই ব'ল্লেন, দুঃখের কথা আর কাকে বলি, মা! একদিন গোগ্রাসে এই খাবারগুলো গিলেছি—আজ ওরা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে যেন ব্যঙ্গ করে বারে বারে। বুঝ্‌লে মা, তাও সহ্য ক'র্‌তে হয়! হায়রে অদৃষ্ট লিপি! তোমার অবিচারের কি শেষ আছে এ দুনিয়ায়? সন্দেশে একটা কামড় দিয়ে ব'লে উঠ্‌লেন—হ্যাঁ, হে বিনয়, তোমার সেই প্রিয় চাকরটিকে ত দেখ্‌ছিনে। সুমিতাদিদিই বা আমার কোথায়?

বিনয় উত্তর দিল, ওরা বোধ হয় বেড়াতে গেছে একটু!

শুন্‌লাম—তুমি নাকি ছেলেটার একটা চাকরী ক'রে দিয়েছো?

হ্যাঁ! কাল থেকে অফিসে যাচ্ছে—পিয়নের কাজ। মাসে দশ টাকা পাবে। তবে ছেলেটার বাহাদুরী আছে ব'ল্‌তে হবে। এই দুদিনের মধ্যেই ও সকলের প্রিয়পাত্র হ'য়ে উঠেছে। মৃদু হেসে ব'ল্‌লো —এই একটুখানি বয়সে বহু দুঃখ কষ্ট ও পেয়েছে,—তাই জানে, কি উপায়ে সকলকে তুষ্ট ক'র্‌তে হয় সহজে! একটিবার দেখিয়ে দিয়েছেন কি, আর ভাব্‌তে হবে না—চাওয়ার পূর্ব্বেই আপনার হাতের কাছে পৌঁছে যাবে সবকিছু। যদি একটু লেখাপড়া শিখে নিতে পারে —তা হ'লে—ভবিষ্যতে কেউ কেটা না হোক্‌, একটা যে কাজের ছেলে হ'য়ে উঠ্‌বে, সেকথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে এখন থেকে।

কেদারনাথ বাধা দিয়ে উঠ্‌লেন—এত উচ্ছ্বাস ভাল নয় বিনয়, একটু দৃষ্টিকটু ঠেকে! অবশ্য একটা অনাথ ছেলের ভাল হোক্‌—সেবস্তু কামনাও করে সকলে, কিন্তু তার মধ্যেও নিজেদের ব্যক্তিত্বের হাল্‌টাকে—দৃঢ় ক'রে ধ'রে রাখ্‌তে হয় নইলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার হে—ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

সুমিতা ছুটে এসে কথার মধ্যে ঝাঁপিয়ে প'ড়লো—আমার জন্যে সেই জিনিষটা এনেছো, দাদু?

না দিদি! মনেই ছিল না। অপ্রস্তুতের হাসি হেসে উঠ্‌লেন কেদারনাথ।

সুমিতার মুখখানা ভার হ'য়ে উঠ্‌লো। ব'ল্‌লো, আমার কথা তুমি প্রতিদিনই ভুলে যাও—না, দাদু? আর দাদার বেলায়—

মাধুরী ধমক দিয়ে উঠ্‌লো—এইটুকু মেয়ে, দাদার ঈর্ষায় মোলো? যা—এখান থেকে এখন যা! খাবার সময় কাউকে বিরক্ত ক'র্‌তে নেই, এক দিন ব'লে দিয়েছি, না?

সুমিতা ম্লানমুখে দু'হাতে চোখের পাতাগুলো মুছ্‌তে মুছ্‌তে বেরিয়ে গেল নিঃশব্দে।

কেদারনাথ মৃদু হাস্যে ব'ল্‌লেন—দোষটা ঠিক ওর নয় মা! ছেলেমানুষ, প্রতিদিনই আশ্বাস দিই, অথচ কাজের মাঝে ভুলে যাই নিজেই। সেদিন জিনিষটা দেখিয়ে, উপযাচক হ'য়ে আমিই ব'লেছিলাম—

ও কি চায়? মৌনতা ভেঙ্গে কথার মাঝে ঝাঁপিয়ে প'ড়্‌লো বিনয়।

বড় জাপানী একটা পুতুল!

মাধুরী ব'ল্‌লো, না, তুমি দেবে না বাবা! ঘরে কত রকমের পুতুল র'য়েছে, নোতুন কিনে মিছিমিছি পয়সার শ্রাদ্ধ বইত নয়! তাছাড়া চাইলেই দিতে হবে—সে অভ্যাসও ত খুব ভাল নয়!

কেদারনাথ ব'ল্‌লেন—ও চায়নি বরং ওকেই আমি প্রলুব্ধ ক'রেছিলাম।—আজয়কে একটা সাইকেল কিনে দিয়ে ওকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লাম, তোমার কি চাই দিদি? দিদির মুখে আমার সাড়া নেই! মাধুমাও আমার ছেলেবেলায় ঠিক এমনি প্রকৃতির ছিল। ব'ল্‌লাম—ওই যে একটা বড় ডলি পুতুল দেখ যাচ্ছে—নেবে না

কি দিদি? ও মাথা দোলালো। ব'ল্‌লাম, আজ নয়—অন্য একদিন কিনে দেবো, কি বলো?

একটু থেমে ব'ল্‌লেন, ভেবেছিলাম হয়ত ওর অভিমানে ফেটে প'ড়্‌বে! কিন্তু তার পরিবর্ত্তে ও মাথা দোলালো শুধু। মাধুরীর মুখের দিকে তাকিয়ে কেদারনাথ ব'ল্‌লেন, তুমিও ছোট বেলায় ঠিক ওই রকমের ছিলে। কারও কাছ থেকে বড় একটা কিছু নিতে চাইতে না সহজে।

*　　　*　　　*

আহার শেষ ক'রে সবে বৈঠকখানায় ব'সেছেন কেদারনাথ—বিজয় তামাক সেজে, হুঁকোটা সাম্‌নে ধ'র্‌লো এগিয়ে। একটু বিস্মিত হ'লেন কেদারনাথ। খাওয়ার পর এ বস্তুটির যে তাঁর একান্ত প্রয়োজন, তা ও জান্‌লো কেমন ক'রে? জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, তুই আমার মনের কথা জান্‌লি কেমন ক'রে?

উত্তরে বিজয় মৃদু একটু হাস্‌লো। ব'ল্‌লো—সেদিন যে আপনাকে তামাক খেতে দেখে এসেছিলুম—

তা বটে! খুশী মনে হুঁকোটা হাতে নিয়ে ব'ল্‌লেন, কিন্তু এসব ত দেখ্‌ছি একবারে নোতুন! কোথা পেলি তুই?

বিজয় মাথা নত ক'রে ধীরকণ্ঠে জবাব দিল—সেদিন খাওয়ার পর আপনার মুখখানা শুক্‌নো শুক্‌নো দেখাতে লাগ্‌লো। মনে পড়ে গেল আমার মামার কথা। তিনি ব'ল্‌তেন, দেখ্‌ বাবা—আমি দু'দিন উপোস ক'রে থাক্‌তে পারি, কিন্তু খাওয়ার পর এক ছিলিম তামাক না খেতে পেলে এতটুকুও স্বস্তি ফিরে পাই না! তাই সেদিন কাকীমাকে ব'ল্‌লাম, দাদু—

হ্যাঁ—হ্যাঁ, মাধুরী হাসিমুখে সাম্‌নে এগিয়ে এলো। ব'ল্‌লো—ব'ল্‌ছিল বটে—একটা হুঁকো আর ক'ল্‌কের ব্যবস্থা ক'র্‌তে হবে! আমিও সেই সুরে সুর মিলিয়ে ব'ল্‌লাম, দাদুকে তোর যদি একটু সেবা

করার ইচ্ছা হ'য়ে থাকে, তা করিস্ বাপু! এই নে দু'টো টাকা। একটু থেমে সহাস্যে ব'ল্লো, তারই মধ্যে সব ব্যবস্থা ক'রে রেখেছে—মায় কাঠকয়লাটি পর্য্যন্ত!

কেদারনাথ খুশী মনে ব'লে উঠ্লেন—না, সত্যই খাসা ছেলে দেখ্ছি! ভবিষ্যতে চেষ্টা ক'র্লে, মানুষ হ'লেও হ'তে পারো একদিন! অবশ্য—একটু টেনে ব'ল্লেন,—সবই ত প্রভুর ইচ্ছা!—হ্যাঁ, এবার শোন বিনয়, রাত হ'ল, তোমার শাশুড়ীঠাকুরাণী হয়ত একবার ঘর আর বার ক'র্ছেন, তা হ'লে তুমি একবার ওটা দেখে রেখো। আমি বরং কাল সন্ধ্যায় একবার এসে—

বিনয় বাধা দিয়ে উঠ্লো, তা কেন? আমি নিজেই পৌঁছে দিয়ে আস্বো। আপনাকে আর এতখানি পথ কষ্ট ক'রে আস্তে হবে না।...

উইলের জন্য ক'দিন কেদারনাথকে এবাড়ী ওবাড়ী ক'র্তে হ'ল। বিজয়ের উপর যে অজ্ঞাত একটা ক্রোধ তাঁর মনের মধ্যে দানা বেঁধেছিল, তা এ ক'দিনের মধ্যেই শান্ত হ'য়ে এলো। নিজেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক'রে উঠ্লেন—না মাধুমা, ছেলেটি দেখ্ছি সত্যই উঁচু বংশের! তার চাল-চলন, কথাবার্ত্তায় মুগ্ধ না হ'য়ে থাকা যায় না। তার উপর তামাক যা সাজে—একবার টান দিলেই শরীর মন শীতল হ'য়ে যায়। বিজয়কে লক্ষ্য ক'রে ব'ল্লেন, তা বাপু, তুমি একটু লেখাপড়া শেখ না কেন?

সুমিতা পাশে দাঁড়িয়েছিল! ব'লে উঠ্লো—বারে! ও ত প্রতিদিন বারান্দায় বসে বসে পড়ে। তুমি সেদিন যে ইংরেজী বইটা দিয়ে গিয়েছিলে—ও প'ড়ে শেষ ক'রে ফেলেছে। আমিও শিখেছি খানিকটা।

তাই নাকি ? উৎসাহিত হ'য়ে উঠ্‌লেন কেদারনাথ। ব'ল্‌লেন, কই ব'লো দেখি—কেমন শিখেছো ?

সুমিতা ছুটে বেরিয়ে গেল। পরমুহূর্ত্তে ফিরে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে। প'ড়্‌তে সুরু ক'র্‌লো—But—বাট Put—পাট।

বিজয় সঙ্গে সঙ্গে ভুল ধরিয়ে দিল—না, হ'ল না—হ'ল না ! But বাট কিন্তু Put পুট। সাধারণতঃ u-তে 'আ' উচ্চারণ হয় কিন্তু অনেক সময় 'উ'-ও উচ্চারিত হ'য়ে থাকে।

কেদারনাথ মনে মনে খুশী হ'লেন। কিন্তু আত্মপ্রকাশ ক'র্‌লেন না। ব'ল্‌লেন—হ'য়েছে, হ'য়েছে। সবটা শেষ হ'য়ে গেলে, তুমি বরং শুনিয়ে এসো দিদি ! আরও একটা ভাল বই কিনে দেবো তোমায়।

বিজয় ও সুমিতা উভয়েই ফিরে গেল। মাধুরী হাসিমুখে ঘরের ভিতরে এসে বস্‌লো। ব'ল্‌লো—বসে বসে গভীর ক'রে কি ভাব্‌ছো তুমি, বাবা ?

উত্তরে মৃদু একটু হাসি হাস্‌লেন কেদারনাথ। ব'ল্‌লেন—ছেলেটা সত্যই মেধাবী। একটু সুযোগ সুবিধা পেলে হয়ত মানুষ ও হ'য়ে উঠ্‌তে পারে একদিন !

মাধুরী সবিস্ময়ে প্রশ্ন ক'র্‌লো—কে বাবা ?

বিজয়—তোমাদের ওই বিজয় ছোঁড়াটা।

মাধুরীও মৃদু হাস্‌লো। ব'ল্‌লো—আমারও তাই মনে হয় বাবা ! তোমার জামাই সেদিন ব'ল্‌ছিল—এই ছমাসের মধ্যে ওর আরও পাঁচ টাকা মাইনে বেড়ে গেছে। খুব খাটিয়ে ছেলে কিনা, সবাই ওকে ভালবাসে। যেন বিজয় নইলে অফিস অন্ধকার !

কেদারনাথ ব'ল্‌লেন—ভালকে সবাই ভালবাসতে বাধ্য হয় মা ! প্রথম প্রথম, আমি নিজেও ওকে খুব সুনজরে দেখিনি, কিন্তু ওর আচার-

ব্যবহারে এটুকু আমি লক্ষ্য ক'রেছি, ওর মধ্যে সকলকে জয় ক'রে নেওয়ার একটা ক্ষমতা লুকিয়ে র'য়েছে! যদি ঠিক পথে চালানো যায়—ভবিষ্যৎ ওর উজ্জ্বল, আর যদি অসৎসঙ্গে পড়ে, ওর ইহকাল আর পরকাল সবই ঝরঝরে হ'য়ে যাবে!

* * *

কেদারনাথ ভেবেছিলেন তাঁর শরীরের অবস্থা দিনের পর দিন যেরূপ দাঁড়াচ্ছে, এরূপ অবস্থা যদি আরও কিছুদিন চ'ল্‌তে থাকে, তাঁকেই পরপারে যাত্রা ক'র্‌তে হবে সকলের আগে। তাই উইলের কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ ক'রে নিতে একটু ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছিলেন, কিন্তু ফলটা ফ'ল্‌লো ঠিক বিপরীত। কয়েকদিনের জ্বরে সহসা শয্যাশায়ী হ'য়ে প'ড়্‌লেন সুচারুদেবী। কেদারনাথ অবশ্য এ সবের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তাই প্রথমে একটু বিভ্রান্ত হ'য়ে প'ড়্‌লেন!

সহসা সন্ধ্যার ঠিক পূর্ব্বে মাধুরী ভেতরে এসে দাঁড়ালো। বিস্মিত হ'লেন কেদারনাথ। জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন—এমন অসময়ে এলে যে, মা?

মাধুরী ব'ল্‌লো—কি জানি মনটা দুপুর থেকে কেন যে খাঁ-খাঁ ক'র্‌ছে, কে জানে। কিছুতেই স্থির থাক্‌তে পার্‌লাম না। উনি অফিস থেকে ফিরে এলেই বেরিয়ে প'ড়েছি সঙ্গে সঙ্গে! ম্লান একটু হেসে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লো, তোমার শরীর এখন কেমন আছে, বাবা?

ভালই আছি মা!

মা?

তাঁর আজ দুদিন একটু জ্বর হ'য়েছে।

কই? খবর ত দাওনি?

সামান্য একটু জ্বর। মৃদু হাস্‌লেন কেদারনাথ। ব'ল্‌লেন—ঋতু পরিবর্ত্তনের সময়ে এ রকম ত প্রায় হ'য়েই থাকে। তা চলো মা,

ভেতরে চলো। তোমাকে দেখ্‌লে মনটা একটু খুশী হবে বরং! কিন্তু বিনয় ত কই এলো না?

একটু পরেই আস্‌ছেন! সুমিতা, ওখানে দাঁড়িয়ে হাঁ ক'রে কি দেখ্‌ছিস্‌? চল্‌, ভেতরে চল্‌! একটু মৃদু হেসে মাধুরী ব'ল্‌লো—এর আবার হাঁ ক'রে রাস্তার দিকে চেয়ে থাকা একটা রোগ। কি যে দেখে, ও-ই জানে! ছেলেটা ঘরে ঢুক্‌লে সহসা আর বাইরে বেরুতে চায় না, আর মেয়েটা হ'য়েছে ঠিক তার বিপরীত। বাইরে বেরুলে, ঘরে আর ওর মন বসে না!

কেদারনাথ ব'ল্‌লেন—শিশুদের প্রকৃতিই এই! চলো মা, ডাক্তার-বাবুরও আসার সময় হ'য়ে এলো। অঘোরনাথ কাল এসেছিলেন। শরীরটা ওঁরও খুব ভেঙে প'ড়েছে দেখ্‌লাম। কয়েক সেকেণ্ড থেমে পুনরায় মুখর হ'য়ে উঠ্‌লেন—অজয় কিন্তু ওর দাদির জন্যে খুব খাট্‌ছে! মানে—একটু হেসে উঠে ব'ল্‌লেন—সকল সময়ে দাদির কাছে কাছেই সে র'য়েছে।

কথায় কথায় ঘরের সাম্‌নে এসে দাঁড়ালেন কেদারনাথ। হাঁক দিয়ে উঠ্‌লেন—অজয়, ও অজয়, কে এসেছে দেখো?

কোন সাড়া নেই।

দরজাটা ঠেলে ভেতরে ঢুকে বিস্ময়ে হতবাক হ'য়ে প'ড়্‌লেন কেদারনাথ। কোথায় অজয়? বহু পূর্ব্বেই সে সঙ্গীদের সঙ্গে পালিয়েছে খেলারমাঠে। একা বেঘোরে শুয়ে আছেন সুচারু-দেবী। পদশব্দে তাঁর সহজ জ্ঞানটা ফিরে এলো কয়েক মিনিটের জন্য। ক্ষীণকণ্ঠে ভাঙা ভাঙা স্বরে ব'লে উঠ্‌লেন—একটু জল, জল দাও ত আমায়!

মাধুরী এগিয়ে গেল। জলের গেলাসটা মুখের সাম্‌নে তুলে ধ'রে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লো—এখন কেমন আছো, মা?

কয়েক ঢোঁক জল গিলে একদৃষ্টে সুচারুদেবী মাধুরীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কণ্ঠস্বর তাঁর জড়তাপূর্ণ। সেকেণ্ড সাত-আট পরে কি যেন ব'লতে চেষ্টা ক'রলেন, কিন্তু ভাল শোনা গেল না। শুধু বোঝা গেল কয়েকটা কথা—এসেছো! ভাল ক'রেছো—বসো! পরমুহূর্ত্তেই তার হাতখানা টেনে নিয়ে বুকের উপর রেখে ফিস্ ফিস্ ক'রে ব'ল্‌লেন, এখানে একটু হাত বুলিয়ে দাও না মা!

মাধুরী তাঁর সারা অঙ্গে হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌লো। সুচারুদেবী সঙ্গে সঙ্গে চোখের পাতাগুলো নিলেন বুজিয়ে। মুখে তাঁর ফুটে উঠ্‌লো একটা সুগভীর তৃপ্তির ছায়া! কিন্তু কয়েক মিনিটের ব্যবধানে পুনরায় তিনি হারিয়ে ফেল্‌লেন জ্ঞান।

মাধুরী সহসা ডাক দিল—মা? উত্তর এলো না। সভয়ে কেদারনাথকে ব'ল্‌লো—মার কোন সাড়াশব্দ পাচ্ছি না। ডাক্তারকাকাবাবুকে একবার ডেকে পাঠালে না কেন, বাবা? আমার কেমন যেন ভয় ক'রছে!

কেদারনাথ প্রতিবাদ ক'রলেন না। বরং সেই মুহূর্ত্তেই ছুট্‌লেন ডাক্তার চক্রবর্ত্তীর কাছে।

মিনিট পাঁচ সাতের মধ্যে কেদারনাথ ডাঃ চক্রবর্ত্তীকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলেন। হাতের পাল্‌সটা পরীক্ষা ক'রেই তিনি পর পর দুটো ইন্‌জেক্‌শন্ দিলেন—কিন্তু তাঁকে বেশীক্ষণ ধরে রাখা গেল না। সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন ক'রে তিনি যাত্রা ক'রলেন পরপারে।

* * *

মাধুরী ছুটে এসেছিল প্রাণের টানে, সুগভীর মমতার আকর্ষণে। কিন্তু কে জান্‌তো—এই যাত্রাপথেই তাকে হারাতে হবে জীবনের প্রিয়তম পাত্রকে! মুষ্‌ড়ে প'ড়্‌লো সে একেবারে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌লো সারাক্ষণ। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সব কাজ শেষ ক'রে ফিরে এলেন

কেদারনাথ, তাঁর গম্ভীর অবসাদগ্রস্ত মুখের দিকে তাকিয়ে নিজেকে সংযত ক'রে তুল্‌লো মাধুরী। পাশে এসে ব'স্‌লো কয়েক মিনিট। পরে শান্তকণ্ঠে ব'ল্‌লো—সারাদিন ত কিছু খাওনি, একটু কিছু মুখে দেবে চলো না, বাবা!

খাওয়ার ইচ্ছে নেই মা!

তাহ'লেও মুখে একটু কিছু না দিলে চ'ল্‌বে কেন? চলো—হাতখানা চেপে ধ'র্‌লো মাধুরী।

কেদারনাথ মুখ তুলে তাকালেন। এ মুখ তিনি বহুবার দেখেছেন। নবজাত সেই রক্ত-মাংসপিণ্ড থেকে আরম্ভ ক'রে সংসারী গৃহিনী মাধুরীকে অবিরত দেখেছেন, আদরও ক'রেছেন—কিন্তু এ রূপ তার দেখেননি! মিলিয়ে দেখার আবশ্যকতা সেদিন ছিল না ব'লেই হয়ত সে প্রয়োজন বোধটা তাঁর, অপ্রয়োজনের ঝুড়িতে পরিত্যক্ত ও রুদ্ধ ছিল এতদিন। অথচ যখন সেই জীবন্ত প্রতিমাকে নিষ্ঠুর পাষাণের মত জ্বলন্ত অঙ্গারে ভস্মীভূত ক'রে ফিরে এলেন ঘরে, শূন্য রিক্ত হৃদয় একটা অবলম্বনের আশায় যখন ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌লো—ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই, মনের রুদ্ধ দ্বারটা খুলে কে যেন ফিস্ ফিস্ ক'রে ব'লে উঠ্‌লো,—আরে, এ যে তারই জীবন্ত প্রতিচ্ছবি! সেই চোখ, সেই মুখ, সেই হাসি—হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্পষ্টতর যেন সেই অতীতের স্মৃতিচিহ্নগুলো! বিস্ময়-বিমূঢ় কেদারনাথ, ধ্যানী যোগীর মত প্রকৃতিস্থ হ'য়ে উঠ্‌লেন পর মুহূর্ত্তে। নীরবে বসে বসে ভাবেন, স্মৃতি—হ্যাঁ, তাঁরই ফেলে যাওয়া স্মৃতি, অতীত জীবনের সাক্ষ্য। রক্ত-মাংসে রচিত সেই অতীতের ইতিহাস। হ্যাঁ···হ্যাঁ—তারা তাই জীবনের দ্বারে এত প্রিয়—এত আদরের! পরমুহূর্ত্তেই ঠোঁটের কোণে ভেসে উঠ্‌লো ম্লান একটু হাসি।···এরই নাম স্মৃতি। অতীতকে বাঁচিয়ে রাখার পাথেয়,·· জীবনের সঞ্চয়—তাই—হ্যাঁ, তাই তার মূল্য এতো বেশী!

মাধুরী একটু দৃঢ়ভাবে তাঁর হাতখানা আকর্ষণ ক'রে ব'ল্‌লো—চলো বাবা, চলো—

অবসন্ন দেহ, অবসাদগ্রস্ত মন। কোন কিছুই আজ আর তাঁর ভাল লাগ্‌ছে না এ দুনিয়ায়! তবুও প্রতিবাদ এখানে নিরর্থক। নীরবে উঠে দাঁড়ালেন কেদারনাথ। ব'ল্‌লেন—বেশ, চলো! কয়েক পা অগ্রসর হ'য়ে পুনরায় থম্‌কে দাঁড়ালেন কয়েক সেকেণ্ড। নিজের মনে নিজেই ব'লে উঠ্‌লেন—জোড়ের পাখী! একটি চলে গেল, দিন আর বেশী নেই, মা—দিন আর বেশী নেই! ··

কেদারনাথের সেবা-যত্নের লোকের অভাব ছিল না। বিহারী তাঁর বহুদিনের পুরাতন ভৃত্য। সব কিছুই সে দেখাশুনা ক'রে এসেছে এতদিন! তবুও নিশ্চিন্ত হ'তে পার্‌লো না মাধুরী। ব'ল্‌লো—জীবনের শেষের এই ক'টা দিন, তুমি আমার কাছেই না হয় থাক্‌বে চল না বাবা!

উত্তরে কেদারনাথ মৃদু হাসলেন। ব'ল্‌লেন, তা কি হয় মা! তার চেয়ে বরং আমি বলি—এমনি দু'টো সংসারের জন্যে হান্‌টান্‌ না ক'রে তুমিই না হয় বুড়ো বাপের কাছে থাকোনা কিছুদিন! বিনয়ও ত এখান থেকে অফিসে যাতায়াত ক'র্‌তে পারে অনায়াসে!

মাধুরীর মন কিন্তু নিজের-হাতে-গড়া সংসার ফেলে এখানে বসবাস ক'র্‌তে সহজে রাজি হ'ল না। ব'ল্‌লো, তা কি হয়? জিনিষ-পত্তর কত কি আছে সেখানে, লোক না থাক্‌লে চলে কি একটি মুহূর্ত্ত?

বিজয় না হয় থাক্‌না ওখানে!

একা ছেলেমানুষের উপর নির্ভর করা উচিত হবে কি?

তাহ'লে তোমাকেই ত ফিরে যেতে হয়, মা!

তা ত পারি না, বাবা!

কিছুক্ষণ নীরব থেকে কেদারনাথ ব'ল্লেন—এ-ছাড়া আর উপায়ও ত দেখ্ছিনে!

আসুন ত উনি! প্রসঙ্গটা চাপা দিয়ে উঠে গেল মাধুরী। কেদারনাথ বসে বসে তেমনি ঘন-ঘন গড়্গড়ায় টান দেন আর ধোঁয়া ছাড়েন বার বার।...

* * *

শেষ পর্য্যন্ত কেদারনাথের কথায় রাজী হ'ল বিনয়। মাধুরী এ-বাড়ীতেই থাক্‌বে—মাঝে মাঝে প্রয়োজনমত বরং ও-বাড়ীতে গিয়ে দেখাশুনা ক'রে আস্‌বে। বিজয় সঙ্গে রইলো, তার অসুবিধা দেখা দেবে না বড় একটা। তবে সুমিতাকে সে অফিস্ থেকে ফেরার পথে নিয়ে যাবে, দিয়ে যাবে অফিস যাওয়ার পথে।

কেদারনাথ ব'ল্লেন, এতে তোমার কষ্টের শেষ থাক্‌বে না বিনয়! তার চেয়ে মাধুরী ও-বাড়ীতেই থাকুক্—দুপুরে বরং এ-বাড়ীতেই পৌঁছে দিয়ে যেয়ো।

সেই একই কথা! মৃদু হাস্‌লো বিনয়। ব'ল্লো, ও কাছে না থাক্‌লে আপনার যে ভীষণ কষ্ট হ'বে! শুধু তাই নয়, তারও ত একটা কর্ত্তব্য ব'লে বস্তু আছে!. কষ্ট—একটু টেনে হেসে উঠে ব'ল্লো—সংসারে বাস ক'রে এটুকু না ক'র্‌লে চল্‌বে কেন বলুন ত!

কেদারনাথ নিরুত্তর!

বিনয় ব'ল্লো, সেই ভাল! আপনি আর দ্বিমত ক'র্‌বেন না। বিজয় যখন আছে, কষ্ট ত আমার হ'বেই না, সুমিতারও কোন অসুবিধা হ'বে ব'লে মনে হয় না সহসা। তা-ছাড়া আপনি নিজেও ত বোঝেন ঘরে ছেলেপিলে না থাক্‌লে একদণ্ড তিষ্ঠতে পারা যায় না! অজয় যেমন আছে থাকুক্, মেয়েটা বরং আমার কাছেই থাক্!

কেদারনাথ রাজি হ'লেন তার কথায়। কিন্তু দিন যতই যায়, ততই মুষ্‌ড়ে পড়েন তিনি। মাধুরীর হৃদয় শঙ্কায় দুলে ওঠে। বলে—তুমি একজন ভাল ডাক্তার দেখাও না, বাবা! শরীরটা যে তোমার দিনের পর দিন ভেঙ্গে প'ড়্‌ছে একেবারে।

কেদারনাথ উত্তরে মৃদু হাসেন। বলেন, ও কিছু না, মা! হাসি-খুশির মধ্যে দিন ত আমার কেটে যাচ্ছে পরমানন্দে! এর বেশী এ বয়সে আশা রাখা উচিত কি কোনদিন?

আমি কিন্তু লক্ষ্য ক'রেছি, তুমি কি যেন গভীর ক'রে বসে বসে ভাবো রাতদিন!

নিজের দুর্ব্বলতা গোপন করার আশায় একটু জোর দিয়ে উপহাস্যের অট্টহাসিতে ফেটে প'ড়্‌লেন কেদারনাথ। ব'ল্‌লেন, কি যে তুমি বলো, মা!

আমার কাছে তুমি কিছু লুকিয়ো না, বাবা! মুখের দিকে তাকালেই যে তোমার অন্তরের সকল কথা উপলব্ধি ক'র্‌তে পারি আমি!

একটু থেমে সজল নেত্রে মাধুরী ব'ল্‌লো, আমি জানি, মা'র মত সেবা তোমায় আমি ক'র্‌তে পারিনে—কিন্তু তুমি ত আমার বাবা! মেয়ের সেইসব ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো কি শুধ্‌রে নিতে পারো না?

গম্ভীর হ'য়ে উঠ্‌লেন কেদারনাথ। কয়েক মিনিট নীরব থেকে ব'ল্‌লেন—ত্রুটি ঠিক তোমার নয় মা, ত্রুটি আমার—আমার মনের।

বিস্ময়ে ফেটে প'ড়্‌লো মাধুরী।

কেদারনাথ ব'লে চ'ল্‌লেন—এ দুনিয়ায় গর্ভধারিণী মা—আর মেয়ে,—উভয়েই একশ্রেণীর জীব মা! তাদের কাছ থেকে যেটুকু প্রাপ্য, সেটুকু পরিপূর্ণ রূপেই আমরা পেয়ে থাকি—একটু থেমে ব'ল্‌লেন, তবুও দেহ-মনের পূর্ণতা সহজে আসে না!

মাধুরী নীরব।

কেদারনাথ ব'ল্লেন, এই দেখ না—তোমার মা, কিছুই প্রায় ক'র্তেন না নিজের হাতে। বেহারাই দিত তামাক, দিত জল, দিত সময়মত খাবার। বসে বসে শুধু তিনি তদারক ক'র্তেন—তাতেই দেহ-মন আনন্দে ভরপুর হ'য়ে উঠ্‌তো, মনে হ'তো সবকিছুই যেন অমৃত, অথচ তুমি ত মা সকল সময়েই এই বুড়ো বাপ্‌কে নিয়ে ব্যস্ত! নিজে হাতেই ক'রে চ'লেছো সব—তবুও মনটা সাড়া দেয় না। বরং প্রতিটি মুহূর্ত্তে স্মরণ করিয়ে দেয় স্মৃতি-বিজড়িত অতীত দিনগুলোর কথা। আমি নিজেও মনকে প্রশ্ন ক'রেছি বহুবার—কেন এরূপ হয়? সঠিক উত্তর খুঁজে পাই না। অবশেষে অনুমান ক'রে নিতে বাধ্য হই, হয়ত একসঙ্গে বহুদিন বসবাস ক'রেছি, সুখ-দুঃখের সম-অংশ জীবনে গ্রহণ ক'রেছি, তাই তাঁর সামান্য উপস্থিতির মধ্যে হৃদয় খুঁজে পেত অনাবিল আনন্দের গভীর একটা সুখ-পরশ! একটু থেমে ব'ল্‌লেন, আজ—তারই অভাবে হৃদয়টা কাঁদে বারবার। নির্জ্জনে ব'স্‌লে মনে ভেসে আসে সেই পুরোনো দিনগুলোর স্মৃতি। ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করি,—কিন্তু অবোধ মনটাকে কোনমতেই বোধ মানাতে পারিনে, মা!

মাধুরী উত্তর দিল না। চোখের পাতাগুলো ছলছল ক'রে উঠ্‌লো। নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে নিজেও উঠে দাঁড়ালো। ভাবলো, মনের গতিধারার রূপই ত এই! প্রিয়জনকে কি এত সহজে ভোলা যায় কোনদিন?···

* * * * *

ডাক্তার অমিয় চক্রবর্ত্তী কেদারনাথের সমবয়সী না হ'লেও অকৃত্রিম বন্ধু এবং গৃহ চিকিৎসকও বটে! শেষ পর্য্যন্ত তাঁরই ডাক প'ড়্‌লো। মাধুরী ভেবেছিল, চিকিৎসার একটা সুবন্দোবস্ত হ'লে, নিশ্চয় তিনি সেরে উঠ্‌বেন অল্প কয়েকদিনের মধ্যে। কিন্তু কোন সুফল দেখা গেল না, অধিকন্তু 'প্রেশারটা' বেড়েই চ'ল্‌লো দিনের পর দিন।

উৎকণ্ঠিত চিত্তে মাধুরী সুধালো, কি হবে ডাক্তারকাকাবাবু?

ডাক্তার চক্রবর্ত্তী ব'ল্লেন, চিকিৎসার ত্রুটি ত আমি রাখিনে! একটু থেমে ব'ল্লেন, কিন্তু কি ক'র্‌বো বল, মা—যে রোগী দিনরাত কেবল মনের কোণে জট্ পাকায়—চিন্তা করে, তাঁর রোগ কি সহসা সারানো যায়?—তাই ত বার বার বলি, চিন্তা না কমালে চিকিৎসার সুফল পাওয়া সম্ভব নয় কোনদিন!

কেদারনাথ উত্তরে মৃদু হাস্‌লেন। ব'ল্লেন, আরে ভাবি, ছাই—কোথায়? সেগুলো যে ছায়া-ছবির মত দিনরাত চোখের পাতায় ভেসে ভেসে বেড়ায়! তার গতি কি রোধ করা সম্ভব কোনকালে?

ডাক্তার চক্রবর্ত্তী ব'ল্লেন, এ-জগতে অসম্ভব ব'লে কোন বস্তু নেই কেদারবাবু! নাতি-নাতনীদের নিয়ে হৈ-চৈ করুন,—হাসুন, আহ্লাদ-আমোদ করুন—মনটা খোশ্‌মেজাজে ভরপূর হ'য়ে থাক্‌বে!

হেসে উঠ্‌লেন কেদারনাথ। ব'ল্লেন, চেষ্টার ত্রুটি করিনে কিন্তু মনটার সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার শক্তি যে গেছে ফুরিয়ে। তাই হৈ-চৈ ক'রে নিজেকে ক্ষণিক ভুলে থাকা সম্ভব হ'লেও অবুঝ মনটা ফিরে যায় নিজেরই আবর্ত্তে।

চেষ্টা করুন। নইলে শরীরটা যে একেবারে ভেঙে প'ড়ছে! চেষ্টার অসাধ্য কিছু আছে কি এ-জগতে?

হয়ত নেই! একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে খাড়া হ'য়ে উঠে ব'স্‌লেন কেদারনাথ। ব'ল্লেন, সব কিছুই যে জগতে আয়ত্বাধীন—এ ধারণাটা কিন্তু একেবারে ভুল ডাঃ চক্রবর্ত্তী। কারণ, জীবনেরও একটা ধর্ম্ম আছে! তাই রূপ তার ভিন্ন পথগামী। কথায় কথায় আপনারা বলেন, চেষ্টা করুন, চেষ্টা করুন। কিন্তু বলার চেয়ে রূপদান যে যথেষ্টই কষ্টকর, আপনি নিজেও কি অস্বীকার ক'র্‌তে পারেন কোনদিন? একটু থেমে মৃদু হেসে ব'ল্লেন, তর্ক নিষ্প্রয়োজন,

তবুও আপনাদের, পুরুষ-প্রকৃতির রূপ একটিবার নিভৃতে বসে চিন্তা ক'রে দেখ্‌তে অনুরোধ করি!

ডাক্তার চক্রবর্ত্তী উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, চেয়ারের উপর চেপে বসে প'ড়্‌লেন পুনরায়। ব'ল্‌লেন, কথাটা ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পার্‌লাম না—একটু স্পষ্ট ক'রে খুলে বলুন ত দেখি!—দেখ্‌বো চেষ্টা ক'রে, যদি সে ত্রুটি-বিচ্যুতিকে সংশোধন ক'রে নেওয়া ভবিষ্যতে—

অসম্ভব! মাঝপথে ঝাঁপিয়ে প'ড়্‌লেন কেদারনাথ। ব'ল্‌লেন, মাধু মা আমার কোন ত্রুটি রাখেনি। তবুও সম্ভব হ'ল না! কারণ, প্রকৃতির রূপ বদ্‌লানো যায় না কোনদিন! বুঝলেন ডাক্তার—ওটা মানুষের সাধ্যের অতীত বস্তু—!

কি যে বলেন? উপেক্ষার হাসি হাস্‌লেন ডাঃ চক্রবর্ত্তী। ব'ল্‌লেন, বিজ্ঞানের দয়ায় আজ জগতে কি সম্ভবপর নয় বলুন ত? মানুষ আকাশে উড়্‌ছে, দু'বছর পরে হয়ত তারা চাঁদ, মঙ্গল কিংবা পৃথিবীর কাছাকাছি যে কোন গ্রহে অভিযান সুরু ক'রে দেবে, আর আপনি সেই বৈজ্ঞানিক যুগকে উপহাস ক'র্‌ছেন? খবরের কাগজে দেখেননি, আজকাল গ্ল্যাণ্ড কাটিয়ে পুরুষকে নারী, আর নারীকে পুরুষে পরিণত ক'রা হ'চ্ছে!

হ'চ্ছে—কথাটা আমিও বিশ্বাস করি। কিন্তু সকলের রূপান্তর সম্ভব নয় ডাঃ চক্রবর্ত্তী। গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন কেদারনাথ।

তার মানে? সবিস্ময়ে প্রশ্ন তুল্‌লেন ডাঃ চক্রবর্ত্তী।

যারা নরও নয়, নারীও নয়, ছিল উভয়ের মাঝামাঝি—তাদের আপনারা একটা রূপ দিতে সমর্থ হ'য়েছেন—কিন্তু আমার রূপ আপনারা বদ্‌লে দিতে পারেন কি কোনদিন?

ধীরে ধীরে তাও হয়ত 'অসম্ভবের' গণ্ডীটা কাটিয়ে যাবে। আজ অবিশ্বাসের হাসি হাস্‌ছেন, কাল কিন্তু সেরূপ দেখে বিস্ময়ে ফেটে প'ড়ে

ব'ল্‌বেন, আরে, এঁরা বলে কি? করে কি? সৃষ্টির রূপ কি তবে সবই দেবে ব'দ্‌লে? নিজের মনে নিজেই খুশিভরে হেসে উঠ্‌লেন ডাঃ চক্রবর্ত্তী। ব'ল্‌লেন, প্রয়োজন হ'লে—তাও দিতে হ'বে বইকি!

কেদারনাথ আরাম কেদারায় পুনরায় দেহটা এলিয়ে দিয়ে ব'ল্‌লেন—মানুষের আশার শেষ নেই ডাক্তার! আপনারা আশাবাদী, বয়সেও তরুণ। শক্তি-সামর্থ্যে আমাদের তুলনায় যথেষ্ট নবীন, ও তাজা র'য়েছেন নিঃসন্দেহ। সুতরাং, স্বপ্নে মস্‌গুল থাকাটা অন্যায় কিছু ত নয়ই বরং এটাই ত প্রকৃতির রীতি! তবুও বলি, বয়সের একটা দাম আছে। তার অভিজ্ঞতা কি বলে জানেন? বিজ্ঞান মানুষের এই ক্ষয়িষ্ণু শক্তি-টাকে হয়ত একটু সংযত ক'রে, তার স্থায়ীত্বের মেয়াদটাকে আরও কিছুদিন বাড়িয়ে দিতে সমর্থ হ'বে, কিন্তু ক্ষয় তার রোধ সম্ভব হবে না কোনদিন। কারণ, প্রকৃতির সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মত শক্তিশালী দ্বিতীয় বস্তুর সৃষ্টি হয়নি এ পৃথিবীতে। তাই হার আমাদের মান্‌তেই হয়! একটু থেমে ব'ল্‌লেন, উত্তেজিত না হ'য়ে একটু স্থির ও ধীর চিত্তে ভেবে দেখুন ত, শরীর তাজা রাখার জন্য আমরা কত চেষ্টা, কত যত্নই না করি দিনের পর দিন! তবুও কি সেই শক্তিকে ধ'রে রাখা সম্ভব হ'ল? নিজের প্রশ্নে নিজেই খুশীতে ভরপুর হ'য়ে ব'লে উঠ্‌লেন, হ'ল না! সময়মত এলো প্রৌঢ়ত্ব, এলো বার্দ্ধক্য, সেই ক্ষয়ের শেষ সীমান্তে-মৃত্যু, সেও আস্‌বে নিজের খুশিমত। কই মানুষ ত তার গতিরোধ ক'র্‌তে সমর্থ হ'ল না!

উত্তরে মৃদু হাস্‌লেন ডাঃ চক্রবর্ত্তী। ব'ল্‌লেন, তাকে ধ'রে রাখার কৌশল আমরা ভুলে গেছি। বিজ্ঞান ত সেই পথই বাৎলে দিতে চায়!

চায় ব'ল্‌বেন না ডাক্তার, বরং বলুন চেষ্টা ক'রে চ'লেছে। আমিও বিশ্বাস করি তাই। কিন্তু যখন চেয়ে দেখি, দুধই খাই, ক্ষীরই খাই, আর শাকভাতই খাই—সময় এলে, যৌবন আস্‌বেই

আসবে, তার শ্রী দেহ-মনের রূপলাবণ্যকে নিজস্ব ব্যক্তিত্বের স্বচ্ছ-ধারায় মহিমান্বিত ক'রে তুলবেই তুলবে, তখন বিস্ময় বোধ করি। কিন্তু কেন হয়, এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে কেউ কি পেয়েছে কোনদিন ?

ডাঃ চক্রবর্ত্তী নীবর।

কেদারনাথ মৃদু হাসলেন। ব'ললেন, হয়ত ভাবছেন ওটা প্রকৃতির খেয়াল—তাই হয়! খুশী হ'লেই জাগে, খুশী হ'লেই চলে যায়। আমিও বলি ঠিক তাই। প্রকৃতির নিজস্ব প্রয়োজনে সে করে সৃষ্টি, যেদিন তার সেই প্রয়োজনের ঘটে অবসান, সেদিন সে নিজেই নিজের খুশী মাফিক্ নিজস্ব সৃষ্টিকে তিলে তিলে ক্ষয়ের পথে পরিচালিত ক'রে নিয়ে চলে। তাই জন্ম বা মৃত্যু—মানুষের শক্তি সাধনার বাইরের বস্তু। তাকে ঠিকমত নিয়ন্ত্রণ ক'রতে আজও আমরা সমর্থ হইনি। যদিও বিজ্ঞানের দায়ায়—একটু থেমে ব'ললেন—সে প্রকৃতির রহস্যকে উদ্ঘাটনের চেষ্টা চ'লেছে অবিরত, তবুও তার সেই দান, প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যের মত কলাকুশলপূর্ণ নয়, সে দান জড় ও বিকৃতিপূর্ণ।

ডাঃ চক্রবর্ত্তী উত্তরে মৃদু হাসলেন। ব'ললেন, তা হ'লে বিজ্ঞানের সেই শক্তিকে আপনিও স্বীকার করেন!

সত্যকে অস্বীকার ক'রবো কোন্ দুঃসাহসে। কিন্তু রূপ যে তার পরিপূর্ণ নয়, একথা আপনিও ত অস্বীকার ক'রতে পারেন না ডাঃ চক্রবর্ত্তী!

ভুল ক'রছেন কেদারবাবু! এটা মানুষের প্রাথমিক প্রচেষ্টা! তাই সাধনা তার পূর্ণতা লাভ করেনি, কিন্তু কোনদিন যে ক'রবে না, একথা জোর দিয়ে ত আপনি ব'লতে পারেন না কোনদিন!

পারি না সত্য, কিন্তু—একটু টেনে পাশের দরজার দিকে তাকিয়ে কি যেন লক্ষ্য ক'রলেন, তারপর মুখর হ'য়ে উঠলেন—মানুষের এই যে প্রচেষ্টা, এর সফলতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আজও বিদূরিত হয়নি।

ওটা আপনার ভ্রান্ত ধারণা! একটু জোর দিয়ে হেসে উঠ্‌লেন ডাঃ চক্রবর্ত্তী। তারপর ব'ল্‌লেন, যাই বলুন কেদারবাবু, ও আপনার চল্‌তি পদ্ধতির প্রতি অকারণ একটা মোহ ছাড়া অন্য কিছুই নয়! বিশ্বাস করেন ত, এটা জ্ঞানের যুগ, সমালোচনার যুগ—প্রতিটি বস্তু মিলিয়ে দেখার যুগ! এ যুগে ফাঁকা কথায় লোককে আর বোঝানো যায় না সহজে!

কেদারনাথ উত্তরে মৃদু হাস্‌লেন। শান্তকণ্ঠে ব'ল্‌লেন, আপনার কথাগুলো মেনে নিয়েও যদি প্রশ্ন করি আপনার যুক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যথেষ্ট ফাঁক র'য়ে গেছে, তার প্রত্যুত্তর দেবেন কি?

নিশ্চয় দেবো!

আপনাদের বৈজ্ঞানিক সমাজ কিছুদিন পূর্ব্বে আবিষ্কার ক'রেছিলেন, টিউবের সাহায্যেও সন্তান উৎপাদন সম্ভবপর। তার কাজে তাঁরা এগিয়ে গেছেনও অনেকখানি। কিন্তু দেখা গেল, ছেলেও হ'ল, মানুষের আকৃতি-প্রকৃতিও পেল, কিন্তু মনটা ঠিক প্রকৃতি-জাত সন্তানেরমত সবল, সুস্থ ও কর্ম্ম-প্রয়াসী হ'য়ে উঠ্‌লো না। বৈজ্ঞানিকগণ আবিষ্কারের আনন্দে, দিশেহারা হ'য়ে প'ড়্‌লেন, তথাকথিত ভক্তের দলও উৎসাহিত হ'য়ে উঠ্‌লেন, 'মার দিয়া কেল্লা'! আচ্ছা, বলুন ত ডাক্তার, সত্যই কি তাঁরা বাজীমাৎ ক'র্‌তে পেরেছেন?

নিশ্চয়! এতদিন যে সংস্কারের দৃঢ় গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ আমরা ছিলাম, সে গণ্ডীটাকে ত আমরা উল্লঙ্ঘন ক'র্‌তে সমর্থ হ'য়েছি!

গম্ভীর কণ্ঠে মাথাটা দুলিয়ে কেদারনাথ ব'লে উঠ্‌লেন, উল্লঙ্ঘন ক'র্‌ছেন সত্য, কিন্তু প্রকৃতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে জয় ক'র্‌তে পারেননি।

তার মানে?

মানে? মৃদু হাস্‌লেন কেদারনাথ। ব'ল্‌লেন, প্রকৃতিসৃষ্ট পথ ধরে বৈজ্ঞানিকদেরও অগ্রসর হ'তে হ'ল। কৃত্রিম উপায়ে, আনুসঙ্গিক

আয়োজন ও প্রয়োজন পরিপূরণের ব্যবস্থাও অবলম্বন ক'রতে হল! ফলে, সৃষ্টির ফসল পাওয়া গেল কিন্তু পাওয়া গেল না তার চিত্ত-প্রসারী সহজাত সেই চিন্তা রূপের ধারা। একটু থেমে ব'ললেন, পেল শুধু উগ্র পশু-প্রবৃত্তির চেতনা। আপনারা হৈ-হৈ ক'রে উঠলেন—সৃষ্টি ত হ'ল! আমিও বলি, হ'ল—কিন্তু রূপ তার ঠিক পরিপূর্ণ হ'ল না! এটাই প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য আর মানুষের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গির ব্যর্থতা।

ব্যর্থতা? বলেন কি? এত বড় আবিষ্কারকে আপনি উপহাসে উড়িয়ে দিতে চান, কেদারবাবু?

উড়িয়ে ঠিক দিই না, উপহাসও আমি ক'রছি না। শুধু ব'লছি, প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যকে আজও জয় করা গেল না। ভবিষ্যতে যাবে কিনা তাও সঠিক আমি জানিনে, তবে আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস এই যে, জয় তাকে করা যাবে না। এর প্রতিবাদে হয়ত ব'লবেন, আরে এটা ত প্রাথমিক প্রচেষ্টা! গবেষণার কাজ আজও ত তাঁদের শেষ হয়নি। উত্তরে তার, আমি বলি, সবই ঠিক। হয়ত একদিন দেখা যাবে, যে মনের আমরা বড়াই করি, বৈজ্ঞানিকগণ মানুষের সেই মনটাকে ধরে রাখার যন্ত্রও একটা আবিষ্কার ক'রে ফেলেছেন। সেদিন হৈ-চৈ-এর গণ্ডীটা আরও একটু বেড়ে যাবে নিঃসন্দেহ, কিন্তু আমার অভিমতে সেটাও হবে তাঁদের যান্ত্রিক অভিযান। গণ্ডীর মাপকাঠি ছাড়া তার চলবার ক্ষমতা বা স্বাধীনতা সে পাবে না কোনদিন। তাই যাত্রাপথ তার চিরদিন সীমাবদ্ধই র'য়ে যাবে। কিন্তু এই রক্ত-মাংসে-গড়া মানুষের দেহের মধ্যে, যে মন বাস করে, তার নির্দ্দিষ্ট কোন গণ্ডী নেই, তাকে সীমাবদ্ধও করা যায় না কোনকালে! সে বস্তুটা অনাদির মতই সীমাহীন—অনন্ত ও অপার। সেই মনের আশা ও আকাঙ্ক্ষা, অন্তঃশীলা ফল্গুর মত দেহের প্রতিটি শিরা-উপশিরার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হ'য়ে চ'লেছে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। যে

মুহূর্ত্তে, সেই মনের দ্বারে, জাগে সৃষ্টির প্রেরণা, সেই মুহূর্ত্তেই তার শতমুখী ধারা কেন্দ্রীভূত হ'য়ে, আশা ও ভাষার সুরকে সে গ্রথিত করে তার সৃষ্টির মধ্যে। সেই সুরে জন্ম নেয় মানবশিশু। তাই সে হয় সবল, সচল ও প্রতিভার আধার। আর আপনার ওই যন্ত্রিক মন, ভেবে দেখুন ডাক্তার, একটু ভাল ক'রে ভেবে দেখুন, অপূর্ব্ব সেই সুরের ব্যূহ রচনা ক'র্‌তে পার্‌বে কি কোনদিন? পার্‌বে না, পারে না। দেখেছেন ত সেতার! তারগুলো সুর ধরে রাখে সত্য, কিন্তু তাকে বাজানোর জন্য প্রয়োজন একটি সজীব মানুষের। মনটাও আমাদের সেইরূপ সূক্ষ্ম একটি যন্ত্র বিশেষ। তাকে রূপ দেওয়ার জন্য চাই সজীব দুইটি মানুষ। সেই মানুষ হ'ল, পুরুষ ও প্রকৃতি—প্রকৃতি ও পুরুষ। উভয়ের ভাবের নিবিড় আদান-প্রদানে জাগে সে সুরের ছন্দ! এই সুরের ছন্দ যেখানে জাগ্‌লো, সেখানেই সৃষ্টি হ'ল সার্থক—আর যেখানে জাগলো না, সেখানেই সৃষ্টি হ'ল দুর্ব্বল পশু-মানব। পার্থক্য এখানেই।

মাধুরী সে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল বহুক্ষণ। হাসিমুখে, সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়ে। ব'ল্‌লো, তখন থেকে একটানা কি ব'কে চ'লেছো, বাবা? এতে তোমার শরীর যে আরও দুর্ব্বল হ'য়ে প'ড়্‌বে। ডাঃ চক্রবর্ত্তীর মুখের দিকে তাকিয়ে ব'ল্‌লো, কথাটা কি ঠিক্ বলিনে কাকাবাবু?

ডাক্তার চক্রবর্ত্তী একটু মৃদু হাস্‌লেন। ব'ল্‌লেন—এ কথাটা আমার পূর্ব্বেই স্মরণ করিয়ে দেওয়া উচিত ছিল মা! কিন্তু অপরাধী আমরা উভয়েই।

কেদারনাথ বাধা দিয়ে উঠ্‌লেন, অপরাধী ঠিক নই ডাক্তার, বরং বলুন সময়টা কাট্‌লো আমাদের ভালই!

না-না-ভাল বলা চলে না, বরং এতে মনেসিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। মাধুমা ঠিকই ব'লেছে, একটু চুপ্‌ চাপ্‌ থাকাই ভাল!

ভাল! ম্লান একটু হাস্‌লেন কেদারনাথ। ব'ল্‌লেন, তার চেয়েও ভাল হ'ল মৃত্যু, কিন্তু চাইলেই ত সে বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায় না!

মাধুরী অভিমানে ফেটে প'ড়্‌লো সেই মুহূর্ত্তে। ব'ল্‌লো, বার বার সেই এক কথা! মৃত্যু, আর মৃত্যু! এ ছাড়া কি জগতে ভাল কোন বস্তু নেই?

আছে বই কি মা! আদরে মাধুরীকে আরও একটু কাছে টেনে নিয়ে ব'ল্‌লেন কেদারনাথ, তোমরা দুঃখ পাও, কিন্তু এতে যে আমরা মুক্তির সন্ধান পাই মা! হয়ত ব'ল্‌বে তোমার জীবনটা কি এতই বিষময় হ'য়ে উঠেছে? তার উত্তরে বলি, না বরং বেশ সুখে স্বচ্ছন্দেই আছি। রাতদিন পাপে পাশে আছো—ভাল মন্দ নিজের হাতে খাওয়াচ্ছো, এর চেয়ে তৃপ্তি কি আছে এ দুনিয়ায়? কিন্তু পুরুষের জীবনের বেদনার সন্ধান ত তোমরা রাখো না, মা! বর্হির্মুখী তার জীবন-সাধনা। জন্মের পরমুহূর্ত্ত থেকে, মৃত্যুর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ পর্য্যন্ত—মনটা তার বাইরের কাজে থাকে ব্যস্ত। সেই কাজ, যেদিন তার শেষ হ'য়ে যায়, সে দিনই জীবনটা তার হ'য়ে পড়ে পঙ্গু! এটা তার কাছে দুর্ব্বিসহ বোঝা—তাই এ মৃত্যু, তার কাছে মৃত্যু কামনা নয়, ব্যর্থ পুরুষ-জীবনের ক্ষেদোক্তি মাত্র। সহজ কথায় যাকে আমরা বলি, এর আর প্রয়োজন কি? এবার গেলেই ত হ'ল! কিন্তু তুমি এত বুদ্ধিমতী হ'য়েও এ কথাটা বোঝ না কেন মা, মুখে যে মানুষ প্রতিমুহূর্ত্তে মৃত্যু কামনা করে—সেটা তার সত্যকার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশের বাণী নয়—সেটা চ'ল্‌তি জীবন-পথের মুখোস মাত্র! তার অর্থ—ভাল লাগ্‌ছে না—তার বেশী নয়! একটু হেসে উঠে ব'ল্‌লেন, আসল কথা হ'ল আমরা দুটো কথা আলোচনা ক'রে, বইয়ের জগতের কথা ভেবে, যত আনন্দ পাই, ঘরে বসে ঠিক ততটা আনন্দ পাই না। অথচ তোমার মা, তাঁর এই ঘর-সংসার ছাড়া একটিও বাজে কথা ভাব্‌তে রাজী ছিলেন না।

অথচ দেখ, তিনিই চলে গেলেন সকল কিছু ফেলে! যাদের এ বোঝা বওয়ার অভ্যাস নেই, তাদের কি এসব ভাল লাগে মা? হ্যাঁ, চলো অনেক রাত হ'য়ে গেল—তা হ'লে ডাক্তার—আজকের মত বিদায়!

প্রত্যুত্তরে ডাঃ চক্রবর্ত্তী টেবিলের উপর থেকে হ্যাট্‌টা তুলে নিলেন। ব'ল্‌লেন—আচ্ছা, শুভরাত্রি!

*　　*　　*　　*

সে রাত্রে আক্ষেপভরে যে কথাগুলো ব'লেছিলেন কেদারনাথ, সেগুলো ছিল তাঁর অন্তরের কথা, পুরুষ-জীবনের ব্যর্থতার বেদনা। যে জীবনটা শুধু বাইরের জগত নিয়ে মাতামাতি ক'র্‌ছে—তার কাছে ঘরের এই ক্ষুদ্র গণ্ডীটা পিঞ্জররূপে প্রতিভাত হওয়াটাই স্বাভাবিক। তাই নিজেরই সৃষ্ট, প্রাণপাতে গড়া এই মন্দিরের প্রতি সহজাত আকর্ষণটা তাঁকে সাময়িক তৃপ্তি দান ক'র্‌লো শুধু—কিন্তু হৃদয়ের সেই বিরাট শূন্যতার হাহাকার, পেল না নিবৃত্তির পাথেয়! তাই প্রতিটি পলে ক্ষয়ের পথে এগিয়ে চ'ল্‌লো জীবনের এই সুদীর্ঘ মেয়াদ। কোন কিছুর অভাব নেই, তবুও চিন্তার হাত থেকে মুক্তি তাঁর নেই! ফলে, রক্তের চাপ বাড়্‌লো। শরীর প'ড়্‌লো ভেঙে। মাধুরী সেবা-শুশ্রূষার ত্রুটি ক'র্‌লো না। ডাঃ চক্রবর্ত্তীও বন্ধুকে সুস্থ ক'রে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা ক'র্‌লেন, তবুও ক্ষয়কে প্রতিরোধ করা গেল না। কখনও ভাল কখনও মন্দ, এমনি সংগ্রামের মাঝে কয়েকটা মাস গেল কেটে। সহসা একদিন কেদারনাথ মাথা ঘুরে মেঝের উপর প'ড়ে গেলেন। জ্ঞান সেই যে হারালেন আর চেতনা তাঁর ফিরে এলো না। মারা গেলেন পরদিন প্রভাতে। বিনয় শহরের সেরা ডাক্তারদের ডাক্‌লো একে, একে—তবুও প্রিয়জনকে বিদায় দিতে হ'ল চিরদিনের মত। হৃদয়টা তার ব্যথা ও বেদনায় মুষ্‌ড়ে প'ড়্‌লো বেশ কয়েকটা দিন।

মাধুরী গভীর আঘাত পেয়েছিল সত্য কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই খাড়া হ'য়ে উঠ্‌লো। মৃতের 'আত্মা'র তৃপ্তি কামনায় কর্ম্মমুখর হ'ল সে। সেই নির্জ্জন পুরীটা শোক ও দুঃখের আবর্জ্জনা ধুয়ে মুছে পুনরায় আনন্দ-মুখর হ'য়ে উঠ্‌লো, কয়েকটা দিনের ব্যবধানে।

কাজ শেষ হ'ল। আত্মীয়স্বজন যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা চলে গেলেন একে একে। বিনয় পুরাতন বাসা পরিত্যাগ ক'রে স্থায়ী বাসা বাঁধ্‌লো এখানেই।

কিন্তু গোল বাঁধ্‌লো অজয়কে নিয়ে। সে কিছুতেই বিজয়কে বরদাস্ত ক'র্‌তে রাজি নয়, অথচ বিজয় তাকে সকল সময়েই খুশী ক'র্‌তে ব্যস্ত।

অকারণ নির্য্যাতন ও গালিমন্দ হাসিমুখে সহ্য করে বিজয়। এই সহনশীলতার পিছনে যে দু'মুঠো আহারের প্রত্যাশা লুকিয়ে ছিল তা নয় বরং সকল কিছুকেই সে উপেক্ষায় উড়িয়ে দিল, শুধু এতটুকু স্নেহ ও প্রীতি লাভের আশায়। একটা পেট—যে কোন উপায়ে চালিয়ে নেওয়ার শক্তি সে অর্জ্জন ক'রেছে প্রকৃতির দয়ায়, কিন্তু একান্ত শিশু-বয়সে যে স্নেহ ও প্রীতির অমৃত-সুধা লাভে সে বঞ্চিত হ'য়েছিল—যার অভাবে জীবনটা তার মরুময় বোধ হ'য়েছিল, সেই সুধার আস্বাদ লাভ সে ক'রেছে এই প্রথম। তাই—তার কাছে অত্যাচার—অত্যাচার নয়, অবিচার—অবিচার নয়, অপমান—অপমান নয়! সব কিছুকেই সে উড়িয়ে দিল উপহাস্যের লঘু পরিহাসে।

মাধুরীর তাই ভাল লাগে এই ছেলেটিকে। মা-বাপ মরা ছেলে—বিশেষ ক'রে অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির—বিশ্বাসী ও কাজের ছেলে সে! তাকে, মানুষ ভাল না বেসে কি নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বসে থাক্‌তে পারে কোনদিন? অজয়কে বোঝায় মাধুরী—অকারণ, কেন ওকে অত নির্য্যাতন করিস্‌ ব'ল্‌তো?

কেন? এর উত্তর খুঁজে পায় না অজয়। তবে তার স্নেহ ও প্রীতির অধিকারে যে ভাগ বসিয়েছে, তাকে কি সহ্য করা যায় কোনদিন? সেই ত তার জীবনের প্রতিদ্বন্দ্বী! তাকে বিতাড়িত ক'রতে না পারলে কি স্বস্তি পাওয়া যায় এতটুকু? ব'ল্‌লো—ও এখানে আছে কেন? চ'লে যেতে পারে না?

বাঃ রে! যাবে কেন? হাসিমুখে উত্তর দিল মাধুরী। আমরা রেখেছি ব'লেই ত আছে!

অজয় নীরব। ক্রোধে তার সর্ব্বশরীর রি-রি ক'রে উঠ্‌লো, কিন্তু উত্তরের ভাষা সে খুঁজে পেল না।

মাধুরী ব'ল্‌লো—যে হাসিমুখে সব অত্যাচার সহ্য করে, তার গায়ে হাত তুল্‌তে তোর এতটুকুও মায়া জাগে না! কি নিষ্ঠুর বল্‌তো তুই!

নিষ্ঠুর! ক্রোধে ফেটে পড়্‌লো অজয়। ব'ল্‌লো,—ও তোমাদের কে? ওর জন্যে তুমি লড়াই করো, বাবা করেন, সুমিতাও করে। কেন? কেন? কিসের জন্য?—বক্তব্য তার শেষ হ'ল না। কান্নায় ভেঙে প'ড়্‌লো একেবারে।

মাধুরী সস্নেহে তাকে কোলের কাছে টেনে নিল। আঁচলে চোখের পাতাগুলো মুছে দিয়ে স্নেহমাখা স্বরে ব'ল্‌লো—এমন অবুঝ ছেলেও বাবা দেখিনি কোনকালে! ও কাজ করে, দু'মুঠো খায়, তাতে তোর আপত্তি কিসের?

কেন ও থাক্‌বে? ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই এক কথা অজয় বলে বার বার।

উত্তরে মাধুরী মৃদু হাস্‌লো। ব'ল্‌লো—ওরে অবুঝ ছেলে, রেখেছি বলেই ত আছে—না রাখলে কি থাক্‌তো কোনদিন! কিন্তু রেখেছি বলেই কি তুই অমন নির্দ্দয়ের মত মারবি? না, প্রতিবাদ করে না ব'লেই, যা খুশী—তাই ক'রবি?

কথাটা খুবই সত্যি। বিজয় প্রতিবাদ করে না ব'লেই, সে অকারণে অত্যাচার করে এবং এতেই সে অনুভব করে তৃপ্তি। কিন্তু গোল বাধিয়েছে ওই সুমিতা! কিছু ব'ল্‌লেই, ও মুখ্‌পুড়ী মা কিংবা বাবাকে এসে লাগিয়ে দেবে চুপিচুপি। না, ওকে নিয়ে আর পারা গেল না! হতচ্ছাড়া মেয়ে—দাঁতে দাঁত চেপে নিজের মনে নিজেই গর্জ্জে উঠ্‌লো অজয়, ওর জন্যেই ত সহ্য ক'র্‌তে হয় অকারণ যত লাঞ্ছনা! নইলে বিজয়ের সাহস আছে, মুখের উপর কথা একটা বলে? ওষুধ—আরে সেটা ত হাতের মুঠোর মধ্যে—নিজের মনে পুনরায় হেসে উঠ্‌লো অজয়। কিন্তু ঝগ্‌ড়া যে সে করে না কোন কিছুতেই! হতভাগা বাঁদর কোথাকার! রাগ ধরেত তাই। উপলক্ষ্য একটা কিছু পেলেই হাতদুটো নিশ্‌পিশ্‌ ক'রে ওঠে। কদিনই বা এ বাড়ীতে পা দিয়েছে—চেহারাটা এরই মধ্যে কিরকম গোলগাল হ'য়ে উঠেছে। যাই বলো—মেরে কিন্তু ভারী আরাম পাওয়া যায়—

চিন্তা স্রোতে তার বাধা দিয়ে ব'লে উঠ্‌লো মাধুরী—কথাগুলো কাণে গেল?

অজয় উত্তর দিল না। ঠোঁটের পাতা দুটোর ফাঁকে চাপা দুষ্টু হাসির রেখা স্পষ্টতর হ'য়ে উঠ্‌লো। মাথাটা দুলিয়ে সে ফিরে গেল পাশের ঘরে।

মাধুরী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌লো সে দৃশ্য, অথচ এর বেশী শাসন ক'র্‌তেও অক্ষম হ'ল সে। তাই শুধু দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে নিজের মনে নিজেই ব'ল্‌লো,—সত্যই ছেলেটা বড় দুষ্টু হ'য়ে উঠ্‌ছে দিনের পর দিন! ভাগ্যে ওর কি আছে, কে জানে?

* * *

অজয়ের পড়াশুনায় মন নেই। খেলাধূলা ও বন্ধু-বান্ধব নিয়ে হৈ-চৈ এর মধ্যে দিন তার হয় শেষ। অফিসের কাজে ব্যস্ত থাকে বিনয়।

কোনদিকে লক্ষ্য রাখার সময় তার নেই। কিন্তু মাধুরী লক্ষ্য করে সব। দৃঢ় হওয়ার চেষ্টাও সে করে। কিন্তু পুত্রের প্রতি নির্দ্দয় হ'তে সে পারে না। মাতৃস্নেহের দুর্ব্বলতাটা কেন্দ্রীভূত হ'য়েছে এখানেই। প্রথম সন্তান কিনা!

বিনয় মাঝে মাঝে ক্ষুব্ধ হয়,—শাসন ক'র্‌তেও উদ্যত হয়; কিন্তু মাধুরী দোষ তার চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে আপ্রাণ। ভালমন্দ ভেবে দেখার অবসর নেই বিনয়ের। একে কাজের চাপ, তার উপর নিত্য অফিসারদের সঙ্গে খেচাখেচি লেগেই আছে প্রায়! তাই অবসর সময়টুকু সে নিভৃতে নিশ্চিন্তে যাপন ক'র্‌তে ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে।

কাজের উন্নতি হ'ল বিজয়ের। পিওন থেকে রেকর্ড ফাইণ্ডারের কাজে প্রমোশন্ পেল কয়েক মাসের ব্যবধানে। চালাক, চতুর, কর্ম্মকুশলী ব'লে নামটা তার সারা অফিসেই ছড়িয়ে প'ড়েছে সকলের অজ্ঞাতে—তবে জীবনে উন্নতি ক'র্‌তে হ'লে, একটু শিক্ষা-দীক্ষারও প্রয়োজন ত আছে!

কথাটা তারও মনে লেগে গেছে। মাঝে মাঝে দু'চারখানা বইও সে কিনে নিয়ে আসে। বাকী যা কিছুর প্রয়োজন, সুমিতা যোগান দেয় দিনের পর দিন।

এ কাজটা এতদিন সীমাবদ্ধ ছিল উভয়ের মধ্যে। কিন্তু বন্ধুর প্রয়োজনে কি একটা বইয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হ'ল অজয়। দেখ্‌লো, বইখানা সযত্নে তোলা র'য়েছে বিজয়ের দেরাজে। শুধু তাই নয় অন্য বহু বইও সাজানো র'য়েছে থরে থরে। তার মধ্যে হারানো আরও পাঁচ সাতখানা বইয়ের সন্ধান মিলে গেল—যা ইতিপূর্ব্বে খোয়া গিয়েছে ব'লে অনুমান ক'রেছিল সে।

সুযোগ যখন মিল্‌লো—তখন একটি মুহূর্ত্তও অপচয় ক'র্‌তে রাজি হ'ল

না অজয়! হৈ-চৈ সুরু ক'রে দিল—বেটাচ্ছেলে চোর—ওকে তাড়াও মা, তাড়াও—নইলে দেখ্‌বে সবকিছু একদিন গোপনে বাজারে বিক্রী ক'রে দিয়ে এসেছে!

চীৎকার শুনে ছুটে এলো মাধুরী। জিজ্ঞাসা ক'র্‌লো, কি হ'য়েছে?

হবে আর কি? দেখেছো তোমার আদুরে চাকর বিজয়ের কীর্ত্তি! আমার সব বইগুলো চুরি করে, বেটাচ্ছেলে দেরাজে পুরে রেখে দিয়েছে।

বলিস্‌ কি? বিস্ময়ে ফেটে প'ড়্‌লো মাধুরী। চুরি ক'রেছে বিজয়? সে ত ভুলেও একটি পয়সা নিজের কাছে রাখে না কোনদিন? তা-ছাড়া তার অভাব কি? মাসে বিশ-পঁচিশ টাকা ক'রে মাইনে পায়, তাও তুলে দেয় তার হাতে। কখনও কখনও, দু'এক টাকা নেয়, বই কেনার জন্যে। পড়ার একটু সখ আছে বটে! হয়ত প'ড়্‌তেই নিয়ে এসে থাক্‌বে। বল্‌লো, তারজন্যে এত হৈ-চৈ কিসের? এখন সেত বাড়ীতে নেই, ফিরে আসুক, জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেই চ'ল্‌বে!

অজয়ের চীৎকার থামে না। ব'লে, তোমরা একটা চোর পুষে রেখেছো! এখুনি পুলিশে দেওয়া উচিত। ঘরে একবার পা দিলে হয়, দেখাচ্ছি বেটাচ্ছেলেকে—আমার বই-এ হাত—

কি হ'য়েছে মা? স্কুল থেকে ফিরে, সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো সুমিতা। হাতে তার খাতা-বই-পেন্সিল। চোখেমুখে ফুটে উঠেছে গভীর বিস্ময়।

হবে আর কি? তেম্‌নি তারস্বরে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো অজয়, মা-বাবা দুধকলা দিয়ে কালসাপ পুষেছে! বেটাচ্ছেলের আস্পর্দ্ধা দেখ, আমার বইগুলো চুরি ক'রে নিজের দেরাজে পুরে রেখেছে! ভেবেছে, কেউ সন্ধান পাবে না—আরে আমার চোখে ধুলো দেবে?

সুমিতা ব'ল্‌লো, বইগুলো ত বিজয়দা চুরি ক'রেনি!

তবে?

আমি কাল রাত্রে এনে দিয়েছি!

কেন ? কিসের জন্যে ?

ও যে ওগুলো পড়ে !

আর সেই বই যোগান দাও তুমি ! ভাল কথা। বাবা আসুন্। তারপর দেখা যাবে তোমার একদিন কি আমার একদিন !

এলেই বা ! ভয়টা কিসের শুনি ? বরং বাবাকে ব'লে দেবো—তুমি পড়াশোনা করো না—হৈ-চৈ ক'রে বেড়াও শুধু।

শুন্‌লে মা ! রুখে দাঁড়ালো অজয়। তোমার সুঁট্‌কে মেয়ের পাকা পাকা কথা। শুন্‌লে ত নিজের কানে ! চোখমুখ পাকিয়ে সুমিতাকে ব'ল্‌লো, পড়িস্ তো ক্লাশ ফাইভে, তুই আমার পড়ার বুঝিস্ কতটুকু ? বুঝ্‌লি সুমি, ঘাড়ের চুলগুলো চেপে ধরে সবলে নাড়া দিয়ে ব'লে উঠ্‌লো অজয়, বাবার আদুরে মেয়ে হ'তে পারিস্ কিন্তু মনে রাখিস্ আমি তোর দাদা—মানে ভবিষ্যতের অভিভাবক। একটু গর্ব্বভরা বুকে ব'ল্‌লো, মাত্র একটা বছর পরে, আমি প'ড়্‌বো কলেজে ! আর তুই ? তখনও পড়্‌বি স্কুলে। আমার সমালোচনা ক'র্‌তে তোর লজ্জা করে না ?

সুমিতাও চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো,—দেখ্‌ছো মা ! লাগে না বুঝি ?

অজয় আর একবার ঝাঁকুনি দিয়ে ব'লে উঠ্‌লো, মারে মানুষ—লাগার জন্যেই ! কিন্তু জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে পারি কি, এত যে বিজয়দা, বিজয়দা করিস্, ও তোর কে ? তার জন্যেই বা তোর মাথাব্যথা এত কিসের শুনি ?

সুমিতা সমস্বরে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো—আঃ লাগে !

মাধুরী বাধা দিয়ে উঠ্‌লো, কি হ'চ্ছে অজয় ?

অজয় খিল্ খিল ক'রে হেসে উঠ্‌লো। ব'ল্‌লো, আদুরে মেয়ে ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যায় ! দেখো মা, দেখো—মেয়ের তোমার চোখের কোণে নেই জল এতটুকু !

ফোঁপাচ্ছিল সুমিতা। ক্রকে চোখের পাতাগুলো মুছ্‌তে মুছ্‌তে ব'ল্‌লো, লাগে না বুঝি!

বিজয়দাকে গোপনে গোপনে আরও বই চালান দে!

বেশ ক'রেছি, দিয়েছি! বিজয়দা তোমার চেয়ে ঢের ভাল ছেলে!

অজয় বইগুলো তুলে নিয়ে সদম্ভে ব'ল্‌লো, আচ্ছা দেখা যাবে, একবার অফিস্ থেকে আসুক না সে ফিরে—বই পড়া তার আমি ঘুঁচিয়ে দিচ্ছি চিরদিনের মত!

সুমিতার মুখখানা ভয়ে এতটুকু হ'য়ে গেল। দাদাকে সে চেনে ভাল ক'রেই। হয়ত বাবার ভয়ে সে কিছু ব'ল্‌তে পার্‌বে না বিজয়কে, কিন্তু তার বন্ধুবান্ধব যে আছে অনেক! পথেঘাটে কখন যে তার মাথা ফাটিয়ে দেবে, কে ব'ল্‌তে পারে? ব'ল্‌লো, বিজয়দার কোন দোষ নেই মা!

মাধুরী নীরব।

সুমিতা ব'লে চ'ল্‌লো, এর কাছ থেকে, ওর কাছ থেকে বই চেয়ে নিয়ে আসে, কারও পাতা আছে, কারও নেই, তেলচিটে ময়লা ধরা, তাই দাদার বইগুলো আমিই দিয়েছিলাম। ওকি নিতে চায়! তখনই ব'লেছিল, অজয় জান্‌লে কুরুক্ষেত্র বাধাবে, তার চেয়ে এই আমার ভাল! আমিইত জোর ক'রে দিয়ে ব'ল্‌লাম—দাদা জান্‌বে কেমন ক'রে? রাত্রে দিয়ে যাগে—সকালে ফিরে নিয়ে যাবো। কেউ জান্‌তে পার্‌বে না কোনদিন। মাধুরীর কোল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আঁচলটা ধরে ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে ব'ল্‌লো সুমিতা, এখন কি হবে মা? দাদা সত্যই যদি মারে? ওর কাজ আর কথার যে এতটুকুও নড়চড়্ হয় না!

মাধুরী সংক্ষেপে উত্তর দিল, এখন রেগে আছে, পরে বুঝিয়ে ব'লবো'খন! তা ছাড়া অন্যায় ত কিছু করোনি! নিজের পেটের ছেলে হ'তে সে পারে, কিন্তু নিজের চোখেই ত দেখ্‌তে পাচ্ছি, পড়াশোনার নাম গন্ধ ক'রে না কিছুতেই! বইগুলো যদি পোকায়

না কেটে, কারও কাজে লাগে সে ত সুখের কথা। কিন্তু এ বিষয় নিয়ে আর হৈ-চৈ ক'রো না মা, তোমার বাবার কাণেও যেন না ওঠে! একে ওঁ'র শরীরটা ভেঙে প'ড়েছে, মন-মেজাজও বিশেষ ভাল নেই, শেষে কি ক'রে ব'স্‌বেন, কে জানে! বিজয় বরং ফিরে আসুক্ পরের ব্যবস্থা পরেই করা যাবে! এখন হাতমুখ ধুয়ে খাবি চল ওপরে।..

শরীরটা ভাল ছিল না বিনয়ের। একটু সকাল সকাল অফিস থেকে ফিরে এলো। কোন কিছুই ভাল লাগ্‌ছিল না, তাই বারান্দায় আরাম কেদারাটা টেনে নিয়ে দেহটা এগিয়ে খবরের কাগজটা উল্‌টোতে লাগ্‌লো ধীরে ধীরে। পাশে সুমিতা এসে দাঁড়াতেই বিনয় ব'ল্‌লো— মাথার পাকাচুলগুলো বেছে তুলে দাও ত মা!

কাজটা সুমিতার পচ্ছন্দসই না হ'লেও, বাবার সেবার তার আপত্তি ছিল না কোনদিন। বসে গেল একটা চেয়ার টেনে মাথার ঠিক পিছনে। দু'চার বার মাথার চুলগুলো নাড়াচাড়া ক'রে ব'লে উঠ্‌লো, একটাও পাকা চুল মাথায় তোমার নেই!

কচি হাতের নরম পরশ বেশ ভাল লাগ্‌ছিল বিনয়ের। ব'ল্‌লো, আছে, নিশ্চয় লুকিয়ে কোথাও আছে। দেখনা মা, আরও দু'চার বার। বয়স হ'ল চুল পাকেনি, এও কি একটা কথা?

সুমিতা ব'ল্‌লো, বুড়ো হ'লে ত মাথার চুল পাকে! তুমি বুড়ো হ'য়েছো নাকি?

হ'লাম বইকি! বয়স ত কম হ'ল না!

যাও! উপেক্ষার মৃদু হাসি হাস্‌লো সুমিতা। ব'ল্‌লো, আমার বাবা বুড়ো হয় না! কখনও হ'বে না!

বিনয় উত্তর দিল না। শুধু মুখখানা ফিরিয়ে সুমিতার চিবুক খানায় মৃদু দোলা দিয়ে ব'লে উঠ্‌লো, এইত মায়ের মত কথা! মার

কাছে ছেলে কোনদিন বুড়ো হয় না! তা তোমার মুখখানা মা, এত শুক্‌নো দেখাচ্ছে কেন? স্কুল থেকে ফিরে বুঝি কিছু খাওনি এখনও?

খেয়েছি ত! হাসিমুখে উত্তর দিল সুমিতা!

মা বুঝি ব'কেছে?

না!

তবে?

একটা দোষ ক'রে ফেলেছি, বাবা!

কি দোষ মা? খাড়া হ'য়ে বস্‌লো বিনয়। আদরে আরও একটু কাছে টেনে নিয়ে ব'ল্‌লো, এমন কি দোষ ক'রেছো, মা?

আমি বিজয়দাকে দাদার বইগুলো প'ড়তে দিয়েছিলুম।

বিজয় পড়ে নাকি?

জানো না? ও ত প্রতিদিন রাত্রে পড়ে! বই নেই, কার কাছ থেকে ছেঁড়া-পচা বই চেয়ে নিয়ে আসে, তাই দাদার বইগুলো ওকে প'ড়তে দিয়েছিলাম।

সে ত ভাল কথা মা! শুনে খুব খুশী হ'য়েছি!

সুমিতা কিন্তু সত্যই খুশী হ'তে পার্‌লো না। ব'ল্‌লো, দাদা কি ব'লেছে জানো?

কি ব'লেছে?

মেরে ওর মাথা ফাটিয়ে দেবে!

হেসে উঠ্‌লো বিনয়। ব'ল্‌লো, ও তোমাকে ভয় দেখিয়েছে মা!

না, বাবা! তুমি জানো না, দাদার অনেক বন্ধু আছে, দেখ্‌তে সব গুণ্ডার মত! তাদের চোখগুলো জ্বলে ঠিক ভাঁটার মত। গায়ে পড়ে লোকের সঙ্গে ঝগড়া বাধায়, তারপর সবাই মিলে তাকে কি মারই না মারে! একটু থেমে ব'ল্‌লো, ও জানো না বুঝি সেদিনকার কথা! বেচারীর

কোন দোষ নেই,ওরা গায়ে তার থুথু ফেলে দিলে। লোকটা কি ব'ল্‌তেই সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে প'ড়্‌লো তার ওপরে। জামা-কাপড় সব ছিঁড়ে কুটিকুটি ক'রে দিলে, বাবা! উপরন্তু তার পকেটে যা ছিল, সব নিয়ে ওরা উধাও হ'য়ে গেল। আর লোকটা বসে বসে কাঁদতে লাগ্‌লো। শেষে মা, তোমার একটা পুরোনো কাপড় আর একটা জামা পাঠিয়ে দিল বিজয়দার হাতে। সেগুলো পেয়ে লোকটার কি আনন্দ! ব'ল্‌লো, তুমি রাজা হও, বাবা!

তারপর? গুরুগম্ভীরস্বরে প্রশ্ন ক'র্‌লো, বিনয়।

আমরা ত ফেলে দিই! কিন্তু একটা ছেঁড়া কাপড়-জামা পেয়ে ওদের কি সে আনন্দ! প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ ক'রে ব'স্‌লো, রাজা হও বাবা! বিজয়দা ফিরে আস্‌তেই জিজ্ঞাসা ক'র্‌লাম, কি ব'ল্‌লে বিজয়দা? বিজয়দার লজ্জায় চোখমুখ লাল৷ হ'য়ে উঠ্‌লো। ব'ল্‌লো, বোধ হয় খুব গরীব—তাই আনন্দে দিশেহারা হ'য়ে প'ড়েছে। একটু থেমে সুমিতা ব'ল্‌লো, যারা গরীব তাদের খুব দুঃখ, না বাবা? একটু কিছু পেলেই তাদের আনন্দের আর শেষ থাকে না! আচ্ছা বাবা, যাদের আছে, তারা অনেক কিছু ত ফেলে ছড়িয়ে বেড়ায়, অথচ ওরা চাইলে দেয় না কেন? দিলে, ওরাও ত খুশী হয়!

হয় বইকি মা! কিন্তু দেওয়া কি এত সহজ বস্তু মা? না দিতে পারে সকলে?

ঠিক সেই সময়েই গেটের সামনে একটা হৈ-চৈ শোনা গেল। সচকিত হ'য়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়েই বিনয় অনুমান ক'রে নিল, বিজয়ের ফিরে আসার সময় হ'য়েছে বটে! তবে কি সুমিতার কথাই ঠিক? অজয় দল পাকিয়ে—

বিনয় চিন্তার অবসর পেল না। বিজয়ের কাতর আর্ত্তনাদ, অজয়ের উল্লাসিত কণ্ঠস্বর—সবকিছুই স্পষ্টতর ক'রে দিয়ে গেল।

বিনয় একটি মুহূর্ত্তও অপচয় ক'র্‌লো না। হন্‌হন্‌ ক'রে নেমে গেল নীচের উঠানের দিকে।

দূর থেকে বিনয়কে দেখেই দলবল নিয়ে অজয় পালালো আত্ম-গোপনের আশায়। সেই সুযোগে বিজয় উঠে দাঁড়ালো। গায়ে, মাথায় সর্ব্বত্রই তার পথের কালো ধূলোর ছোপ। সেগুলো মুছে ফেলার দিকেই ছিল তার মন। চীৎকার···হ্যাঁ, একটু জোরেই চীৎকার ক'রে উঠে ছিল বটে সে! আক্রমণটা অতর্কিত। ভয়ে সে কতকটা বিভ্রান্ত হ'য়ে প'ড়েছিল, তাই আঘাতের পূর্ব্বেই ঝাঁপিয়ে প'ড়েছিল সে উঠানের ওপরে। কিন্তু পিছনে বিনয় ও সুমিতাকে দেখে লজ্জায় ম্লান হ'য়ে প'ড়লো একেবারে। ছিঃ ছিঃ, আত্মরক্ষার ক্ষমতাটুকুও তার নেই! দুর্ব্বল ও অসহায়ের মত এমন আকুল আর্ত্তনাদ ক'রে উঠ্‌লো সে অকারণে? হয়ত একটু আঘাত লাগ্‌তো, কিন্তু শক্তির পরিচয়ও ত দেওয়া উচিত ছিল তার। নির্বীর্য্যের মত একান্তে আত্মসমর্পণ কি পৌরষত্বের পরিচয়? ছিঃ ছিঃ, আত্মগ্লানিতে মুষ্‌ড়ে প'ড়্‌লো হৃদয়। ভাব্‌লো, এ লজ্জা কি তার মুছ্‌বে কোনদিন?

সুমিতা এগিয়ে এলো পাশে। ধীর অথচ কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা ক'রলো, লেগেছে বিজয়দা?

না! নিশ্চল পাষাণের মত দাঁড়িয়ে সংক্ষেপে লঘুকণ্ঠে উত্তর দিল বিজয়।

বিনয় গেটের কাছ পর্য্যন্ত এগিয়ে গেল। রাস্তায় কাউকে দেখ্‌তে না পেয়ে ফিরে এলো পুনরায়। শুধু গম্ভীর কণ্ঠে বল্‌লো—ভেতরে যাও বিজয়!···

*　　*　　*　　*　　*

মাধুরীর একান্ত অনুরোধে, বিনয় নিজেকে সংযত ক'রে নিল বটে, কিন্তু প্রকাশ্যে বিজয়ের পড়ার ব্যবস্থাও ক'রে দিল সেইসঙ্গে। কারণ, প্রতিভার পরিচয়ই পেতে সে চায়!

পরীক্ষা আসন্ন। বিনয় একটু ধৈর্য্য ধ'রে অপেক্ষা ক'র্‌লো। ফলাফল দেখেই একটা ব্যবস্থা অবলম্বন ক'রতে হবে তাকে।

পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হ'ল অজয়। বিনয় জিজ্ঞাসা ক'র্‌লো—কেন এমন হ'ল?

অজয় নীরব।

বিনয় ব'ল্‌লো—সব বিষয়েই ত দেখ্‌ছি কাঁচা! নোতুন মাষ্টার চাই?

হ'লে ভাল হয়!

সে কথা তোমার পূর্ব্বেই জানানো উচিত ছিল। একটু থেমে ব'ল্‌লো, বেশ, কালই আমি প্রতিটি বিষয়ের জন্যে অভিজ্ঞ শিক্ষক নিযুক্ত ক'র্‌ছি —এর বেশী ব'লার কিছু আছে?

না। অজয় ফিরে গেল পড়ার ঘরে।

বিনয় ডাক্‌লো সুমিতাকে। জিজ্ঞাসা ক'র্‌লো—তোমার শিক্ষকের কি প্রয়োজন আছে মা?

সুমিতা ব'ল্‌লো মাষ্টারের প্রয়োজন কি বাবা? আমি ত বিজয়দার কাছ থেকে দেখিয়ে শুনিয়ে নিই!

তা হ'লেই ত চলে যাবে, মা!

সুমিতা মাথা দোলালো।...

অফিসে রীতিমত চাকরী ক'রেও বিজয় পাশ ক'র্‌লো কৃতিত্ব সহকারে। কিন্তু অকৃতকার্য্য হ'ল অজয়।

বিনয় ক্ষুব্ধ হ'ল মনে মনে। কিন্তু মুগ্ধ হ'ল বিজয়ের প্রতিভার

পরিচয় পেয়ে। জিজ্ঞাসা ক'র্লো—এবার তা হ'লে কি ক'র্বে তুমি বিজয় ?

যা ব'ল্বেন !

প'ড়্বে ?

যদি সুযোগ পাই !...

রাত্রে কথাটা মাধুরীর কাছে তুল্লো বিনয়- ছেলেটা সত্যই মেধাবী। অফিসে চাক্‌রী ক'রেও পাশ ত ক'র্লো একটা ! যখন আমাদের আশ্রয়ে র'য়েছে, তখন আমাদের ত একটা কর্ত্তব্য র'য়েছে !

মাধুরী ব'ল্লো—সে কথা আমিও পূর্ব্বে বহুবার ভেবে দেখেছি ! আমারও ত পাঁচ-সাতটা ছেলেমেয়ে নেই—সবে একটি ছেলে, একটি মেয়ে ! ধরে নিতে হ'বে, ও-ও আমার এক ছেলে। ওর ভবিষ্যতের কথা আমাদেরই ভেবে দেখ্‌তে হবে !

অন্যমনস্কভাবে কিছুক্ষণ কি যেন গভীর চিন্তা ক'রে নিল বিনয় ! ব'ল্লো, তাহ'লে এখন কি করা উচিত বলো দেখি ? ওর ত পড়ার ইচ্ছা আছে দেখ্‌লাম—

কলেজে প'ড়্লে চাকরী কি ক'র্তে পার্বে ?

তাই ত ভাব্‌ছি ! এ পাশে—বয়সও বাড়্‌ছে, সংসারের খরচও বেড়ে চ'ল্ছে দিনের পর দিন ! চাকরীতে খেঁচাখেঁচি লেগেই আছে—ভালও লাগে না—অথচ না ক'র্লেও নয় ! এখন কি করা যায় ? চাক্‌রীটাও ত সহসা ছেড়ে দিতে পারি না !

বহুবার ত ব'লেছি ব্যবসা করো !

ব্যবসা কি মুখের কথা ? না, দু'এক হাজার টাকা হাতে থাক্‌লেই ব্যবসায় নামা যায় ?

তা হ'লে ?

প্রথমে রীতিমত শিক্ষা গ্রহণ ক'র্‌তে হবে। কিন্তু এ বয়সে সে অবসর আর কোথায় ? মাস শেষ হ'লেই সংসারের জন্যে তোমার নগদ পাঁচশো টাকা চাই ! আজই ব্যবসায় নেমে, সে টাকা যোগান দেওয়া ত সম্ভবপর নয় !

না হয়, দু'মাস একটু কষ্ট করাই যাবে ! সেটা না ক'র্‌লেই বা চ'ল্‌বে কেমন ক'রে ? শরীর মন যদি ভেঙে যায়, টাকা নিয়ে আমার হবে কি ?

বিরক্তি প্রকাশ ক'র্‌লো বিনয়—থামো থামো ! যা বোঝ না তা নিয়ে মতামত প্রকাশ ক'র্‌তে চেষ্টা ক'রো না। লোকে হাস্‌বে !

মাধুরী বিস্ময়বোধ ক'র্‌লো। ব'ল্‌লো—তার মানে ? অন্যায় কিছু ব'লেছি কি ?

ব'লেছো ঠিকই। কিন্তু যাকে চালাতে হয়, সেই জানে—টাকা উপায় ক'র্‌তে হয় কেমন ক'রে ! মুখে ত ব'ল্‌লে—দু'মাস কষ্ট ক'র্‌বে, কিন্তু দু'মাস পরেই যে লাখ্‌ টাকা উপায় ক'র্‌তে সমর্থ হ'বো—সে কথা কি নিশ্চয়তা দিয়ে ব'ল্‌তে পারে কেউ ? না, সে কার্‌বার্‌ সহসা ফেঁদে বসা যায় ? দিনকাল কি প'ড়েছে ভেবে দেখেছো কি একটিবার ?

মাধুরী উত্তর খুঁজে পেল না। অথচ অস্বীকারও ক'র্‌তে পারে না—সমাজে বসবাস ক'র্‌তে হ'লে—তার প্রয়োজনকে উপেক্ষা করা সম্ভব কোনদিন ! সামাজিক আচার-ব্যবহার ছাড়া দৈনন্দিন জীবনের চাহিদাটাও ত মেটাতে হবে দিনের পর দিন ! সুতরাং নীরব থাকাই এ ক্ষেত্রে বুদ্ধিমত্তার পরিচয়।

কয়েক মিনিট কেটে গেল নীরবে। বিনয় ঘরের মধ্যে পদচারণা

ক'র্‌তে লাগ্‌লো। মাধুরী নিশ্চেষ্ট হ'য়ে ব'সে থাকৃতে পার্‌লো না। ব'ল্‌লো, তাহ'লে মিথ্যে ভেবে লাভ কি ?

লাভ নেই আমিও বুঝি, কিন্তু পথ ত একটা বাৎলাতেই হবে! বসিয়ে রাখাও চলে না,—অথচ ওখানে আর এরূপভাবে চাক্‌রী ক'র্‌তে দেওয়াও উচিত হবে না! তাতে ভবিষ্যৎটা চিরদিনের মত রুদ্ধ হ'য়ে যেতে পারে!

যে কোন একটা কাজে নামিয়ে না হয় দাও! অবসর মত দেখিয়ে শুনিয়ে দেবে—সেইসঙ্গে নিজেও ব্যবসাটা বুঝে নিতে পার্‌বে অনায়াসে।

ঠিক ব'লেছো। শিশুর মত আনন্দে লাফিয়ে উঠ্‌লো বিনয়। কিন্তু কোন্ কাজে নামানো যায় ?

সে কথা আমি ব'ল্‌বো কেমন ক'রে? এত বড় অফিসে কাজ করো—বোঝ না, কোন্ ব্যবসা চালানো যায় অনায়াসে!

চলে ত লোহার ব্যবসা! বিদেশ থেকে বহু জিনিষ-পত্তর এখানের বাজারে আসে—অথচ একটু চেষ্টা ক'র্‌লে, সে সব জিনিষ এখানেও তৈরী করা যায়! দামও হয় কিছু কম। একটু থেমে ব'ল্‌লো, নিজের চোখেই ত দেখ্‌তে পাচ্ছো, এ দেশের লোক প্রায় সকলেই ছাপোষা, নিম্ন মধ্যবিত্ত। সংসারে আয়ের চেয়ে ব্যয়ই তাদের বেশী।

সেই কাজই না হয় ক'রে দাও না কেন ?

তার জন্যে বহু টাকার প্রয়োজন!

ধীরে ধীরে আরম্ভ ক'র্‌লে কি, কাজ চ'লে না ?

ঠিক্ ব'লেছো! উৎসাহিত কণ্ঠে ব'লে উঠ্‌লো বিনয়, আপাততঃ গোটা দুই হাপর ত বসানো থাক্—তোমাদের ওই বনগ্রামে! প্রথমে অল্প কিছু টাকা খরচ ক'রে দেখা ত যাক্! লাভ

হয় ভালই—না হয়—তুলে দিলেই চ'ল্‌বে—বিশেষ কিছু গায়েও লাগ্‌বে না!

সেই ভাল! মাধুরী নিজেই মাথা দুলিয়ে নিজের মনে পুনরায় ব'লে উঠ্‌লো—সেই ভাল! ওকে এখন ত কাজে নামিয়ে দাও—পরের কথা না হয় পরেই ভাবা যাবে!···

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত